فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ٥

বেহেশতী গাওহার

মূল
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (রহ.)

অনুবাদ
মাওলানা আহমদ মায়মূন
উসতাযুল হাদীস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ,
ঢাকা- ১২১৭

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

অনুবাদকের আরয

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন সংক্রান্ত জরুরী মাসায়েলের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরূপে বেহেশতী যেওয়ার একটি সুপরিচিত নাম। এ বেহেশতী গাওহার গ্রন্থখানি তারই পরিশিষ্ট। এটি বাংলাদেশের অনেক দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ক্লাসে দরসের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য নিচের ক্লাসের ছাত্ররা গ্রন্থখানির বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদের প্রতি মুখাপেক্ষী। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানের আমলী ময়দানে নানাবিধ সমস্যার শরয়ী সমাধান জানার জন্যও গ্রন্থখানি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ছাত্র ও সাধারণ মুসলমানের এহেন প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে দীনী গ্রন্থাবলীর সুপরিচিত প্রকাশক ও ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের একনিষ্ঠ সেবক, ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী জনাব মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেব এ গ্রন্থখানি অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। সেমতে আমি গ্রন্থখানির একটি সাবলীল ও মূলানুগ বিশুদ্ধ অনুবাদ তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে চিকিৎসা বিষয়ক পরিশিষ্টটি বিশেষ বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে। এর টীকাগুলো মূলগ্রন্থের টীকাকার কর্তৃক লিখিত। তন্মধ্যে অধিকাংশ টীকাই আমি অনুবাদে শামিল করেছি। প্রয়োজনীয়বোধে দু'একটি টীকা আমি নিজেও সংযোজন করেছি। এতে মাদ্‌রাসার প্রাথমিক ক্লাসের ছাত্রবৃন্দ এবং প্রয়োজনীয় মাসায়েল জানার জন্য আগ্রহী সাধারণ পাঠকবর্গ যদি উপকৃত হন, তবে আমি আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ তা'আলা আমার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রমটুকু কবুল করুন। আমীন।

আহমদ মায়মূন

তাং ঃ ১.১.৯৯ ঈসাব্দ

মালিবাগ জামিয়া
ঢাকা–১২১৭

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ বেহেশতী গাওহার পুস্তিকাখানি বেহেশতী যেওয়ারের পরিশিষ্ট। বেহেশতী যেওয়ার গ্রন্থখানি দশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষ খণ্ডের শেষাংশে এ পরিশিষ্ট রচনার ঘোষণা ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে এর সবগুলো মাসআলা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মৌল গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করার সুযোগ হয়নি; বরং লখনৌ থেকে প্রকাশিত "ইলমুল ফিক্‌হ" নামক একখানি গ্রন্থ, যার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌল গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিও দেয়া হয়েছে, ছাত্রসুলভ দৃষ্টিতে দেখে সেখান থেকে এ পরিশিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধানতঃ পুরুষদের যাবতীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত জরুরী মাসায়েল এবং বিশেষ উপযোগিতার বিবেচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে নারী ও পুরুষের যৌথ প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো সংকলন করে এক জায়গায় একত্র করে দেয়া যথেষ্ট মনে করেছি। অবশ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মৌল গ্রন্থাবলীর সাথে মিলিয়ে নিয়ে নিঃসংশয় হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে যেখানে বিষয়বস্তু বা মূলগ্রন্থের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া গেছে সেগুলো সংশোধন ও পরিমার্জন করে দেয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন এবং ইবারতের পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করা হয়েছে। ফলে এটি এক দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র; আবার ভিন্ন দৃষ্টিতে সংকলিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। কতিপয় জরুরী মাসআলা "সাফায়ী মু'আমালাত" নামক পুস্তিকা থেকেও নেয়া হয়েছে। এরপরও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় মাসআলা এ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং পাঠক সাধারণের নিকট আবেদন এই যে, এরূপ প্রয়োজনীয় মাসায়েল প্রশ্ন আকারে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করে দেয়া হবে। আর বিশিষ্ট আলিমদের নিকট প্রত্যাশা এই যে, তারা নিজেরাই মূল গ্রন্থের দশম খণ্ডের অনুরূপ এর শেষাংশে পরিশিষ্টাকারে যোগ করে দেবেন।

যেহেতু এতে বিভিন্ন অধ্যায়ের মাসায়েল রয়েছে তাই এতে বেহেশতী যেওয়ারের যে সকল খণ্ডের পরিশিষ্ট রয়েছে তন্মধ্যে তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টই সবচেয়ে বেশি—সে অনুযায়ী বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অংশের বিষয় বস্তুর সমাপনান্তে

মোটা অক্ষরে লিখে দেয়া চাই যে, অমুক খণ্ডের পরিশিষ্ট সমাপ্ত হয়েছে এবং সামনে অমুক খণ্ডের পরিশিষ্ট শুরু হচ্ছে।

অতএব যখন কোন পুরুষ বা বালক বেহেশতী যেওয়ারের কোন খণ্ড পাঠ করে বা ক্লাসে শেষ করে ফেলে, তখন তার পরবর্তী খণ্ড শুরু করার পূর্বে এ পুস্তিকা থেকে পূর্ববর্তী খণ্ডের পরিশিষ্টটি পাঠ করে নেয়া তার জন্য বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণকর হবে। তারপর মূল গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড পাঠ করবে। এভাবেই এপুস্তিকাটি সমাপ্ত করবে। সর্ব প্রকার কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং তিনিই পরিপূর্ণ কল্যাণদাতা।

আশরাফ আলী

তাং ৩০ রবীউল আউওয়াল

১৩২৪ হিজরী

বেহেশতী যেওয়ার প্রথম অংশের
পরিশিষ্ট
প্রয়োজনীয় পরিভাষাসমূহ [১]

উল্লেখ্য যে, বান্দার কর্ম ও আমল সংক্রান্ত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানগুলো আট প্রকার ঃ ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. মুসতাহাব, ৫. হারাম, ৬. মাকরূহ তাহরীমী, ৭. মাকরূহ তানযীহী, ৮. মুবাহ।

১. ফরয ঃ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধানকে ফরয বলা হয়। ওযর ব্যতিরেকে ফরয পরিত্যাগকারী ব্যক্তি ফাসিক ও শাস্তির যোগ্য। যে ব্যক্তি ফরযকে অস্বীকার করে সে কাফির। ফরয আবার দু'প্রকার ঃ ফরযে 'আইন ও ফরযে কিফায়া।

ফরযে 'আইন ঃ এরূপ বিধানকে বলা হয়, যা প্রত্যেকের করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে এরূপ ফরয তরক করে সে শাস্তিরযোগ্য ও ফসিক। যেমন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমুআর নামায ইত্যাদি।

ফরযে কিফায়া ঃ এরূপ বিধানকে বলা হয়, যা প্রত্যেকের করা আবশ্যক নয়। কিছু লোকের পালন করার দ্বারা এরূপ ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে কেউ যদি তা পালন না করে, তবে সবাই গুনাহগার হয়। যেমন– জানাযার নামায ইত্যাদি।

২. ওয়াজিব ঃ দ্ব্যর্থবোধক দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধানকে ওয়াজিব বলা হয়। যে ব্যক্তি কোন রকম ব্যাখ্যা বা সংশয়জনক আপত্তি ব্যতিরেকে বিনা ওযরে এরূপ বিধানকে তরক করে সে ফাসিক ও শাস্তির যোগ্য। যে ব্যক্তি ওয়াজিবকে অস্বীকার করে সেও ফাসিক বটে, তবে কাফির নয়।

৩. সুন্নত ঃ যে কাজ নবী (সা.) বা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) করেছেন তাকে সুন্নত বলা হয়। সুন্নত দু'প্রকারঃ সুন্নতে মুয়াক্কাদা, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা।

সুন্নতে মুয়াক্কাদা ঃ এরূপ কাজকে বলা হয়, যা নবী (সা.) বা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সর্বদা করেছেন এবং কোন ওযর ব্যতিরেকে কখনও পরিত্যাগ করেন নি। তবে কোন তরককারীকে কোনরূপ ধমক দেন নি বা সতর্ক করেন নি। এরূপ কাজও আমলগত দিক থেকে ওয়াজিবের মত। অর্থাৎ, বিনা ওযরে পরিত্যাগকারী ও পরিত্যাগে অভ্যস্ত ব্যক্তি ফাসিক ও গুনাহগার এবং এরূপ ব্যক্তি

---

১. এখানে উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের বিবরণ কোন প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত। এটা মূল গ্রন্থকারের রচনা নয়।

নবী (সা.)-এর (বিশেষ) সুপারিশ [২] থেকে বঞ্চিত থাকবে। অবশ্য যদি কখনও কখনও ছুটে যায়, তবে তাতে অসুবিধা নেই। তবে এরূপ সুন্নত পরিত্যাগ করার তুলনায় ওয়াজিব পরিত্যাগ করার গুনাহ বেশি।

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা ঃ এরূপ কাজকে বলা হয়, যা নবী (সা.) বা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) করেছেন এবং ওযর ব্যতিরেকে কখনও কখনও তরকও করেছেন। এরূপ সুন্নত পালনকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী, কিন্তু পরিত্যাগকারী শাস্তির যোগ্য নয়। এরূপ সুন্নতকে সুন্নতে যায়েদা বা সুন্নতে 'আদিয়াও বলা হয়।

৪. মুসতাহাব ঃ যে কাজ নবী (সা.) বা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) করেছেন, তবে সর্বদা বা অধিকাংশ সময় করেন নি ; বরং কখনও কখনও করেছেন। এরূপ কাজকে মুসতাহাব বলা হয়। এরূপ মুসতাহাব আমলকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হয় এবং তরককারীর কোনরূপ গুনাহ হয় না। এরূপ কাজকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় নফল, মানদূব এবং তাতাব্বু' ও বলা হয়।

৫. হারাম ঃ যে কাজের গর্হিত হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাকে হারাম বলে। হারামের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির। বিনা ওযরে যে হারাম কাজ করে সে ফাসিক এবং শাস্তির যোগ্য অপরাধী।

৬. মাকরূহ তাহরীমী ঃ দ্ব্যর্থবোধক দলীল দ্বারা প্রমাণিত গর্হিত কাজকে মাকরূহ তাহরীমী বলা হয়। মাকরূহ তাহরীমীর অস্বীকারকারী ফাসিক, যেরূপ ওয়াজিবের অস্বীকারকারী ফাসিক হয়। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে মাকরূহ তাহরীমী কাজ করে সে গুনাহগার ও শাস্তিরযোগ্য।

৭. মাকরূহ তানযীহী ঃ যে কাজ না করলে ছওয়াব হয় এবং করলে শাস্তি হবে না এরূপ কাজকে মাকরূহ তানযীহী বলা হয়।

৮. মুবাহ ঃ যে কাজ করলে ছওয়াব নেই এবং না করলেও শাস্তি হবে না এরূপ কাজকে মুবাহ বলা হয়।

---

২. এখানে সুপারিশ দ্বারা সাধারণ সুপারিশ উদ্দেশ্য নয়, যা কবীরা গুণাহকারীরাও লাভ করবে; বরং এখানে বিশেষ সুপারিশ উদ্দেশ্য, যা সুন্নতের অনুসরণের পুরস্কার।

بسم الله الرحمن الرحيم

বেহেশতী যেওয়ার প্রথম খন্ডের পরিশিষ্ট

অধ্যায় ঃ পবিত্রতা

পানি ব্যবহারের বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ কোন পানির সঙ্গে নাপাক জিনিস মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ এ তিনটি গুণই পরিবর্তিত হয়ে গেলে সে পানি কোন রূপেই ব্যবহার করা দুরুস্ত নয়। কোন প্রাণীকে পান করানোও দুরুস্ত নয় এবং মাটি ইত্যাদিতে মিশিয়ে (কাঁচা ঘর লেপা বা কাঁচা দেয়াল নির্মাণের জন্য) কাদা তৈরি করাও জায়েয নয়। আর যদি তিনটি গুণ পরিবর্তিত না হয় (বরং একটি বা দু'টি গুণ পরিবর্তিত হয়ে থাকে) তবে সে পানি কোন প্রাণীকে পান করানো বা মাটিতে মিশিয়ে কাদা প্রস্তত করা অথবা ঘরে ছিটানো জায়েয। তবে এরূপ পানি মিশ্রিত কাদা দ্বারা মসজিদ লেপন করবে না।

২. মাসআলা ঃ নদ-নদী এবং যে পুকুর কারও মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত নয় এবং এরূপ কূপ, যা কেউ খনন করে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে, এ সবের পানি বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারবে। এতে কারও এ অধিকার নেই যে, কাউকে এরূপ পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করে অথবা এভাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করে, যাতে সর্বসাধারণের ক্ষতি হয়; যেমন, কেউ নদী বা পুকুর থেকে খাল কেটে নেয়, যার ফলে নদী বা পুকুর শুকিয়ে যায় অথবা কোন গ্রাম বা জমি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তার এভাবে পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। যে কোন ব্যক্তি এরূপ নাজায়েয কাজে বাধা দিতে পারে।

৩. মাসআলা ঃ কারও মালিকানাধীন জমিতে যদি কূপ, ঝর্ণা, হাউয বা খাল থাকে, তবে সেখান থেকে কাউকে পানি পান করতে, পশুকে পানি পান করাতে, ওযূ গোসল করতে এবং কাপড় ধোয়ার জন্য পানি নিয়ে যেতে অথবা বাড়ীর গাছে বা ছোট বাগানে পানি দেয়ার জন্য কলসি ভরে পানি নিতে নিষেধ করতে পারবে না। কেননা, পানিতে সবার অধিকার আছে। তবে যদি পশুর সংখ্যাধিক্যের কারণে পানি ফুরিয়ে যাওয়ার অথবা খাল ইত্যাদির ক্ষতি হওয়ার

আশঙ্কা থাকে, তবে বাধা প্রদান করার এখতিয়ার আছে। আর যদি (সে পানি নিতে বাধা প্রদান করে না বটে, কিন্তু) সে তার জমিতে আসতে বাধা প্রদান করতে চায়, তবে দেখতে হবে যে, যারা পানি নেয় তাদের প্রয়োজন অন্যত্র সহজে পূর্ণ হয় কি না; যেমন, এক শরয়ী মাইলের চেয়ে কম দূরত্বে অন্য একটি কূপ বা পুকুর অবস্থিত রয়েছে এবং সেটি কারও মালিকানাধীন ভূমিতেও নয়, যদি এভাবে অন্যত্র তার প্রয়োজন পূর্ণ হয় তবে তো ভালই, নতুবা যদি তার কাজ-কর্ম ব্যহত হয় এবং তার কষ্ট হয়, তবে সেই কূপের মালিককে বলা হবে যে, হয় তোমার কূপ বা খালের কোন ক্ষতি করবে না এ শর্তে তাকে তোমার কূপ অথবা খাল ইত্যাদিতে আসতে অনুমতি দাও, নতুবা তার যতটুকু পানির প্রয়োজন তা তুমি নিজে বের করে অথবা অন্য কারও দ্বারা বের করিয়ে তাকে দিয়ে দাও, তবে এ ক্ষেত্রে কূপের মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্ষেত্রে বা বাগানে পানি দেওয়া অন্যদের জন্য জায়েয হবে না। মালিক এতে বাধা প্রদান করতে পারবে। চাষ বা বীজ বপন ব্যতিরেকে এমনিতে উৎপন্ন ঘাসের বিধানও এরকমই। কাষ্ঠহীন যত প্রকার উদ্ভিদ রয়েছে সবই ঘাসের মত। তবে কাষ্ঠ বিশিষ্ট গাছপালা জমির মালিকের মালিকানাভুক্ত।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কারও মালিকানাধীন কূপ বা খালের পানি দ্বারা নিজের জমিতে পানি দিতে চায় এবং সেই কূপ বা খালের মালিক পানির মূল্য নেয়, তবে এরূপ পানির মূল্য গ্রহণ করা জায়েয কি না এ ব্যাপারে ফিকাহবিগগণের মতভেদ রয়েছে। বলখের ফিকাহবিদ ইমামগণ জায়েয বলে ফত্ওয়া দিয়েছেন।

৫. মাসআলা ঃ নদী, পুকুর, কূপ ইত্যাদি থেকে পানি তুলে কেউ তার পাত্রে, যেমন ঃ কলসি, মশক প্রভৃতিতে ভরে রাখলে সে ব্যক্তি উক্ত পানির মালিক হয়ে যায়। তার অনুমতি ব্যতিরেকে সে পানি ব্যবহার করা কারও জন্য জায়েয নয়। তবে যদি কেউ পিপাসায় (প্রাণ চলে যাওয়ার মত) অস্থির হয়ে যায় এবং পানির মালিকের নিকট তার অতিশয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকে (অথচ সে দিতে চায় না) তবে এমতাবস্থায় জোরপূর্বক তার নিকট থেকে পানি ছিনিয়ে নিয়ে পিপাসা নিবারণ করা জায়েয। কিন্তু পরে সে পানির ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে হবে।

৬. মাসআলা ঃ যে পানি মানুষের পিপাসা নিবারণের জন্য রাখা থাকে; যেমন, গরমের সময় রাস্তার ধারে পানি রেখে দেওয়া হয়, এরূপ পানি দ্বারা ওযূ ও গোসল করা জায়েয নয়, হাঁ পানি যদি পরিমাণে বেশি থাকে তবে তদ্দারা ওযূ-গোসল করতে আপত্তি নেই। আর যে পানি ওযূর জন্য রাখা থাকে তদ্দারা পিপাসা নিবারণ করা জায়েয আছে।

৭. মাসআলা ঃ কূপে যদি এক দু'টি ছাগলের ল্যাদা পড়ে যায় এবং তা আবার আস্ত বের করে ফেলা হয়, তবে কূপ নাপাক হবে না; চাই সে কূপটি বিয়াবানে হোক বা জনবসতিপূর্ণ এলাকায়; এবং কূপের পাড় শান বাঁধানো থাকুক বা না থাকুক।

পাক-নাপাকের কতিপয় মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ গরু দিয়ে ফসল মাড়ানোর সময় গরু যদি ফসলের মধ্যে চনে দেয় তবে এটা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ক্ষমাই বলে গণ্য। অর্থাৎ, এতে ফসল নাপাক হবে না, তবে যদি অন্য কোন সময় গরু ফসলের মধ্যে চনে (বা লেদে) দেয় তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। কেননা, এতে পূর্ববৎ প্রয়োজনটি নেই।

২. মাসআলা ঃ কাফিরদের তৈরি করা খাবার, এমনিভাবে তাদের বাসন-কোষণ ও তাদের কাপড়-চোপড় ইত্যাদিকে নাপাক বলা যাবে না; যে পর্যন্ত না তা কোন প্রমাণ বা আলামত দ্বারা নাপাক প্রমাণিত হয়।

৩. মাসআলা ঃ কোন কোন লোক বাঘের চর্বি ব্যবহার করে থাকে এবং এটাকে পবিত্র মনে করে, এটা ঠিক নয়। যদি কোন দীনদার অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, এ চর্বি ব্যতীত অমুক ব্যাধির অন্য কোন চিকিৎসা নেই, তবে কোন কোন আলেমের মতে সে চর্বি ব্যবহার করা জায়েয আছে, কিন্তু নামাযের সময় তা ধুয়ে ফেলা আবশ্যক।

৪. মাসআলা ঃ রাস্তার কাদা বা নাপাক পানির ছিটা শরীরে বা কাপড়ে লাগলে যদি তাতে নাপাকের আছর প্রকাশ না পায়, তবে তা ক্ষমাই। ফতওয়ার অভিমত এটাই। কিন্তু সতর্কতা হচ্ছে এই যে, যার বাজারে ও রাস্তা-ঘাটে যাতায়াতের প্রয়োজন বেশি পড়ে না এরূপ ব্যক্তির গায়ে বা কাপড়ে এ ধরনের কাদা বা পানির ছিটা লাগলে যদি তাতে নাপাকের আছর প্রকাশ নাও পায় তবু তা ধুয়ে নেওয়া উচিত।

৫. মাসআলা ঃ নাপাক কোন জিনিসকে যদি জ্বালানো হয় তবে তার ধোঁয়া পাক। যদি সে ধোঁয়া এক জায়গায় জমিয়ে তদ্বারা কোন জিনিস তৈরি করা হয় তবে সেটাও পাক। যেমন নওশাদর নামক এক প্রকার ওষুধ সম্পর্কে বলা হয় যে, সেটি নাপাক বস্তুর ধোঁয়া থেকে প্রস্তুত।

৬. মাসআলা ঃ নাপাক বস্তুর উপর পতিত ধুলোবালি পাক; যদি নাপাক বস্তুর আর্দ্রতায় সে ধুলোবালি ভিজে না গিয়ে থাকে।

৭. মাসআলা ঃ নাজাসাত থেকে যে বাস্প উঠে তা পাক। ফলফলাদির মধ্যে যে সকল পোকা থাকে তা পাক বটে, কিন্তু ও সব পোকার প্রাণ সঞ্চারিত হলে তা খাওয়া জায়েয নয়। কার্পাস ও অন্য সকল ফলের পোকার বিধান এরকমই।

৮. মাসআলা ঃ খাওয়ার জিনিস যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তবে তা নাপাক হয় না। যেমন ঃ গোশ্‌ত, মিষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় এরূপ বস্তু খাওয়া জায়েয নয়।

৯. মাসআলা ঃ মেশক ও কস্তুরী পাক। এমনিভাবে আম্বর ইত্যাদিও পাক।

১০. মাসআলা ঃ ঘুমের সময় মানুষের মুখ থেকে যে লালা বের হয়, তা নাপাক নয়।

১১. মাসআলা ঃ হালাল প্রাণীর পঁচা ডিম যদি ভাঙ্গা না হয় তবে তা নাপাক নয়।

১২. মাসআলা ঃ সাপের খোলস পাক।

১৩. মাসআলা ঃ যে পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিষ ধৌত করা হয়, সে পানি নাপাক। চাই সে পানি উক্ত নাপাক জিনিসটির প্রথমবার ধৌত করার পানি হোক অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের। কিন্তু এ তিন প্রকারের পানির মধ্যে প্রভেদ এটুকু যে, যদি প্রথমবারের পানি কোন কাপড়ে লেগে যায়, তবে সে কাপড় তিনবার ধোয়ার পর পাক হবে, আর যদি দ্বিতীয়বারের পানি লেগে থাকে, তবে সে কাপড় দু'বার ধোয়ার পর পাক হবে এবং যদি তৃতীয়বারের পানি লেগে থাকে, তবে সে কাপড় কেবল একবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে।

১৪. মাসআলা ঃ মৃত মানুষকে যে পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়েছে সে পানি নাপাক।

১৫. মাসআলা ঃ সাপের চামড়া অর্থাৎ, যে চামড়া সাপের শরীরের সাথে যুক্ত তা নাপাক, (কিন্তু শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া চামড়া অর্থাৎ, খোলস পাক)।

১৬. মাসআলা ঃ মৃত মানুষের মুখের লালা নাপাক।

১৭. মাসআলা ঃ এক পল্লা কাপড়ের এক দিকে যদি ক্ষমার পরিমাণের চেয়ে কম নাপাকী লাগে এবং তা কাপড়ের অপরদিকে বিস্তার লাভ করে এবং প্রত্যেক দিকের নাপাকীর পরিমাণ ক্ষমার পরিমাণের চেয়ে কম, কিন্তু উভয়দিকের নাপাকীর সমষ্টিত পরিমাণ ক্ষমার পরিমাণের চেয়ে বেশি, তবে তা কমই ধর্তব্য হবে এবং ক্ষমাই হবে। কিন্তু যদি দোপল্লা কাপড় হয়, অথবা (একই কাপড়ের দু'জায়গায় নাপাকী লাগে বা দু'টি পৃথক কাপড়ে নাপাকী লাগে এবং দু'জায়গার বা) দু'কাপড়ের নাপাকীর সমষ্টিত পরিমাণ ক্ষমার পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তবে তা বেশি বলে ধর্তব্য হবে এবং ক্ষমাই হবে না।

১৮. মাসআলা ঃ দুধ দোহন করার সময় যদি দু'একটি বকরীর ল্যাদা বা তার সমপরিমাণ সামান্য (শক্ত) গোবর দুধের মধ্যে পড়ে যায় এবং পড়া মাত্রই তা বের করে ফেলা হয় তবে তা ক্ষমাই বলে গণ্য।

১৯. মাসআলা ঃ চার-পাঁচ বছর বয়সের বালক যে ওযূ সম্পর্কে কিছু জানে না, এরূপ কোন বালক এবং কোন উম্মাদ ব্যক্তি ওযূ করলে তাদের ওযূর পানি "ব্যবহৃত পানি" বলে ধর্তব্য নয়।

২০. মাসআলা ঃ পাক-পরিষ্কার কাপড়, বাসন-কোষণ বা অন্য কোন পাক জিনিস যে পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে সে পানি যদি গাঢ় না হয়ে গিয়ে থাকে এবং সাধারণ্যে তা "শুধু পানি" বলে বিবেচিত হয়, তবে সে পানি দ্বারা ওযূ ও গোসল করা জায়েয। যদি বাসন-কোষণে কোন খাদ্য বা পানীয় বস্তু লেগে থাকে, তবে তার ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ ও গোসল জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে, পানির তিনটি গুণের মধ্যে একটির পরিবর্তন হলেও দু'টি গুণ বহাল থাকা চাই। কিন্তু যদি দু'টি গুণই পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে জায়েয হবে না।

২১. মাসআলা ঃ ওযূ-গোসলে ব্যবহৃত পানি পান করা এবং খাদ্য-দ্রব্যে ব্যবহার করা মাকরূহ। এরূপ পানি দ্বারা (পুনরায়) ওযূ-গোসল করা জায়েয নয়। অবশ্য এরূপ পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধোয়া জায়েয আছে।

২২. মাসআলা ঃ যমযমের পানি দ্বারা ওযূবিহীন লোকের ওযূ করা, এমনিভাবে যার গোসলের প্রয়োজন হয়েছে এরূপ লোকের গোসল করা উচিত নয়, যমযমের পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা ও ইসতেঞ্জা করা মাকরূহ। হাঁ, যদি একান্ত ঠেকা হয় অর্থাৎ, এক মাইলের মধ্যে যমযমের পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি পাওয়া না যায় এবং অন্য কোন উপায়ে আবশ্যকীয় পবিত্রতা হাসিল করা না যায়, তবে যমযমের পানি দ্বারা এ সকল প্রয়োজন পূর্ণ করা জায়েয।

২৩. মাসআলা ঃ মেয়েলোকের ওযূ বা গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষ লোকের ওযূ বা গোসল করা উচিত নয়; যদিও আমাদের মাযহাব অনুসারে এরূপ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল করা জায়েয, কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, জায়েয নয়। সুতরাং (পারতপক্ষে) ইমামগণের মতবিরোধের বিষয় থেকে বেঁচে চলা উত্তম।

২৪. মাসআলা ঃ যে সকল স্থানে কোন সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তাআলার গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে; যেমন, আদ ও সামূদ জাতির ধ্বংসের স্থানসমূহ, এরূপ কোন স্থানের পানি দ্বারা ওযূ ও গোসল করা উচিত নয়। পূর্ববর্তী মাসআলার ন্যায় এক্ষেত্রেও ফিকাহবিদ ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, সুতরাং এখানেও (পারতপক্ষে) ইমামগণের মতভেদ থেকে বেঁচে চলা উত্তম। একান্ত ঠেকা হলে এখানেও সে বিধানই প্রযোজ্য, যা যমযমের পানির ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২৫. মাসআলা ঃ তন্দুর (চুলা) যদি নাপাক হয়ে যায়, তবে যদি আগুন জ্বালানোর পর গরম হওয়ার কারণে তাতে নাপাকীর আছর না থাকে তাহলে তন্দুর পাক হয়ে যাবে।

২৬. মাসআলা ঃ নাপাক জমিতে মাটি ইত্যাদি ফেলে যদি নাজাসাতকে এভাবে ঢেকে দেয়া হয় যে, উপর থেকে নাজাসাতের দুর্গন্ধ আসে না, তবে মাটির উপরিভাগ পাক বলে ধর্তব্য হবে।

২৭. মাসআলা ঃ নাপাক তেল বা চর্বি দ্বারা সাবান তৈরি করা হলে তা পাক বলে গণ্য হবে।

২৮. মাসআলা ঃ শরীরের পট্টি বাঁধা স্থান অথবা এরূপ কোন অঙ্গ, যা পূঁজ বের হওয়ার কারণে নাপাক হয়ে গেছে এবং তা ধুলে ক্ষতি হয়, তবে সে স্থানটুকু ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে দিলেই চলবে এবং ভাল হয়ে যাওয়ার পরও সে স্থানটি ধোয়া জরুরী নয়।

২৯. মাসআলা ঃ শরীরে, কাপড়ে বা চুল-দাড়িতে যদি নাপাক রঙ লেগে যায় তবে তা কেবল এতটুকু ধুলেই চলবে, যাতে রঙহীন পরিষ্কার পানি বের হয়। যদি রঙ নাও যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৩০. মাসআলা ঃ যে দাঁত ভেঙ্গে পৃথক হয়ে গেছে এরূপ দাঁত যদি যথাস্থানে রেখে কোন ওষুধ দ্বারা জমিয়ে দেয়া হয় এবং যে ওষুধ দ্বারা জমানো হয়েছে তা চাই পাক হোক বা নাপাক; এমনিভাবে কোন হাঁড় ভেঙ্গে গেলে তদস্থলে যদি কোন নাপাক হাঁড় দ্বারা জোড়া দেয়া হয় অথবা যখমের স্থলে যদি কোন নাপাক বস্তু লাগানো হয়, তবে এ সকল ক্ষেত্রে সে স্থানটি ভাল হয়ে যাওয়ার পর নাপাক বস্তুটি বের করার প্রয়োজন নেই; বরং তা আপনা-আপনি পাক হয়ে যাবে।

৩১. মাসআলা ঃ কোন নাপাক তৈলাক্ত দ্রব্য যেমন– তেল, ঘি বা মৃত প্রাণীর চর্বি যদি কোন জিনিসে লাগে এবং তা এ পরিমাণ ধৌত করা হয়, যাতে পরিষ্কার পানি বের হয় তবে তা পাক হয়ে যাবে। যদি তাতে তৈলাক্ততা থেকেও যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৩২. মাসআলা ঃ নাপাক জিনিস পানিতে পড়ার কারণে যদি পানি থেকে ছিটা উঠে কারও গায়ে (বা কাপড়ে) লাগে এবং সে ছিটার মধ্যে নাপাকীর কোন আছর দেখা না যায়, তবে তা পাক বলে ধর্তব্য হবে।

৩৩. মাসআলা ঃ দোপল্লা কাপড়ের বা তুলা ভরা কাপড়ের এক পিঠ যদি নাপাক হয়ে যায় এবং অপর পিঠে নাপকী না লাগে এবং উভয় পল্লা পরস্পরে সেলাইকরা হয়, তবে উভয় পল্লা (অর্থাৎ, নাপাকী লাগা পল্লার যতটুকুতে নাপাকী লেগেছে ততটুকু ও তার সমপরিমাণ অপর পল্লা) নাপাক বলে গণ্য

হবে। এরূপ কাপড়ের উপর (নাপাকী না লাগা পিঠেও) নামায পড়া জায়েয হবে না; যদি সে কাপড়ের নাপাক অংশটুকু নামাযী ব্যক্তির দাঁড়ানোর জায়গায় বা সিজদার জায়গায় পড়ে। কিন্তু উভয়পল্লা কাপড় যদি পরস্পরে সেলাই করা না হয়, তবে একপল্লা নাপাক হওয়ার কারণে অপর পল্লা নাপাক হবে না। অতএব পাক পল্লাটি যদি এ পরিমাণ মোটা হয় যে, তাতে নিচের পল্লার নাপাকীর রঙ ও গন্ধ প্রকাশ পায় না, তবে সেই পাক পল্লার উপর নামায পড়া জায়েয হবে।

৩৪. মুরগী বা অন্য কোন হালাল প্রাণী যবাহ্ করতঃ তার পেট ফেড়ে পেটের ভেতরকার নাপাক জিনিসসমূহ বের করার পূর্বে যদি পানিতে সিদ্ধ করা হয়; যেমন, আজকাল ইংরেজ ও তাদের সমমনা উপমহাদেশীয় লোকদের মধ্যে প্রচলন দেখা যায়, তবে এরূপ প্রাণী কোনরূপেই পাক হবে না।

৩৫. মাসআলা ঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় চন্দ্র বা সূর্যের দিকে মুখ করে বসা মাকরূহ। খাল বা পুকুর ইত্যাদির পাড়ে বসে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ; যদিও তাতে মলমূত্র না পড়ে। এমনিভাবে যে গাছের ছায়ায় মানুষ বসে এরূপ গাছের নিচে, ফলগাছ বা ফুল গাছের নিচে, যেখানে বসে মানুষ শীতের সময় রোদ পোহায় এরূপ জায়গায়, গবাদি পশুর পালের মধ্যে, মসজিদ বা ঈদগাহের সন্নিকটে যেখানকার দুর্গন্ধে নামাযীদের কষ্ট হয়, কবরস্থানে, এরূপ জায়গায় যেখানে মানুষ ওযূ বা গোসল করে, রাস্তার মধ্যে, বাতাসের রোখের দিকে, গর্তের মধ্যে, রাস্তার নিকটে এবং কাফেলা বা কোন জনসমাবেশের নিকটে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ তাহরীমী। মোটকথা এই, যেখানে মানুষ উঠা-বসা করে, অথবা যেখানে পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের কষ্ট হয় এবং যেখান থেকে নাপাকী নিজের দিকে বয়ে আসে এরূপ জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ।

পেশাব-পায়খানার সময় যে সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত

(১) কথা বলা, (২) নিস্প্রয়োজনে কাশি দেওয়া, (৩) কোন আয়াত বা হাদীস বা কোন তা'যীমের উপযুক্ত কালাম পড়া, (৪) আল্লাহর নাম, রাসূলের নাম, কোন ফেরেশ্তা বা কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের নাম বা কোন আয়াত, হাদীস বা দু'আ লেখা কোন জিনিস পেশাব-পায়খানার সময় সঙ্গে রাখা, তবে এরূপ কোন জিনিস যদি জেবের মধ্যে থাকে অথবা তাবীজের খোলে বা কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মোড়ানো থাকে, তবে মাকরূহ হবে না। (৫) অকারণে শুয়ে বা দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা করা, (৬) সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে পেশাব-পায়খানা করা, (৭) ডান হাত দ্বারা ইসতেঞ্জা করা।

যে সকল জিনিস দ্বারা ইসতেঞ্জা করা জায়েয নয়

(১) হাঁড়, (২) খাওয়ার জিনিস, (৩) ছাগলের ল্যাদা, গোবর বা অন্য যে কোন নাপাক জিনিস, (৪) একবার যে ডেলা বা পাথর কুলুখের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, (৫) পাকা ইট, (৬) চাঁড়া, (৭) কাঁচ, (৮) কয়লা, (৯) চুনা, (১০) লোহা, (১১) রূপা, (১২) সোনা, (১৩) যদ্বারা নাপাকী পরিষ্কার হয় না এমন কোন জিনিস; যেমন, সির্কা ইত্যাদি, (১৪) যে সকল জিনিস গবাদি পশু খায়; যেমন, ভুসি, ঘাস ইত্যাদি (১৫) এরূপ কান জিনিস যার মূল্য আছে, চাই মূল্য কম হোক বা বেশি; যেমন, ভাল কাপড়, গোলাপের পানি ইত্যাদি, (১৬) মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন, চুল, হাঁড়, গোশ্‌ত ইত্যাদি, (১৭) মসজিদের চাটাই, খড়কুটা, ঝাড়ু ইত্যাদি, (১৭) গাছের পাতা, (১৮) কাগজ, চাই লেখা কাগজ হোক বা অলেখা, (১৯) যমযমের পানি (২০) অন্যের মালিকানাভুক্ত কোন জিনিস, তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে, চাই সেটা পানি হোক বা কাপড় বা অন্য কোন জিনিস, (২১) তুলা এবং এমন যে কোন জিনিস, যদ্বারা মানুষ বা জীব-জানোয়ার উপকৃত হয় এ সকল জিনিস দ্বারা ইসতেঞ্জা করা মাকরূহ।

যে সকল জিনিস দ্বারা ইসতেঞ্জা করা আপত্তিহীনভাবে জায়েয

পানি, মাটির ডেলা, পাথর, মূল্যহীন কাপড় এবং এমন যে কোন জিনিস, যা পাক এবং যদ্বারা নাপাকী পরিষ্কার করা যায়, যদি তা মূল্য ও সম্মানের জিনিস না হয়, তবে এ সকল বস্তু দ্বারা ইসতেঞ্জা করা জায়েয।

ওযূর বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ দাড়ি খিলাল করবে এবং তা তিনবার মুখ ধৌত করার পর করবে, তিনবারের বেশি খিলাল করবে না।

২. মাসআলা ঃ গণ্ডদেশ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ, কানপট্টি) ধৌত করা ফরয, চাই সেখানে দাড়ি থাকুক বা না থাকুক।

৩. মাসআলা ঃ চিবুকে যদি দাড়ি না থাকে অথবা থাকলেও এত কম যে, চিবুকের চামড়া দেখা যায়, তবে এমতাবস্থায় চিবুক ধৌত করা ফরয।

৪. মাসআলা ঃ মুখ বন্ধ করলে ঠোঁটের যে অংশ স্বাভাবিকভাবে বাইরে দেখা যায় তাও ধৌত করা ফরয।

৫. মাসআলা ঃ দাড়ি, মোচ বা ভ্রু যদি এত ঘন হয় যে, তার ভেতরকার চামড়া দেখা যায় না, তবে তার ভেতরে আবৃত চামড়া ধৌত করা ফরয নয়; বরং

সে চুলই চামড়ার স্থলে ধর্তব্য হবে। সুতরাং তার উপর দিয়ে পানি বইয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

৬. মাসআলা ঃ দাড়ি, মোচ বা ভ্রু যদি এ পরিমাণ ঘন হয় যে, তার ভেতরকার চামড়া আবৃত থাকে এবং দেখা না যায়, তবে এমতাবস্থায় এ পরিমাণ চুল ধৌত করা ফরয, যা মুখমণ্ডলের সীমানার মধ্যে পড়ে। আর যে সকল চুল মুখ মণ্ডলের সীমানার বাইরে রয়েছে তা ধৌত করা ফরয নয়।

৭. মাসআলা ঃ যদি কারও মলদ্বারের ভেতরের কোন অংশ বাইরে বের হয়ে আসে, যাকে দেশীয় ভাষায় গেঁজ বের হওয়া বলে, তবে এর দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে গেঁজটি নিজে নিজেই ভেতরে চলে যাক অথবা কোন কাঠি, কাপড় বা হাতের সাহায্যে ভেতরে প্রবেশ করানো হোক।

৮. মাসআলা ঃ বীর্য যদি উত্তেজনা ব্যতিরেকে বের হয়; যেমন, কেউ কোন বোঝা উঠাল, অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে পড়ে গেল, যার ফলে উত্তেজনা ব্যতিরেকে বীর্য বের হয়ে গেল, তবে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৯. মাসআলা ঃ যদি কারও মস্তিষ্কের চেতনা শক্তিতে ত্রুটি দেখা দেয়, কিন্তু সে ত্রুটি উম্মাদ বা বেঁহুশ হওয়ার মাত্রায় না পৌঁছে, তবে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

১০. মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কারও তন্দ্রা এসে গেলে এবং তন্দ্রা অবস্থায় শব্দ করে হাসলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

১১. মাসআলা ঃ জানাযার নামায ও তিলাওয়াতের সিজদায় শব্দ করে হাসলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। চাই হাসিদাতা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

মোজার উপর মাসাহ করার বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ বুট জুতা যদি টাখ্নাসহ পা ঢেকে রাখে এবং তার ফাড়া অংশ ফিতা দ্বারা এভাবে বাঁধা থাকে যে, পায়ের এতটুকু চামড়া দেখা যায় না, যা মাসাহ্র জন্য অন্তরায় হয়, তবে তার উপর মাসাহ করা জায়েয।[১]

২. মাসআলা ঃ কেউ তায়াম্মুমের অবস্থায় মোজা পরল, অতঃপর সে ওযূ করলে পূর্বে পরিহিত মোজার উপরে মাসাহ করতে পারবে না। কেননা, তায়াম্মুম পবিত্রতার পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র উপায় নয় (বরং তা ওযূর বা গোসলের বিকল্প মাত্র, সুতরাং মোজার উপর মাসাহ করা, যা ওযূরই অংশ বিশেষ, তায়াম্মুমের উপর ভিত্তিশীল হতে পারে না।) চাই সে তায়াম্মুম কেবল গোসলের বিকল্প হোক অথবা ওযূ ও গোসল উভয়ের বিকল্প হোক অথবা কেবল ওযূর বিকল্প হোক।

---

১. বুট জুতা যদি পাক থাকে তবেই উপরিউক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে তার উপর মাসাহ করা জায়েয হবে। নতুবা নয়।

৩. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি গোসল করবে তার জন্য মোজার উপর মাসাহ্ করা জায়েয নয়, চাই ফরয গোসল হোক বা সুন্নত। যেমন, কেউ কোন উঁচু জায়গায় পা তুলে রেখে নিজে বসে পড়ল এবং পা ব্যতীত অবশিষ্ট শরীর ধৌত করল, অতঃপর পায়ের মোজার উপর মাসাহ করল, এরূপ করা জায়েয নয়।

৪. মাসআলা ঃ ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির ওযূ যেমন নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়, তেমনি তার মাসাহও নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় ওযূ করার সময় পায়ের মোজা খুলে ফেলে পা ধুয়ে নেওয়া তার উপর ফরয। অবশ্য যদি ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির ওযূ করা ও মোজা পরার সময় তার সেই ব্যাধি (যার কারণে সে ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত হয়েছিল,) প্রকাশ না পায়, তবে সেও অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় বিবেচিত হবে। [১]

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন প্রকারে (চামড়ার মোজার মধ্যে পানি প্রবেশ করার কারণে) পায়ের অধিকাংশ স্থান ধোয়া হয়ে যায় (অর্থাৎ, ভিজে যায়) তবে এমতাবস্থায় মোজাগুলো খুলে ফেলে পা ধুয়ে নিতে হবে (মাসাহ করা চলবে না)।

ছোট হাদাছ অর্থাৎ, ওযূবিহীন অবস্থার বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ ওযূবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ বা সীপারা স্পর্শ করা মাকরূহ তাহরীমী। চাই আয়াত লেখা স্থান স্পর্শ করা হোক অথবা খালি জায়গা। অবশ্য যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ না হয়; বরং কোন কাগজ, কাপড় বা ঝিল্লি ইত্যাদিতে কুরআনের একটি পূর্ণ আয়াত লেখা থাকে এবং বাকি অংশ খালি থাকে তবে খালি অংশ স্পর্শ করা জায়েয, কিন্তু আয়াতটি স্পর্শ করা জায়েয নয়।

২. মাসআলা ঃ ওযূবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ লেখা, যদি লেখা স্থানে হাত না লাগে তবে মাকরূহ নয়। খালি জায়গা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, স্পর্শ করা জায়েয, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, খালি জায়গাও

---

১. এ মাসআলাটির বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির দু'ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এক. যতক্ষণ সে ওযূ করল এবং মোজা পরল– এই সম্পূর্ণ সময়টুকুতে তার সেই ব্যাধিটি দেখা যায় নি, যার কারণে সে ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত হয়েছিল, দুই. তার ওযূ করা ও মোজা পরার সম্পূর্ণ সময়টুকুতে অথবা তার কোন অংশে সেই ব্যাধিটি প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থাটি সৃষ্টি হলে তখন বিধান হচ্ছে এই যে, নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হলে তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং যেহেতু সে পূর্ণাঙ্গ ওযূ অবস্থায় মোজা পরেছে তাই তার মোজার মাসাহ ভঙ্গ হবে না। এরূপ ব্যক্তি সুস্থ লোকের ন্যায় ইকামত অবস্থায় একদিন, এক রাত এবং সফর অবস্থায় তিন দিন, তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। আর দ্বিতীয় অবস্থার সৃষ্টি হলে তখন বিধান হচ্ছে এই যে, নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে যেমনিভাবে তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে, তেমনিতার মাসাহও ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তাকে মোজা খুলে পা ধুতে হবে।

স্পর্শ করা জায়েয নয়। এটাই অধিক সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত। এরূপ মতভেদ পূর্ববর্তী মাসআলায়ও রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বিধান তখনই প্রযোজ্য, যখন কুরআন শরীফ ও সীপারা ব্যতীত অন্য কোন কাগজ অথবা কাপড় ইত্যাদিতে কোন আয়াত লেখা থাকে এবং তার কিছু অংশ খালি থাকে।

৩. মাসআলা ঃ কুরআনের আয়াত যদি কিতাব ইত্যাদিতে লেখা হয়, তবে (ওযূবিহীন অবস্থায়) এক আয়াতের চেয়ে কম অংশ লেখা মাকরূহ নয়, কিন্তু কুরআন শরীফে লিখতে গেলে এক আয়াতের চেয়ে কম অংশ লেখাও জায়েয নয়।

৪. মাসআলা ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে ওযূবিহীন অবস্থায়ও কুরআন শরীফ দেওয়া এবং স্পর্শ করতে দেওয়া মাকরূহ নয়।

৫. মাসআলা ঃ কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ যেমন তাওরাত, ইনজীল, যবুর ইত্যাদির কেবল লেখা অংশ (ওযূবিহীন অবস্থায়) স্পর্শ করা মাকরূহ। লেখা অংশ ব্যতীত খালি জায়গা স্পর্শ করা মাকরূহ নয়। কুরআন শরীফের যে সকল আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য।

৬. মাসআলা ঃ ওযূ করার পর যদি কোন অঙ্গ ধোয়া হয় নি বলে সন্দেহ দেখা দেয় এবং সে অঙ্গ কোন্‌টি তা নির্দিষ্টভাবে মনে না পড়ে, তবে এমতাবস্থায় সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য বাম পা ধুয়ে নেবে। এমনিভাবে ওযূ করার সময় যদি কোন অঙ্গের ব্যাপারে এরূপ (ধোয়া হয় নি বলে) সন্দেহ হয়, তবে এক্ষেত্রে শেষ অঙ্গটি ধুয়ে নেবে, যেমন– কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার পর এরূপ সন্দেহর সৃষ্টি হলে মুখ ধুয়ে নেবে, আর যদি পা ধোয়ার সময় এ রকম সন্দেহ হয়, তবে কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নেবে। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যদি সন্দেহ কখনও কখনও দেখা দেয়। কিন্তু যদি কারও প্রায়ই এরূপ সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকে তবে এরূপ সন্দেহের প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ না করা এবং নিজের ওযূকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা উচিত।

৭. মাসআলা ঃ মসজিদের মেঝেতে ওযূ করা জায়েয নয়। হাঁ যদি কেউ এভাবে ওযূ করে যে, ওযূর পানি মসজিদে পড়ে না তবে তা চলে; কিন্তু এতে প্রায়শঃ অসাবধানতা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ, ওযূ এরূপ স্থলে করা হয় যে, ওযূর পানি মসজিদের মেঝেতেও পড়ে।

গোসলের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ "বড় হাদাছ" থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা ফরয। চারটি কারণে "বড় হাদাছ" সংঘটিত হয়।

প্রথম কারণ ঃ বীর্য নির্গত হওয়া, অর্থাৎ, উত্তেজনা বশতঃ বীর্য তার স্বস্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে শরীরের বাইরে বের হয়ে আসা। চাই ঘুমন্ত অবস্থায় বের হোক বা জাগ্রত অবস্থায়, বেহুঁশ অবস্থায় হোক বা হুঁশ অবস্থায়, সহবাসের কারণে বের হোক বা সহবাস ব্যতিরেকে, কোন ধ্যান ও কল্পনার কারণে হোক বা বিশেষ অঙ্গকে নাড়াচাড়া করার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে।

২. মাসআলা ঃ যদি এমন হয় যে, স্বস্থান থেকে উত্তেজনার কারণে স্থানান্তরিত হয়েছে, কিন্তু বিশেষ অঙ্গের বাইরে বের হয়ে আসার সময় উত্তেজনা ছিল না, তবু গোসল ফরয হয়ে যাবে। যেমন, কারও বীর্য স্বস্থান থেকে উত্তেজনা সহকারে স্থানান্তরিত হল, কিন্তু সে তার বিশেষ অঙ্গের ছিদ্রমুখ হাত দ্বারা বন্ধ করে রাখল অথবা তাতে তুলা ইত্যাদি গুঁজে দিল, কিছুক্ষণ পর যখন উত্তেজনা থেমে গেল তখন সে তার বিশেষ অঙ্গের ছিদ্র মুখ থেকে হাত বা তুলা সরিয়ে নিল এবং উত্তেজনা ব্যতিরেকেই বীর্য নির্গত হল, তবে এমতাবস্থায়ও গোসল ফরয হবে।

৩. মাসআলা ঃ যদি কারও বিশেষ অঙ্গ থেকে (উত্তেজনা বশতঃ) কিছু বীর্য বের হয় এবং সে গোসল করে নেয়, কিন্তু গোসল করার পর উত্তেজনা ব্যতিরেকে পুনরায় কিছু বীর্য বের হয় এবং এই পরবর্তী বীর্যটুকু ঘুমানোর পূর্বে, পেশাব করার পূর্বে এবং চল্লিশ কদম বা তার চেয়ে বেশি হাঁটা-হাঁটি করার পূর্বে বের হয়, তবে এমতাবস্থায় তার পূর্বের গোসল ধর্তব্য হবে না; বরং তার পুনরায় গোসল করা ফরয। কিন্তু পরবর্তী বীর্যটুকু বের হওয়ার পূর্বে যদি সে নামায পড়ে থাকে, তবে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে। সেই নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক নয়।

৪. মাসআলা ঃ পেশাব করার পর যদি কারও বিশেষ অঙ্গ থেকে বীর্য বের হয় এবং তা উত্তেজনা সহকারে বের হয়, তবে তার উপরও গোসল ফরয হবে।

৫. মাসআলা ঃ ঘুম থেকে উঠার পর যদি কোন পুরুষ বা মহিলা নিজের শরীর বা কাপড়ে আর্দ্রতা অনুভব করে, তবে তাতে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিধান প্রযোজ্য হবে। তন্মধ্যে আট ধরনের অবস্থায় গোসল ফরয হবে।

এক. যদি নিশ্চিত বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয়ে যায় যে, এটা বীর্য এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে।

দুই. নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এটা বীর্য এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে।

তিন. নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এটা মযী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে।

চার. সন্দেহ হয় যে, এটা বীর্য না কি মযী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে।

পাঁচ. সন্দেহ হয় যে, এটা বীর্য না কি ওদী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে।

ছয়. সন্দেহ হয় যে, এটা মযী না কি ওদী এবং স্বপ্নদেরাষের কথা স্মরণ থাকে।

সাত. সন্দেহ হয় যে, এটা বীর্য না কি মযী কিংবা ওদী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে।

আট. সন্দেহ হয় যে, এটা বীর্য না কি মযী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে।[১]

৬. মাসআলা ঃ যদি কারও খতনা না করা হয়ে থাকে এবং তার বীর্য বিশেষ অঙ্গের ছিদ্র থেকে বের হয়ে তার সম্মুখস্থ চামড়ার মধ্যে (যে অংশটুকু খতনার সময় কেটে ফেলা হয়) থেকে যায় তবে বীর্য তার সেই চামড়ার বাইরে বের না হলেও তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ সঙ্গম করা, অর্থাৎ, কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগ (খতনার জায়গা পরিমাণ) কোন জীবিত নারীর বিশেষ অঙ্গের মধ্যে অথবা কোন জীবিত মানুষের গুহ্যদ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া। চাই সে পুরুষ হোক বা নারী বা ক্লীব এবং বীর্যপাত হোক বা না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে যদি গোসল ফরয হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় অর্থাৎ, উভয়জন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তবে উভয়ের উপর, নতুবা যার মধ্যে শর্তাবলী পাওয়া যায় তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।

৭. মাসআলা ঃ মেয়েটি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়, কিন্তু এত কমবয়সী নয় যে, তার সাথে সহবাস করলে তার বিশেষ অঙ্গ ও তার গুহ্যদ্বার একত্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তার বিশেষ অঙ্গের মধ্যে পুরুষের বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হলে এবং সে পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তবে পুরুষের উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।

৮. মাসআলা ঃ যে পুরুষের অণ্ডকোষ কেটে পড়ে গেছে তার বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগ যদি কারও গুহ্যদ্বারের মধ্যে অথবা কোন নারীর বিশেষ অঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং উভয়জন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তবে এ ক্ষেত্রেও উভয়ের উপর; নতুবা যে জন বয়ঃপ্রাপ্ত, তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।

---

১. আল্লামা শামী এ অষ্টম অবস্থার ক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আল্লামা হালাবী কবীরীতে গোসল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম একমত বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে সাবধানতামূলক কবীরীর অভিমতটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন পুরুষের বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগ কাটা পড়ে যায়, তবে তার সে অঙ্গের অবশিষ্ট অংশের ততটুকু পরিমাণ ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ, অবশিষ্ট অংশ থেকে যদি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের গোলাকার অংশ পরিমাণ প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তবে গোসল ফরয হবে; নতুবা নয়।

১০. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ যদি তার বিশেষ অঙ্গকে কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পেঁচিয়ে প্রবিষ্ট করে, তবে এমতাবস্থায় শরীরের উষ্ণতা অনুভূত হলে গোসল ফরয হবে; কিন্তু সাবধানতামূলক সিদ্ধান্ত এই যে, শরীরের উষ্ণতা অনুভূত হোক বা না হোক গোসল ফরয হয়ে যাবে।

১১. মাসআলা ঃ কোন নারী যদি উত্তেজনাবশতঃ তার বিশেষ অঙ্গের মধ্যে কোন কামশক্তিহীন মানুষের অথবা কোন প্রাণীর বিশেষ অঙ্গ বা কোন কাঠি ইত্যাদি বা নিজের আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে তবু তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। এটা মুনয়ার ভাষ্যকারের অভিমত। কিন্তু আসল মাযহাব মতে, বীর্যপাত ব্যতীত গোসল ফরয হবে না।

তৃতীয় কারণ ঃ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়া।

চতুর্থ কারণ ঃ নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

এতদ্‌সংক্রান্ত মাসায়েল বেহেশতী যেওয়ার ২য়খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

যে সকল অবস্থায় গোসল ফরয হয় না

১. মাসআলা ঃ বীর্য যদি স্বস্থান থেকে উত্তেজনার কারণে স্থানান্তরিত না হয়, তবে বীর্য বিশেষ অঙ্গের বাইরে বের হয়ে এলেও গোসল ফরয হবে না। যেমন, কেউ কোন বোঝা উত্তোলন করল অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে পড়ে গেল অথবা কেউ তাকে আঘাত করল এবং সে আঘাতের কারণে উত্তেজনা ব্যতিরেকে বীর্য নির্গত হয়ে গেল, তবে এতে গোসল ফরয হবে না।

২. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ যদি কোন অবয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ের সাথে সঙ্গম করে এবং বীর্যপাত না হয় এবং সে মেয়েটি এত কম বয়স্কা যে, তার সাথে সঙ্গম করলে তার বিশেষ অঙ্গ ও গুহ্যদ্বার একত্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে গোসল ফরয হবে না।

৩. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ যদি তার বিশেষ অঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে সঙ্গম করে এবং কাপড় এ পরিমাণ মোটা হয় যে, তার কারণে শরীরের উষ্ণতা ও সঙ্গম-সুখ উপলব্ধ না হয়, তবে গোসল ফরয হবে না। কিন্তু সাবধানতামূলক অভিমত হচ্ছে এই যে, পুরুষাঙ্গের গোলাকার মাথাটুকু প্রবিষ্ট হয়ে গেলে গোসল ফরয হয়ে যাবে।

৪. মাসআলা ঃ পুরুষ যদি তার বিশেষ অঙ্গের গোলাকার অংশের চেয়ে কম প্রবিষ্ট করে, তবে এক্ষেত্রেও গোসল ফরয হবে না।

৫. মাসআলা ঃ মযী ও ওদী বের হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয় না।

৬. মাসআলা ঃ ইসতেহাযার কারণে গোসল ফরয হয় না।

৭. মাসআলা ঃ কোন মানুষের যদি এমন কোন ব্যাধি থাকে, যার কারণে তার বীর্য নির্গত হতে থাকে, তবে এরূপ বীর্য নির্গত হওয়ার কারণে তার উপর গোসল ফরয হবে না।

৮. মাসআলা ঃ ঘুম থেকে উঠার পর কেউ কাপড়ে আর্দ্রতা প্রত্যক্ষ করলে সে ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত এ সকল অবস্থায় গোসল ফরয হয় না।

এক. যদি নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, এটা মযী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না থাকে।

দুই. সন্দেহ হয় যে, এটা বীর্য না কি ওদী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না থাকে।

তিন. সন্দেহ হয় যে, এটা মযী না কি ওদী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না থাকে।

চার ও পাঁচ. নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এটা ওদী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে থাকুক বা না থাকুক।

ছয়. সন্দেহ হয় যে, এটা বীর্য না কি মযী, না কি ওদী এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না থাকে।

কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ এ তিন অবস্থায় সাবধানতামূলক গোসল করে নেওয়া ওয়াজিব। গোসল না করলে নামায হবে না এবং কঠোর গুনাহ হবে। কেননা, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও তারাফাইন (ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, গোসল ফরয নয়। পক্ষান্তরে তারাফাইন বলেন যে, গোসল ফরয হবে। ফতওয়া তারাফাইনের অভিমত মুতাবিক।

৯. মাসআলা ঃ মলদ্বারে ঢুস-যন্ত্র প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয় না।

১০. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ যদি তার বিশেষ অঙ্গ কোন নারী বা পুরুষের নাভিতে প্রবিষ্ট করে এবং বীর্য নির্গত না হয়, তবে তার উপর গোসল ফরয হবে না।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বপ্নে বীর্যপাত হতে দেখে এবং বীর্যপাতের সুখও তার উপলব্ধ হয়, কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর কাপড়ে আর্দ্রতা বা অন্য কোন আলামত না পায়, তবে তার উপর গোসল ফরয হবে না।

যে সকল ক্ষেত্রে গোসল করা ওয়াজিব

১. কোন অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং অমুসলিম থাকা অবস্থায় তার বড় হাদাছ হয়ে থাকে, অথচ সে গোসল করে নি, অথবা সে গোসল করেছিল বটে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তার গোসল শুদ্ধ হয় নি, তবে ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা তার উপর ওয়াজিব।

২. কোন কিশোর যদি পনের বছর বয়সের পূর্বে বালেগ হয় এবং তার প্রথম স্বপ্নদোষ হয়, তবে এতে সাবধানতামূলক গোসল করা তার উপর ওয়াজিব; কিন্তু এরপরে যে স্বপ্নদোষ হয় অথবা পনের বছর বয়সের পর যে স্বপ্নদোষ হয় তাতে গোসল করা ফরয।

৩. মৃত মুসলমানকে গোসল দেওয়া জীবিত মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়া।

যে সকল ক্ষেত্রে গোসল করা সুন্নত

১. জুমুআর দিন ফজরের নামাযের পর থেকে জুমুআ পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে তাদের জন্য গোসল করা সুন্নত, যাদের উপর জুমুআর নামায ফরয।

২. দুই ঈদের দিন ফজরের পর তাদের জন্য গোসল করা সুন্নত, যাদের উপর দুই ঈদের নামায ওয়াজিব।

৩. হজ্জ বা উমরার ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নত।

৪. হজ্জ পালনকারীদের জন্য আরাফার দিন দুপুরের পর গোসল করা সুন্নত।

যে সকল ক্ষেত্রে গোসল করা মুসতাহাব

১. ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল করা মুসতাহাব; যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বড় হাদাছ থেকে পাক থাকে।

২. কোন ছেলে বা মেয়ে যখন পনের বছর বয়সে উপনীত হয়, অথচ তখনও পর্যন্ত বালেগ হওয়ার কোন লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ না পায়, তখন (পনের বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই) তার গোসল করা মুসতাহাব।

৩. শিঙা লাগাবার পর এবং উম্মাদনা, পাগলামি ও বেহুঁশ অবস্থা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর গোসল করা মুসতাহাব।

৪. মৃত ব্যক্তিকে যারা গোসল দেওয়াবে, গোসল দেওয়ানোর পর তাদের নিজেদের গোসল করা মুসতাহাব।

৫. শবে বরাত অর্থাৎ, শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত্রে গোসল করা মুসতাহাব।

৬. কদরের রাত্রিগুলোতে তার গোসল করা মুসতাহাব, যে লাইলাতুল কদর অনুভব করে।

৭. মদীনা মুনাউওয়ারায় প্রবেশ করার সময় গোসল করা মুসতাহাব।

৮. মুযদালিফায় অবস্থান করার জন্য ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের পর গোসল করা মুসতাহাব।

৯. তওয়াফে যিয়ারতের জন্য গোসল করা মুসতাহাব।

১০. মীনায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য গোসল করা মুসতাহাব।

১১. সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়ার জন্য গোসল করা মসতাহাব।

১২. ভয়-ভীতি ও বিপদাপদের সময় নামায পড়ার জন্য গোসল করা মুসতাহাব।

১৩. কোন গুনাহ থেকে তওবা করার জন্য গোসল করা মুসতাহাব।

১৪. সফর থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তির বাড়ি পৌঁছার পর গোসল করা মুসতাহাব।

১৫. জনসমাবেশে যাওয়ার জন্য এবং নতুন কাপড় পরিধান করার জন্য গোসল করা মুসতাহাব।

১৬. যার প্রাণদণ্ডের হুকুম হয় তার গোসল করা (এবং গোসল করে দু'রাকআত নামায পড়া) মুসতাহাব।

বড় হাদাছের বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ বড় হাদাছ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম, হাঁ যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে প্রবেশ করা জায়েয। যেমন, কারও ঘরের দরজা মসজিদের ভেতর দিয়ে, এবং সে দরজা ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়ার ভিন্ন কোন পথ নেই, এবং সেই ঘর ব্যতীত ঘরের অধিবাসীর অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে মসজিদে প্রবেশ করা তার জন্য জায়েয। অথবা কোন মসজিদে পানির ঝর্ণা, কূপ বা হাউয রয়েছে এবং তাছাড়া অন্যত্র কোথাও পানি নেই, তবে এমতাবস্থায় (গোসলের জন্য) তায়াম্মুম করে মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয।

২. মাসআলা ঃ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ঈদগাহ, মাদরাসা ও খানকাহ ইত্যাদিতে প্রবেশ করা জায়েয।

৩. মাসআলা ঃ হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় স্ত্রী লোকের নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী শরীরের অংশকে দেখা, স্ত্রীর শরীরের ওটুকু অংশ, মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল ব্যতিরেকে নিজের শরীরের সাথে লাগানো এবং সঙ্গম করা হারাম।

৪. মাসআলা ঃ হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া, স্ত্রীর ঝুটা পানি ইত্যাদি পান করা, তাকে জড়িয়ে ধরে শয়ন করা, তার নাভি ও নাভির উপরের অংশ এবং হাঁটু [১] ও হাঁটুর নিম্নের অংশকে নিজের শরীরের সাথে লাগানো, যদি মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল নাও থাকে এবং নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী জায়গা কাপড়ের অন্তরাল সহকারে নিজের শরীরের সাথে লাগানো

---

১. স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর হাঁটু স্পর্শ করা এবং স্ত্রীর হাঁটুর সাথে স্বামীর শরীর লাগানো ফিকাহবিদগণ জায়েয বলেছেন। কিন্তু আল্লামা শামী, হাঁটু যেহেতু সতরের অংশ, তাই এ ব্যাপারে ইতস্ততা প্রকাশ করেছেন। অথচ এ ইতস্ততা তো মহিলার সর্বাঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, মহিলার সমস্ত শরীরই সতর। স্বাধীনা নারীর হাঁটুর নিচের পায়ের গোছাও সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অধিকাংশ ফিকাহবিদের অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

জায়েয। বরং হায়েযের কারণে স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করা অথবা তার সাথে সম্পর্ক না রাখা মাকরূহ।

৫. মাসআলা ঃ কোন পুরুষ যদি ঘুম থেকে উঠার পর তার বিশেষ অঙ্গে আর্দ্রতা দেখতে পায় এবং ঘুমানোর পূর্বে তার বিশেষ অঙ্গ দণ্ডায়মান থেকে থাকে এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না থাকে আর সেই আর্দ্রতা বীর্য বলে প্রবল ধারণা না হয়, তবে তার উপর গোসল ফরয হবে না এবং সেই আর্দ্রতা মযী বলে ধর্তব্য হবে। কিন্তু উরু ইত্যাদি অথবা কাপড়ে যদি আর্দ্রতা থাকে তবে তাতে গোসল ফরয হবে।

৬. মাসআলা ঃ দু'জন পুরুষ বা দু'জন মহিলা বা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যদি এক বিছানায় শয়ন করে এবং ঘুম থেকে উঠার পর বিছানায় বীর্যের দাগ পাওয়া যায় এবং সেটা কার বীর্য তা কোনভাবে বুঝা না যায়, আর তাদের পূর্বে সে বিছানায় অন্য কেউ শয়নও করে নি, তবে এমতাবস্থায় গোসল করা উভয়ের উপর ফরয; কিন্তু তাদের পূর্বে যদি কেউ সে বিছানায় শয়ন করে থাকে এবং বীর্য শুকনো হয় তবে সে ক্ষেত্রে তাদের কারও উপর গোসল ফরয হবে না।

৭. মাসআলা ঃ কারও উপর যদি গোসল ফরয হয় এবং পর্দা সহকারে গোসল সম্পন্ন করার মত কোন জায়গা না থাকে তবে সেক্ষেত্রে বিধান এই যে, পুরুষদের সামনে পুরুষের বিবস্ত্র হয়ে (হলেও) গোসল করা ওয়াজিব। এমনিভাবে মহিলাদের সামনে মহিলারও বিবস্ত্র হয়ে (হলেও) গোসল করা ওয়াজিব। কিন্তু মহিলাদের সামনে পুরুষের এবং পুরুষের সামনে মহিলাদের বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা হারাম; বরং এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুমের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ কূপ থেকে পানি বের করার মত কিছু যদি না থাকে এবং এমন কোন (পাক) কাপড়ও না থাকে, যা কূপ থেকে ভিজিয়ে তুলে নিয়ে তা নিঙড়িয়ে সে পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করতে পারে, অথবা পানি বড় মট্‌কা ইত্যাদিতে থাকে এবং তা থেকে পানি বের করার মত কিছু না পাওয়া যায়, আর মট্‌কা ইত্যাদি কাত করেও পানি নেওয়া সম্ভব না হয় এবং নিজের হাতও নাপাক থাকে, আর এমন কেউ না থাকে, যে পানি বের করে দেবে অথবা তার হাত ধুইয়ে দেবে, তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয।

২. মাসআলা ঃ যে ওযরের কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছে তা যদি মানুষের পক্ষ থেকে সৃষ্ট হয়, তবে সে তায়াম্মুম দ্বারা যে সকল নামায পড়া হয়েছে সেগুলো উক্ত ওযর দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় পড়তে হবে। যেমন, কেউ জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে এবং জেল কর্তৃপক্ষ তাকে পানি দেয় না, অথবা কেউ তাকে হুমকি দিয়ে বলল, তুমি যদি ওযূ কর তবে তোমাকে আমি মেরে ফেলব,

তবে সে এ সমস্যার কারণে তায়াম্মুম করে যে সকল নামায পড়েছিল সেগুলো পুনরায় পড়তে হবে।

৩. মাসআলা ঃ একই জায়গায় অথবা একই মাটির ডেলা দ্বারা পরপর একাধিক লোকের তায়াম্মুম করা জায়েয।

৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি পানি ও মাটি দু'টোই ব্যবহার করতে অক্ষম, চাই তার অক্ষমতা পানি ও মাটি না থাকার কারণে হোক অথবা অসুস্থতার কারণে। এমতাবস্থায় সে পবিত্রতা হাসিল না করেই নামায পড়ে নেবে। এরপর যখন পানি বা মাটি পাবে, তখন তদ্বারা পবিত্রতা হাসিল করে পুনরায় সে নামায পড়ে নেবে। যেমন, কেউ রেলগাড়িতে সফর করছে, এমতাবস্থায় ঘটনাক্রমে নামাযের সময় হয়ে যায় এবং রেলগাড়িতে পানি বা এমন কোন জিনিস যদ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হয়; যেমন মাটি বা মাটির পাত্র বা ধুলোবালি না থাকে এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে এমতাবস্থায় পবিত্রতা হাসিল ব্যতিরেকেই নামায পড়ে নেবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি জেলখানায় বন্দী থাকে এবং সে পাক পানি বা মাটি ব্যবহার করতে সক্ষম না হয়, তবে সে ওযূ ও তায়াম্মুম ব্যতিরেকে নামায পড়ে নেবে এবং উভয় অবস্থায় আদায়কৃত নামায পরবর্তীতে পবিত্রতা হাসিলের সুযোগ হলে পুনরায় পড়ে নিতে হবে।

৫. মাসআলা ঃ নামাযের ওয়াক্তের শেষভাগে যদি কারও পানি পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অথবা প্রবল ধারণা থাকে, তবে নামাযের মুসতাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়ার অপেক্ষা করা তার জন্য মুসতাহাব। যেমন, কূপ থেকে পানি বের করার মত কিছু নেই, কিন্তু এ নিশ্চিত বিশ্বাস অথবা প্রবল ধারণা আছে যে, মুসতাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যায় নাগাদ রশি, বালতি পাওয়া যাবে, অথবা কেউ রেলগাড়িতে সফর করছে এবং তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা আছে যে, নামাযের (মুসতাহাব) ওয়াক্তের শেষ পর্যায় নাগাদ গাড়ি এমন ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে পানি পাওয়া যেতে পারে তবে এমতাবস্থায় মুসতাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুসতাহাব।

৬. মাসআলা ঃ কেউ রেলগাড়িতে সফর করছে, এমতাবস্থায় সে পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করেছে। চলার পথে চলন্ত রেলগাড়ি থেকে সে পানির ঝর্ণা, পুকুর ইত্যাদি দেখল, এতে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় সে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম নয়, রেলগাড়ি (ষ্টেশন ব্যতীত) থামবে না এবং সেও চলন্ত রেলগাড়ি থেকে নামতে পারবে না।

[বেহেশতী যেওয়ার ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট সমাপ্ত]

বেহেশতী যেওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট

নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা

মুদরিক ঃ যে ব্যক্তি নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নামায কোন ইমামের পেছনে ইকতেদা করে জামাআতের সাথে আদায় করে তাকে মুদরিক বলে। এরূপ ব্যক্তিকে মুক্তাদী বা মু'তামও বলা হয়।

মাসবূক ঃ যে ব্যক্তি এক রাকআত বা ততোধিক নামায হয়ে যাওয়ার পর জামাআতে শরীক হয় তাকে মাসবূক বলে।

লাহেক ঃ যে ব্যক্তি কোন ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামাযে শরীক হয় এবং শরীক হওয়ার পর তার সে নামাযের সব ক'টি রাকআত বা কিছু রাকআত ছুটে যায়। চাই তা তার ঘুমিয়ে পড়ার দরুন ছুটুক অথবা কোন বড় বা ছোট হাদাছ সংঘটিত হওয়ার কারণে ছুটুক।

১. মাসআলা ঃ পুরুষদের জন্য ফজরের নামায এমন সময় শুরু করা মুসতাহাব, যখন (পূর্বাকাশে) আলোর আভা ভালভাবে প্রকাশ পায় এবং এতটুকু সময় বাকি থাকে যে, নামাযে চল্লিশ/পঞ্চাশ আয়াত ভালভাবে তিলাওয়াত করা যায় এবং নামাযের পরও এতটুকু সময় বাকি থাকে, যাতে কোন কারণে পুনরায় নামায পড়ার প্রয়োজন হলে পূর্বের ন্যায় চল্লিশ/পঞ্চাশ আয়াত ভালভাবে তিলাওয়াত করে নামায শেষ করা যায়।

মহিলাদের জন্য সর্বদা এবং পুরুষদের জন্য হজ্জ পালনকালে মুযদালিফায় ফজরের নামায অন্ধকার থাকতে পড়া মুসতাহাব।

২. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত এবং জোহরের নামাযের ওয়াক্ত একই। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়া উত্তম। চাই গরমের তীব্রতা বেশি থাকুক বা না থাকুক; এবং শীতকালে ওয়াক্তের শুরুতে পড়ে নেয়া উত্তম; কিন্তু জুমুআর নামায সব সময় ওয়াক্তের শুরুভাগে পড়া সুন্নত। অধিকাংশ ফিকাহবিদদের অভিমত এটাই।

৩. মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্য ভালভাবে উদিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত বাকি থাকে। উল্লেখ্য যে, সূর্য ভালভাবে উদিত হওয়া মানে, সূর্যের রক্তিমাভা দূরীভূত হয়ে যাওয়া। এবং সূর্যের কিরণ এ পরিমাণ প্রখর হওয়া, যাতে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া না যায়। এর পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ফিকাহবিদগণ লিখেছেন যে, সূর্য তার উদয়স্থল থেকে এক বর্শা

(ছয় হাত) পরিমাণ উপরে উঠে গেলে তখন ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। দুই ঈদের নামাযই যথাসম্ভব জলদি পড়া মুসতাহাব। তবে ঈদুল ফিতরের নামায ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর (ঈদুল আযহার নামায অপেক্ষা) কিছুটা বিলম্বে পড়া উচিত।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম যখন খুত্‌বা দানের জন্য স্বস্থান থেকে উঠে দাঁড়ান, চাই তা জুমুআর খুতবা হোক বা দুই ঈদ বা হজ্জ ইত্যাদির, তখন নামায পড়া মাকরূহ। এমনিভাবে বিবাহের খুতবা এবং কুরআন খতমের খুতবা শুরু করার পরও নামায পড়া মাকরূহ।

৫. মাসআলা ঃ যখন ফরয নামাযের তাকবীর বলা হয় (অর্থাৎ, জামাআত শুরু হয়ে যায়) তখনও নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু কারও যদি ফজরের সুন্নত না পড়া হয়ে থাকে এবং কোনভাবে এ বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় যে, জামাআতের এক রাকআত পাওয়া যাবে অথবা কারও মতে, তাশাহহুদের মধ্যে জামাআতে শরীক হওয়ার ভরসা থাকে [১] তবে ফজরের সুন্নত পড়ে নেওয়া মাকরূহ নয়। অথবা যে সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামায আগেই শুরু করেছে তা পূর্ণ করে নেবে।

৬. মাসআলা ঃ দুই ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরূহ। চাই তা ঘরে হোক বা ঈদগাহে (বা মসজিদে)। আর ঈদের নামাযের পর কেবল ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ (বাড়িতে পড়া মাকরূহ নয়)।

আযানের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ ওয়াক্তিয়া নামাযের জন্য যদি আযান দেওয়া হয়, তবে আযানের জন্য সেই নামাযের ওয়াক্ত হওয়া আবশ্যক। ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া হলে আযান শুদ্ধ হবে না। ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। চাই সেটা ফজরের আযান হোক বা অন্য কোন ওয়াক্তের আযান।

২. মাসআলা ঃ আযান ও ইকামত আরবী ভাষায় হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে আযানের যে সকল শব্দ বর্ণিত আছে অবিকল সে সকল শব্দেই আযান দেওয়া জরুরী। সুতরাং অন্য কোন ভাষায় অথবা আরবী ভাষার অন্য কোন শব্দে আযান বা ইকামত দেওয়া হলে তা শুদ্ধ হবে না; যদিও মানুষ তা শুনে আযান মনে করে এবং তদ্দ্বারা আযানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

৩. মাসআলা ঃ মুয়ায্‌যিন পুরুষ হওয়া আবশ্যক। মহিলার আযান দেওয়া জায়েয নয়। সুতরাং কোন মহিলা আযান দিলে (পুরুষ কর্তৃক) সে আযান

---

১. কিন্তু জাহের মাযহাব মুতাবিক, যদি ফজরের দু'রাকআত ফরযই ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় এবং কেবল তাশাহহুদে অংশ গ্রহণ করতে পারার আশা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ফজরের সুন্নত পড়বে না। দ্বিতীয় অভিমতটির প্রতি ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে সমর্থন থাকলেও আন-নাহরুল ফায়েক গ্রন্থে এটাকে দুর্বল অভিমত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পুনরায় দেওয়া উচিত। পুনরায় আযান না দিয়ে যদি নামায পড়ে নেওয়া হয় তবে যেন আযান ব্যতিরেকেই নামায পড়া হল।

৪. মাসআলা ঃ মুয়ায্যিন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া জরুরী। সুতরাং কোন অবুঝ বালক, পাগল বা বেহুঁশ ব্যক্তি আযান দিলে সেটা ধর্তব্য হবে না।

৫. মাসআলা ঃ আযান দেওয়ার সুন্নত তরীকা হচ্ছে এই যে, মুয়ায্যিনের গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে এবং ওযূ না থাকলে ওযূ করে পবিত্র হয়ে মসজিদের বাইরে কোন উঁচু জায়গায় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। তারপর দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ছিদ্র বন্ধ করে যথাসম্ভব উচ্চ শব্দে (এত উচ্চ শব্দে বলবে না যাতে কষ্ট হয়) এ শব্দগুলো বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ চারবার, اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দু'বার, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ দু'বার, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ দু'বার, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ দু'বার, পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ দু'বার, অতঃপর لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একবার বলে আযান শেষ করবে। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে এভাবে মুখ ফেরাবে, যাতে বক্ষ ও কদম কেবলা থেকে ফিরে না যায়। এমনিভাবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে এভাবে মুখ ফেরাবে, যাতে বক্ষ ও কদম ফিরে না যায়। ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পরে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এ বাক্যটিও দু'বার বলবে। এতে আযানের মোট ১৫টি বাক্য হল এবং ফজরের আযানের ১৭টি। আযানের বাক্যগুলো গানের মত সুর করে উচ্চারণ করবে না এবং কিছু বাক্য নিম্ন স্বরে ও কিছু বাক্য উচ্চৈঃস্বরে –এভাবেও আযান দেবে না। দু'বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে এতটুকু থামবে, যাতে শ্রোতা তার জওয়াব দিতে পারে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ ব্যতীত অন্যান্য বাক্যাবলীর ক্ষেত্রেও এক বাক্য বলার পর এ পরিমাণ থেমে পরবর্তী বাক্য বলবে।

৬. মাসআলা ঃ ইকামতের পদ্ধতিও আযানের মতই। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, (ক) আযান মসজিদের বাইরে দেওয়া হয়, অর্থাৎ, এটা উত্তম, কিন্তু ইকামত মসজিদের ভেতরে দিতে হয় (খ) আযান উচ্চৈঃস্বরে দিতে হয় কিন্তু ইকামত নিম্নস্বরে দিতে হয়, (গ) ইকামতের মধ্যে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ নেই, তার স্থলে পাঁচ ওয়াক্তেই قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার বলবে। (ঘ) ইকামত বলার সময় আঙ্গুল দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ করারও প্রয়োজন নেই। কেননা, আযানের আওয়াজ উচ্চ করার উদ্দেশ্যে কানের ছিদ্র বন্ধ করা হয়, কিন্তু ইকামতের মধ্যে সেটা উদ্দেশ্য নয়। (ঙ) ইকামতের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় ডান ও বাম দিকে মুখ ফেরাবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এটা জরুরী নয়,

তবে কোন কোন ফিকাহবিদ (মসজিদ বড় হলে প্রয়োজনবোধে) এরূপ করা যেতে পারে বলে লিখেছেন।

আযান ও ইকামতের বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ সকল ফরযে 'আইন নামাযের জন্য পুরুষদের একবার আযান দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। চাই নামাযী ব্যক্তি মুসাফির হোক বা মুকীম এবং নামায জামাআত সহকারে হোক বা একাকী, ওয়াক্তিয়া হোক বা কাযা। কিন্তু জুমুআর নামাযের জন্য দু'বার আযান দেওয়া সুন্নত।

২. মাসআলা ঃ নামায যদি এমন কোন সমস্যার কারণে কাযা হয়ে থাকে, যাতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে তবে সেই কাযা নামায পড়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আযান দেবে। কিন্তু যদি নিজের কোন বিশেষ কারণে নামায কাযা হয় তবে নিচু স্বরে আযান দেবে, যাতে অন্য লোক আযান শুনে নামায কাযা হওয়ার কথা জানতে না পারে। কেননা, কারও নামায কাযা হয়ে যাওয়া তার গালিতি ও অলসতার প্রতি ইঙ্গিত করে। অথচ দীনের কাজে গাফিলতি ও অলসতা করা গুনাহ এবং নিজের গুনাহর কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা অনুচিত। যদি কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে যায় এবং সবগুলো একই সময়ে পড়া হয়, তবে কেবল প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়া এবং বাকি নামাযগুলোর জন্য কেবল ইকামত দেওয়া সুন্নত। হাঁ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য পৃথক পৃথক আযান দেওয়া মুসতাহাব বটে।

৩. মাসআলা ঃ কোন সফররত কাফেলার যদি সমস্ত লোক উপস্থিত থাকে, তবে তাদের আযান দেওয়া মুসতাহাব– সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয়।

৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায পড়ে, একা পড়ুক বা জামাআতে, তার জন্য আযান ও ইকামত উভয়টি দেওয়া মুসতাহাব; যদি তার মহল্লার বা গ্রামের মসজিদে আযান ও ইকামত হয়ে গিয়ে থাকে। কেননা, মহল্লার মসজিদের আযান ও ইকামত সকল মহল্লাবাসীর জন্য যথেষ্ট।

৫. মাসআলা ঃ যে মসজিদে আযান ও ইকামত সহকারে নামায হয়ে গেছে সেখানে নামায পড়া হলে আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরূহ। হাঁ যদি সে মসজিদে কোন ইমাম ও মুয়ায্যিন নির্ধারিত না থাকে তবে মাকরূহ হবে না; বরং সে ক্ষেত্রে আযান ও ইকামত দেওয়া উত্তম।

৬. মাসআলা ঃ যেখানে জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় এবং জুমুআর নামায হয় সেখানে কোন ব্যক্তি যদি (জুমুআর দিন) জোহরের

নামায পড়ে, তবে তার আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরূহ। চাই সে জোহরের নামায কোন ওযরের কারণে পড়ুক বা ওযর ব্যতিরেকে এবং জুমুআর নামায সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পড়ুক বা পরে।

৭. মাসআলা ঃ মহিলাদের আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরূহ, চাই নামায জামাআতে পড়ুক বা একাকী।

৮. মাসআলা ঃ ফরযে 'আইন নামাযসমূহ ব্যতীত অন্য কোন নামাযে আযান ও ইকামত দেওয়া সুন্নত নয়। চাই ফরযে কিফায়া হোক; যেমন, জানাযার নামায, অথবা ওয়াজিব নামায হোক; যেমন, বিত্‌র ও দুই ঈদের নামায, অথবা অন্য যে কোন সুন্নত ও নফল নামায।

৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, পবিত্র অবস্থায় হোক বা জুনুবী, আযানের জওয়াব দেওয়া তার জন্য মুসতাহাব। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য ও সুস্পষ্ট অভিমত মুতাবিক মুসতাহাবই। অর্থাৎ, মুয়ায্‌যিনের যে বাক্য শুনবে উত্তরে সে বাক্যই বলবে। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর উত্তরে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলবে এবং اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -এর উত্তরে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলবে। আযানের পর (একবার) দরূদ শরীফ পড়ে এ দুআটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

১০. মাসআলা ঃ জুমুআর প্রথম আযান শুনে সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে জুমুআর নামাযের জন্য জামে মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। তখন বেচাকেনা বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত হওয়া হারাম।

১১. মাসআলা ঃ ইকামতের জওয়াব দেওয়াও মুসতাহাব। ওয়াজিব নয়। ইকামতের সময় قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ -এর উত্তরে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا বলবে।

১২. মাসআলা ঃ আট অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত নয় ঃ (১) নামাযের অবস্থায় (২) খুত্‌বা শুনার অবস্থায়, তা যে কোন খুতবা হোক, (৩) (৪) হায়েয ও নেফাসের সময়, অর্থাৎ, এ সময় আযানের জওয়াব দেওয়া জরুরী নয়। (৫) দীনী ইল্‌ম শেখার বা শেখাবার সময়, (৬) সঙ্গমরত অবস্থায়, (৭) পেশাব-পায়খানা করার সময়, (৮) খাবার খাওয়ার সময়, অর্থাৎ, এ সময় জওয়াব দেওয়া জরুরী নয়। তবে এ সব বিষয় (-এর মধ্যে যেগুলো থেকে

অবসর হওয়ার মত সেগুলো) থেকে অবসর হওয়ার পর যদি এমন হয় যে, আযান শেষ হওয়ার পর বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি, তবে আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত। অন্যথায় বেশিক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেলে আর জওয়াব দেবে না।

আযান ও ইকামতের সুন্নত ও মুসতাহাব

আযান ও ইকামতের সুন্নত দু'ধরনের ঃ কিছু মুয়ায্যিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু আযান ও ইকামতের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং আমি প্রথমে মুয়ায্যিন সম্পর্কিত ৫টি সুন্নতের আলোচনা করব, তারপর আযান সংক্রান্ত সুন্নতসমূহ বর্ণনা করব ঃ

১. মুয়ায্যিন পুরুষ হওয়া চাই, মহিলার আযান ও ইকামত মাকরূহ তাহরীমী। মহিলা আযান দিলে সে আযান পুনরায় দিতে হবে। কিন্তু মহিলা যদি ইকামত দেয়, তবে পুরুষ দ্বারা তার পুনরাবৃত্তি করবে না। কেননা, শরীয়তে ইকামতের পুনরাবৃত্তি করার বিধান নেই। হাঁ, আযানের পুনরাবৃত্তি করার বিধান আছে।

২. মুয়ায্যিন সজ্ঞান ব্যক্তি হওয়া চাই। সুতরাং পাগল, উন্মাদ ও অবুঝ বালকের আযান ও ইকামত মাকরূহ। এ ধরনের লোক আযান দিলে (যথোপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা) পুনরায় আযান দিতে হবে, তবে ইকামত পুনরায় দেবে না।

৩. মুয়ায্যিন (আযান ও নামাযের) জরুরী মাসায়েল এবং নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া চাই। সুতরাং যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি (যে নামাযের ওয়াক্ত চেনে না; বরং কাউকে জিজ্ঞেস করে) আযান দেয়, তবে সে মাসায়েল জানা মুয়ায্যিনের সমান সওয়াব পাবে না।

৪. মুয়ায্যিন দীনদার ও পরহেযগার হওয়া এবং মানুষের খোঁজ খবর রাখা চাই। যদি ফেত্‌নার আশঙ্কা না থাকে, তবে যারা নামাযের জামাআতে আসে না তাদেরকে সতর্ক করা উচিত।

৫. মুয়ায্যিন উচ্চস্বর বিশিষ্ট হওয়া।

৬. আযান মসজিদের বাইরে কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দেওয়া এবং ইকামত মসজিদের ভেতরে দেওয়া। মসজিদের ভেতরে আযান দেওয়া মাকরূহ তানযীহী। তবে জুমুআর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভেতরে মিম্বরের সামনে দেওয়া মাকরূহ নয়; বরং সকল মুসলিম অধ্যুসিত শহরে (সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই জুমুআর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভেতরে মিম্বরের সামনে দেওয়ার) এই প্রচলন চলে আসছে।

৭. দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া, কেউ বসে বসে আযান দেওয়া মাকরূহ। সে আযান পুনরায় দেওয়া চাই। হাঁ, কোন সফররত ব্যক্তি যদি বসে বসে আযান দেয়

অথবা কোন মুকীম ব্যক্তি যদি কেবল নিজের নামাযের জন্য আযান দেয়, তবে পুনরায় আযান দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৮. আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া অবশ্য যদি কেউ কেবল নিজের নামাযের জন্য আযান দেয় তবে তার ইচ্ছা; উচ্চৈঃস্বরেও দিতে পারে অথবা নিম্নস্বরেও দিতে পারে। কিন্তু তারপরও উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়াতে সওয়াব বেশি হবে।

১০. আযানের বাক্যগুলো থেমে থেমে বলা এবং ইকামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি বলা সুন্নত। অর্থাৎ, আযানের তাকবীরগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক দুই তাকবীরের পর এতটুকু থামবে, যাতে শ্রোতা তার জওয়ার দিতে পারে। তাকবীরগুলো ব্যতীত অন্যান্য বাক্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাক্যের পরও এ পরিমাণ সময় চুপ থেকে দ্বিতীয় বাক্য বলবে। কোন কারণে যদি কেউ এ পরিমাণ সময় থামা ব্যতিরেকে আযান দেয়, তবে তা পুনরায় দেওয়া মুসতাহাব। কিন্তু ইকামতের বাক্যগুলো যদি থেমে থেমে বলে, তবে তা পুনরায় দেওয়া মুসতাহাব নয়।

১১. আযানের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে মুখ ফেরানো এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরানো সুন্নত। চাই সে আযান নামাযের হোক বা অন্য কোন আযান; কিন্তু বক্ষ ও পা কেবলার দিক থেকে ফেরাবে না।

১২. আযান ও ইকামতদাতা যদি আরোহী না হয়, তবে কেবলামুখী হয়ে আযান ও ইকামত দেওয়া। কেবলামুখী হওয়া ব্যতিরেকে আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরূহ তানযীহী।

১৩. আযান দেওয়ার সময় বড় হাদাছ থেকে পাক হওয়া জরুরী এবং ছোট হাদাছ থেকেও পাক হওয়া মুসতাহাব। ইকামত বলার সময় উভয় হাদাছ থেকে পাক হওয়া আবশ্যক। বড় হাদাছ অবস্থায় যদি কেউ আযান দেয়, তবে সেটা হবে মাকরূহ তাহরীমী এবং সে আযান পুনরায় দেওয়া মুসতাহাব। এমনিভাবে কেউ যদি বড় বা ছোট হাদাছ অবস্থায় ইকামত বলে, তবে সেটাও মাকরূহ তাহরীমী হবে; কিন্তু সে ইকামত পুনরায় দেওয়া মুসতাহাব নয়।

১৪. আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে বলা সুন্নত। কেউ যদি পরবর্তী বাক্যকে আগে বলে; যেমন, কেউ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার পূর্বে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে ফেলে, অথবা কেউ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার পূর্বে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে ফেলে, তবে এক্ষত্রে কেবল পরবর্তী বাক্যটি পুনরায়

বলা আবশ্যক, যেটি সে পূর্বে বলে ফেলেছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে পুনরায় اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলবে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলে পুনরায় حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে। এতে সে আযান পুনরায় দেওয়া জরুরী হবে না।

১৫. আযান ও ইকামত দেওয়ার সময় অন্য কোন কথা না বলা। চাই তা সালাম হোক বা সালামের জওয়াবই হোক। আযান ও ইকামত দেওয়ার সময় যদি কেই অন্য কোন কথা বলে এবং সে কথার পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে সে আযান পুনরায় দেবে, কিন্তু ইকামত পুনরায় দেবে না।[১]

আযান ও ইকামত সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ আযানের জওয়াব দিতে ভুলে যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে জওয়াব না দেয়, অতঃপর আযান শেষ হওয়ার পর আযানের জওয়াবের কথা স্মরণে পড়ে অথবা জওয়াব দেওয়ার ইচ্ছা করে এবং আযান দেওয়ার পর যদি বেশি সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে তবে আযানের জওয়াব দেবে, নতুবা (বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়ে থাকলে) জওয়াব দেবে না।

২. মাসআলা ঃ ইকামত বলার পরে যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং নামাযের জামাআত না দাঁড়ায়, তবে পুনরায় ইকামত দেওয়া উচিত। হাঁ, যদি সামান্য বিলম্ব হয়ে থাকে, তবে ইকামত পুনরায় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যদি ইকামত হয়ে যায় এবং ইমাম ফজরের সুন্নত না পড়ে থাকে, অতঃপর ইমাম সুন্নত পড়ায় ব্যাপৃত হয় তবে এ সময়টুকু অধিক বিলম্ব বলে ধর্তব্য হবে না, সুতরাং ইকামত পুনরায় দিতে হবে না; কিন্তু কেউ যদি ইকামতের পর অন্য কোন কাজ করতে শুরু করে, যা নামায জাতীয় কিছু নয়, যেমন, পানাহার ইত্যাদি তবে সে ক্ষেত্রে ইকামত পুনরায় দেওয়া উচিত।

৩. মাসআলা ঃ মুয়ায্যিন যদি হঠাৎ আযানরত অবস্থায় মারা যায় অথবা বেহুঁশ হয়ে যায় অথবা তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় অথবা আযান ভুলে যায় এবং কেউ বলে দেওয়ার মত না থাকে অথবা তার হাদাছ হয়ে যাওয়ার কারণে সে হাদাছ দূরীভূত করতে চলে যায়, তবে সে আযান পুনরায় নতুন করে দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

---

১. এটা মুয়ায্যিন সংক্রান্ত বিধান। এমনিভাবে আযান ও ইকামত শ্রবণকারীরও আযান ও ইকামতের সময় তার জওয়াব দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কথা বলা, কুরআন তিলাওয়াতে ব্যাপৃত হওয়া অথবা অন্য কোন কাজ করা উচিত নয়। যদি কেউ কুরআন তিলাওয়াতে পূর্ব থেকেই ব্যাপৃত থেকে থাকে তবে আপাততঃ কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেবে এবং আযান ও ইকামত শোনা ও তার জওয়াব দেওয়ায় মশগুল হবে।

৪. মাসআলা ঃ আযান ও ইকামতরত অবস্থায় কারও যদি ছোট হাদাছ হয়ে যায়, তবে উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, আযান অথবা ইকামত শেষ করে তারপর সে হাদাছ দূর করতে যাবে।

৫. মাসআলা ঃ এক মুয়ায্যিনের দুই মসজিদের আযান দেওয়া মাকরূহ। যে মসজিদে ফরয পড়ে সেখানেই আযান দেবে।

৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি আযান দেবে ইকামত দেয়ার অধিকারও তারই। হাঁ, যদি সে আযান দিয়ে কোথাও চলে যায় অথবা অন্য কাউকে অনুমতি দেয়, তবে অন্য ব্যক্তিও দিতে পারবে।

৭. মাসআলা ঃ (একই মসজিদে) একাধিক মুয়ায্যিনের একই সাথে আযান দেওয়াও জায়েয।

৮. মাসআলা ঃ মুয়ায্যিন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ইকামত শুরু করবে সেখানেই শেষ করবে।

৯. আযান ও ইকামতের জন্য নিয়্যত করা শর্ত নয়, কিন্তু নিয়্যত ব্যতিরেকে ছওয়াব পাবে না। নিয়্যত এরূপ মনে মনে ইচ্ছা করবে যে, আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছওয়াব লাভের জন্য আযান (বা ইকামত) দিচ্ছি। এ ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

নামাযের শর্তাবলীর বর্ণনা

পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ কোন কাপড় যদি এতটুকু বড় হয় যে, (কাপড়টি পরে নামায পড়ার সময়) তার নাপাক অংশ নামাযরত ব্যক্তির উঠা বসা করার কারণে নড়াচড়া করে না, তবে এতে অসুবিধা নেই (অর্থাৎ, নামায নষ্ট হবে না)।

এমনিভাবে এরূপ যে কোন জিনিস পাক হওয়া চাই, যা নামাযরত ব্যক্তির নিকট রয়েছে এবং তা আপন শক্তিতে স্থির নয়, যেমন ঃ কোন নামাযরত ব্যক্তির কোলে বা কাঁধে কোন শিশু চড়ে বসে এবং সে শিশুর শরীর বা কাপড় নাপাক থাকে এবং শিশুটি আপন শক্তিতে স্থির নয় এবং সে শিশুটির গায়ে যদি এ পরিমাণ নাপাকী থাকে যা নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্তরায় হয়, তবে এমতাবস্থায় নামাযরত ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে না। সুতরাং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য সে শিশুটি পাক হওয়া শর্ত। কিন্তু যদি শিশুটি আপন শক্তিতে স্থির হয়ে বসে থাকে, তবে এতে নামাযরত ব্যক্তির নামাযের কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, শিশুটি আপন শক্তিতে স্থির হয়ে বসার কারণে স্বতন্ত্র গণ্য হবে। এতে সে শিশুটিই কেবল নাপাক বলে ধর্তব্য হবে এবং নামাযরত ব্যক্তির সাথে শিশুটির জড়িয়ে থাকার কারণে নামাযরত ব্যক্তির কাপড় বা শরীর নাপাক সাব্যস্ত হবে না।

এমনিভাবে কোন নামাযী ব্যক্তির শরীরে যদি এমন কোন নাপাকী লেগে থাকে, যা নাপাকীর উৎসস্থলেই রয়েছে এবং তার বাইরে নাপাকীর কোন আছর বিদ্যমান না থাকে, তবে এতে নামাযরত ব্যক্তির নামাযের ক্ষতি হবে না, যেমন ঃ নামাযরত ব্যক্তির শরীরের উপর কোন (শুকনো) কুকুর এসে বসে পড়ল এবং কুকুরটির মুখ থেকে লালা বের হয় না, তবে এতে তার নামাযের ক্ষতি হবে না। কেননা, কুকুরটির লালা তার শরীরের মধ্যে রয়েছে, যা লালা সৃষ্টি হওয়ার উৎসস্থল। সুতরাং এটা মানুষের পেটের ভেতরকার নাপাকীর মতই গণ্য হবে। এরূপ নাপাকী থেকে পাক হওয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

এমনিভাবে নামাযরত ব্যক্তির কাছে যদি এমন কোন ডিম থাকে, যার হলুদ অংশ রক্তে পরিণত হয়ে গেছে, তবে এতেও নামাযরত ব্যক্তির নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, ডিমটির রক্ত যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই রয়েছে, বাইরে তার কোন আছর প্রকাশ পায় নি; কিন্তু তার বিপরীতে যদি এমনটি হয় যে, একটি শিশিতে পেশাব ভর্তি রয়েছে এবং সে শিশি কোন নামাযরত ব্যক্তির কাছে থাকে এবং যদি শিশিটির মুখ বন্ধও থাকে (তবু এতে নামাযরত ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে না।) কেননা, শিশির পোশাবগুলো যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেখানে নেই।

২. মাসআলা ঃ নামায পড়ার জায়গা মুখ্য নাপাক বস্তু (যথা পেশাব, পায়খানা, বীর্য ইত্যাদি) থেকে পাক হওয়া আবশ্যক। হাঁ, নাপাকী যদি এ পরিমাণ হয় যা শরীয়তে ক্ষমার যোগ্য, তবে এতে নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত ক্ষতি হবে না। নামায পড়ার জায়গা মানে, যেখানে নামাযরত ব্যক্তির দাঁড়ানো অবস্থায় পা থাকে এবং সিজদার অবস্থায় তার হাঁটু, হাত, কপাল ও নাক থাকে।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন এক পায়ের জায়গা পাক থাকে এবং নামাযরত ব্যক্তি নামায পড়ার সময় অপর পা তুলে রাখে, তবে তাও নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন কাপড়ের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া হয়, তবে সেক্ষেত্রেও কাপড়ের এতটুকুই পাক হওয়া আবশ্যক, যেতটুকু উপরে উল্লিখিত হয়েছে সম্পূর্ণ কাপড় পাক হওয়া জরুরী নয়, চাই কাপড়টি ছোট হোক বা বড়।

৫. মাসআলা ঃ কোন নাপাক জায়গায় যদি কাপড় বিছিয়ে নামায পড়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে এও শর্ত যে, কাপড়টি এত পাতলা না হয়, যাতে নিচের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়।

৬. মাসআলা ঃ যদি নামায পড়ার সময় নামাযরত ব্যক্তির কাপড় কোন শুক্‌নো নাপাকীর উপর পড়ে, তবে এতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।[১]

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন মানুষের কার্যকলাপের কারণে কোন ব্যক্তি নামায পড়ার সময় (ছতর ঢাকার মত) কাপড় ব্যবহার করতে অক্ষম হয়, তবে সে (ছতর না ঢেকেই নামায পড়ে নেবে এবং সেই) অক্ষমতা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর ছতর না ঢাকা অবস্থায় পঠিত নামায পুনরায় পড়তে হবে। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি জেলখানায় রয়েছে এবং জেলখানার কর্মচারীরা তার কাপড় খুলে নেয় অথবা কোন শত্রু তার কাপড় খুলে নিয়ে যায় অথবা কোন শত্রু বলে যে, তুমি যদি কাপড় পর তবে আমি তোমাকে মেরে ফেলব।

আর যদি ছতর ঢাকার মত কাপড় পরার অপারগতা কোন মানুষের পক্ষ থেকে সৃষ্ট না হয়, তবে সে নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। যেমন ঃ ধরুন, কারও ছতর ঢাকার মত কাপড়ই নেই।

৮. মাসআলা ঃ যদি কারও কাছে একটি মাত্র কাপড় থাকে, যদ্বারা সে তার ছতর ঢাকতে পারে অথবা সে কাপড়টি নাপাক জায়গায় বিছিয়ে নামায পড়তে পারে, এমতাবস্থায় সে কাপড়টি দ্বারা ছতর ঢেকে নেবে এবং নামায পড়ার মত এতটুকু পাক জায়গা পাওয়া না গেলে সেই নাপাক স্থানে দাঁড়িয়েই নামায পড়ে নেবে।

কেবলা সংক্রান্ত মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ একদল লোক যদি এরূপ অবস্থায় পতিত হয় যে, কেবলা কোন দিকে তা কারও জানা নেই এবং এমতাবস্থায় তারা জামাআতে নামায পড়তে ইচ্ছা করে তখন (প্রকৃত পক্ষে কেবলা কোন দিকে হতে পারে তা নিয়ে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে এবং যার যে দিকে কেবলা বলে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় সে মুতাবিক) ইমাম ও মুক্তাদী সকলে নিজ নিজ প্রবল ধারণার উপর আমল করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন মুক্তাদীর প্রবল ধারণা যদি ইমামের মতের ব্যতিক্রম হয়, তবে সে ইমামের পেছনে তার নামাযের ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। কেননা, তার ধারণা মতে, ইমাম ভুলের উপর রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কাউকে ভুলের অনুসারী মনে করে তার পেছনে ইকতেদা করা জায়েয নয়।[২]

---

১. অর্থাৎ, যখন পাক জায়গায় দাঁড়ায় এবং সিজদা করার সময় কাপড় যে জায়গায় পড়ে সে জায়গাটি শুক্‌নো হয় অথবা জায়গাটি সেঁতসেঁতে ভেজা, কিন্তু তার উপর কাপড় পড়ার কারণে কাপড়ে এ পরিমাণ নাপাকী প্রকাশ না পায়, যা নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্তরায় হয়।

২. সুতরাং এমতাবস্থায় সে মুক্তাদীর একাকী নামায পড়া উচিত এবং সে দিকে ফিরে নামায পড়া উচিত, যে দিকে কেবলা বলে তার প্রবল ধারণা হয়।

নিয়্যত সম্পর্কিত মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ মুক্তাদীর জন্য তার ইমামের ইকতেদার নিয়্যত করাও শর্ত।

২. মাসআলা ঃ ইমামের জন্য কেবল নিজের নামাযের নিয়্যত করা শর্ত। ইমামতির নিয়্যত করা শর্ত নয়। কিন্তু যদি কোন মহিলা তার পেছনে নামায পড়তে চায় এবং পুরুষ মুক্তাদীদের পাশাপাশি দাঁড়ায় এবং সেটা জানাযা, জুমুআ বা দুই ঈদের নামায না হয়, তবে সে মহিলার ইকতেদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমামের ইমামতির নিয়্যত করা শর্ত। আর যদি মহিলা মুক্তাদী পুরুষদের পাশাপাশি না দাঁড়ায় অথবা যদি জানাযা, জুমুআ বা ঈদের নামায হয়, তবে ইমামের ইমামতির নিয়্যত করা শর্ত নয়।

৩. মাসআলা ঃ মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা শর্ত নয় যে, সে কি যায়েদ না কি উমর; বরং কেবল এতটুকু নিয়্যতই যথেষ্ট হবে যে, আমি এ ইমামের পেছনে নামায পড়ছি। কিন্তু যদি ইমামের নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করে ফেলে এবং তারপর তার ব্যতিক্রম প্রকাশ পায়, তবে এতে তার নামায শুদ্ধ হবে না। যেমন ঃ কেউ এ নিয়্যত করল যে, আমি যায়েদের পেছনে নামাযের ইকতেদা করছি, অথচ দেখা গেল যে, যার পেছনে সে নামায পড়ছে সে ছিল খালেদ, তখন তার (সেই মুক্তাদীর) নামায শুদ্ধ হবে না।

৪. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে এ নিয়্যত করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও এই মৃত ব্যক্তির দু'আর উদ্দেশ্যে এ নামায পড়ছি। যদি মুক্তাদীর এটা জানা না থাকে যে, মৃত ব্যক্তি পুরুষ না কি মহিলা তবে তার এতটুকু নিয়্যত করা যথেষ্ট হবে যে, আমার ইমাম যার নামাযে জানাযা পড়ছে আমিও তার নামাযে জানাযা পড়ছি। [১]

কোন কোন ফিকাহবিদ আলেমের মতে, সঠিক অভিমত হচ্ছে এই যে, ফরয ও ওয়াজিব নামায ব্যতীত অন্য যে কোন নামাযে কেবল নামাযের নিয়্যত করলেই যথেষ্ট হবে। এভাবে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই যে, এটা সুন্নত নামায নাকি মুসতাহাব এবং এটা কি ফজরের ওয়াক্তের সুন্নত না কি জোহরের ওয়াক্তের, না কি এটা তাহাজ্জুদ, তারাবীহ্, কুসূফ বা খুসূফের সুন্নত। কিন্তু প্রবল ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে এই যে, কোন নামায পড়ছে তা নির্দিষ্টভাবে নিয়্যত করবে।

---

১. অর্থাৎ, আমার ইমাম যদি মহিলার নামাযে জানাযা পড়ে, তবে আমিও মহিলার নামাযে জানাযা পড়ছি, আর যদি ইমাম পুরুষের নামাযে জানাযা পড়ে, তবে আমি ও পুরুষের নামাযে জানাযা পড়ছি।

তাকবীরে তাহরীমার বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ কোন কোন অনবগত লোক মসজিদে এসেই যখন ইমামকে রুকুতে দেখতে পায় তখন দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে হতেই ঝুঁকে পড়ে এবং সে অবস্থাতেই তাকবীরে তাহরীমা বলে। যারা এরূপ করে তাদের নামায শুদ্ধ হয় না। কেননা, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাকবীরে তাহরীমা শর্ত, আর তাকবীরে তাহরীমার জন্য দাঁড়ানো শর্ত। সুতরাং না দাঁড়ানোর কারণে তাকবীরে তাহরীমা শুদ্ধ হয় নি। যেহেতু তাকবীরে তাহরীমা শুদ্ধ হয় নি তাই তার নামায কি করে শুদ্ধ হবে।

ফরয নামাযের কতিপয় মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ آمِيْن -এর আলিফ দীর্ঘ করে পড়া চাই। তারপর কুরআন পাকের কোন সূরা পড়বে।

২. মাসআলা ঃ যদি সফরের অবস্থা হয় অথবা কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে ইখতিয়ার আছে, সূরা ফাতেহার পর যে সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। কিন্তু যদি সফর বা কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে ফজর ও জোহরের নামাযে সূরা হুজুরাত ও সূরা বুরুজসহ এ দু'টির মধ্যবর্তী সূরাসমূহ থেকে যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। ফজরের প্রথম রাকআতে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা বড় সূরা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাকি অন্যান্য ওয়াক্তে দুই রাকআতের সূরা দু'টি সমান সমান হওয়া চাই। এক দুই আয়াত কম বা বেশি হলে তা ধর্তব্য নয়। আসর ও ইশা'র নামাযে সূরা তারেক ও সূরা বায়্যিনাসহ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সূরাসমূহ থেকে যে কোন সূরা পড়বে। মাগরিবের নামাযে সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহ থেকে যে কোন সূরা পড়বে।

৩. মাসআলা ঃ যখন রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তখন ইমাম কেবল سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ মুক্তাদী কেবল رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এবং একাকী নামাযরত ব্যক্তি উভয়টি বলবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে দু'হাত হাঁটুর উপর রেখে সিজদায় যাবে। আল্লাহু আকবার এর শেষ এবং সিজদার শুরু একই সাথে হওয়া চাই। অর্থাৎ, সিজদায় পৌঁছেই তাকবীর শেষ হবে।

৪. মাসআলা ঃ সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু ভূমিতে রাখবে, তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল রাখবে। মুখ উভয় হাতের মাঝখানে থাকবে। আঙ্গুলগুলো মিলিতভাবে কেবলামুখী করে রাখবে। উভয় পায়ের তালু আঙ্গুলের মাথার উপর দণ্ডায়মান থাকবে। আঙ্গুলগুলোর মাথা কেবলার দিকে থাকবে। পেট

হাঁটু (উরু) থেকে এবং বাহু বগল থেকে পৃথক থাকবে। পেট ভূমি থেকে এতটুকু উঁচুতে থাকবে, যেন বকরীর অতি ছোট্ট একটি বাচ্চা সে ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।

৫. মাসআলা ঃ ফজর, মাগরিব ও ইশা'র ওয়াক্তের ফরযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও অন্যান্য সকল তাকবীর ইমাম সশব্দে বলবে। একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তির কেরাআতের ব্যাপারে ইখতিয়ার আছে, (সশব্দেও পড়তে পারে এবং নীরবেও পড়তে পারে)। কিন্তু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও অন্যান্য তাকবীরগুলো নীরবে বলবে। জোহর ও আসরের ওয়াক্তে ইমাম কেবল سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও অন্যান্য তাকবীরগুলো সশব্দে বলবে এবং একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তি নীরবে বলবে। মুক্তাদী সবসময় তাকবীর ইত্যাদি নীরবে বলবে।

৬. মাসআলা ঃ নামায শেষ হওয়ার পর উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত তুলে সম্প্রসারিত করে ধরবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের জন্য দু'আ করবে। ইমাম মুক্তাদীদের জন্যও দু'আ করবে। দু'আ করার পর উভয় হাত মুখের উপর মুছবে। মুক্তাদীরা হয় নিজে নিজে দু'আ করবে অথবা ইমামের দু'আ শোনা গেলে চায় তো আমীন আমীন বলতে থাকবে।

৭. মাসআলা ঃ যে সকল নামাযের পর সুন্নত রয়েছে যেমন ঃ জোহর, মাগরিব ও 'ইশা, এ সব নামাযের পরে দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করবে না; বরং সংক্ষিপ্ত দু'আ করে সুন্নত পড়ার ব্যাপৃত হবে। আর যে সকল নামাযের পর সুন্নত নেই, যেমন ঃ ফজর, আসর, সেগুলোর পর যতদীর্ঘ সময় ধরে ইচ্ছা, দু'আ করবে। ইমাম হলে ডান দিকে বা বাম দিকে ফিরে মুক্তাদীদের অভিমুখী হয়ে বসবে। অতঃপর তার সামনে যদি কোন মাসবূক নামাযরত না থাকে তবে দু'আ করবে।

৮. মাসআলা ঃ ফরয নামাযের পর সুন্নত না থাকলে ফরযের পরপরই,নতুবা সুন্নত থাকলে সুন্নতের পরে তিনবার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ একবার করে আয়াতুল কুরসী, সূরা আহাদ, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়া এবং তেত্রিশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ তেত্রিশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ চৌত্রিশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া মুসতাহাব।

৯. মাসআলা ঃ মহিলারাও এভাবেই নামায পড়বে, কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের ব্যতিক্রম করবে। সেগুলোর বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষরা চাদর ইত্যাদি থেকে হাত বের করে– যদি হাত চাদরের ভেতরে রাখার মত তীব্র ঠান্ডা বা অন্য কোন কারণ না থাকে–

কান পর্যন্ত উঠাবে, পক্ষান্তরে মহিলারা সবসময় কাপড় থেকে হাত বের না করে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে।

২. তাকবীরে তাহরীমার পর পুরুষরা নাভির নিচে হাত বাঁধবে, কিন্তু মহিলারা বাঁধব বুকের উপর।

৩. পুরুষরা (ডান হাতের) কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বেষ্টনী বেঁধে বাম হাতের কব্জি ধরবে এবং ডান হাতের অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছিয়ে রাখবে, কিন্তু মহিলা ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা বেষ্টনী বানাতে হবে না এবং বাম হাতের কব্জি ধরতে হবে না।

৪. পুরুষরা রুকূতে ভালভাবে ঝুঁকবে। এভাবে ঝুঁকবে যাতে মাথা, নিতম্ব ও পিঠ সমান থাকে। মহিলাদের এতটুকু ঝুঁকতে হবে না; বরং কেবল এ পরিমাণ ঝুঁকবে, যাতে হাত হাঁটুতে পৌঁছে।

৫. পুরুষরা রুকূতে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে হাটুতে রাখবে, কিন্তু মহিলারা আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করবে না; বরং মিলিয়ে রাখবে।

৬. পুরুষরা রুকূতে হাতের কনুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখবে, আর মহিলারা পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৭. পুরুষরা সিজদায় পেট উরু থেকে এবং বাহু বগল থেকে পৃথক রাখবে এবং মহিলারা মিলিয়ে রাখবে।

৮. পুরুষরা সিজদায় হাতের কনুই ভূমি থেকে পৃথক রাখবে এবং মহিলারা ভূমিতে বিছিয়ে রাখবে।

৯. পুরুষরা উভয় পা সিজদার সময় আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড় করিয়ে রাখবে, কিন্তু মহিলাদের এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে না।

১০. পুরুষরা বসা অবস্থায় বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান পাকে আঙ্গুলের মাথার উপর ভর করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। আর মহিলারা বাম নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে। এভাবে বের করে দেবে যে, ডান উরু বাম উরুর উপর এবং ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের গোছার উপর এসে যায়।

১১. মহিলারা কোন সময় সশব্দে কেরাআত পড়তে পারবে না; বরং মহিলারা সব সময় চুপে চুপে কেরাআত পড়বে।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

১. মাসআলা ঃ মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য এ নামায পড়া সুন্নত।

২. মাসআলা ঃ এ নামায দ্বারা মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন। কেননা, গৃহের মালিকের

প্রতি লক্ষ করেই কোন গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়। মসজিদে প্রবেশ করার সময় যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়, তবে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়বে।

৩. মাসআলা ঃ মসজিদে প্রবেশ করার সময় যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয়, তবে (নামায পড়বে না, বরং) কেবল এ তাসবীহটি চারবার পড়বে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

তারপর যে কোন দরূদ শরীফ পড়বে।

নামাযের নিয়্যত এভাবে করবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

অথবা নিজ ভাষায় এভাবে বলবে বা মনে মনে চিন্তা করে নেবে যে, "আমি দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার নিয়্যত করছি।"

৪. মাসআলা ঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকআতই হতে হবে এখন কোন কথা নেই। চার রাকআত পড়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। মসজিদে প্রবেশ করেই যদি কোন ফরয নামায পড়া হয় অথবা কোন সুন্নত নামায আদায় করা হয়, তবে সেই ফরয বা সুন্নত নামাযই তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সেই ফরয বা সুন্নত নামায দ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার ছওয়াব পাওয়া যাবে। যদিও তাতে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যত না করা হয়।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ে এবং তারপর তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ে তবে তাতেও কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু উত্তম হচ্ছে বসার পূর্বে পড়া।

হাদীস ঃ নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।

৬. মাসআলা ঃ যদি মসজিদে বারবার প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়, তবে একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ে নিলেই চলবে। চাই প্রথমবারেই পড়ুক বা শেষবারে।

সফরের নফল নামায

১. মাসআলা ঃ যখন কেউ নিজ আবাসস্থল ছেড়ে সফরে যেতে ইচ্ছা করে, তখন বাড়িতে দু'রাকআত নামায পড়ে সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়া মুসতাহাব। এমনিভাবে যখন সফর থেকে দেশে ফিরবে তখন বাড়িতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথমে মসজিদে যেয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে, তারপর বাড়িতে প্রবেশ করবে।

হাদীস ঃ নবী করীম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি সফরের প্রাক্কালে বাড়িতে পড়া দুই রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম কোন বস্তু বাড়িতে রেখে যায় না।

হাদীস ঃ নবী করীম (সা.) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে যেয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন। (অতঃপর গৃহে প্রবেশ করতেন)।

২. মাসআলা ঃ সফররত ব্যক্তি যখন সফরকালে কোন জায়গায় গিয়ে উঠে এবং সেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা করে, তখন বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ে নেওয়া তার জন্য মুসতাহাব।

মৃত্যুকালীন নামায

১. মাসআলা ঃ যখন কোন মুসলমানকে মৃত্যু দণ্ড বা হত্যা করা হয়, তখন তার মৃত্যুর পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ে নিজের সকল গুনাহ্ খাতার ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা মুসতাহাব। যাতে এই নামায ও ইসতেগফার দুনিয়ায় তার শেষ আমল হিসাবে থাকে।

হাদীস ঃ একদা নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবীদের থেকে কয়েকজন কারীকে কুরআনপাক শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক জায়গায় পাঠিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে মক্কার কাফিররা তাদেরকে গ্রেফতার করে হযরত খুবায়িব (রা.) ব্যতীত অন্য সবাইকে সেখানে হত্যা করে ফেলে। হযরত খুবায়িব (রা.)-কে মক্কায় নিয়ে যেয়ে অতি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এবং বিশেষ সমারোহের সাথে শহীদ করে। তখন তিনি শহীদ হওয়ার প্রাক্কালে কাফিরদের থেকে অনুমতি নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়েন। তখন থেকে এ নামায মুসতাহাব হয়।

তারাবীহ্র নামাযের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ বিত্রের নামায তারাবীহ্র নামাযের পরে পড়া উত্তম। যদি তারাবীহ্র পূর্বে পড়ে তবে তাও জায়েয।

২. মাসআলা ঃ তারাবীহ্র নামাযের প্রতি চার রাকআত পর এতটুকু সময় বসা মুসতাহাব, যতটুকুতে চার রাকআত নামায পড়া হয়েছে, কিন্তু যদি এতটুকু সময় বসলে মানুষের কষ্ট হয় এবং নামাযের জামাআতে লোকের উপস্থিতি কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এর চেয়ে কম সময় বসবে। এই বসাকালে হয় একাকী নফল নামায পড়বে, নতুবা চায় তো তাসবীহ্ ইত্যাদি পড়বে অথবা চুপ করে বসে থাকবে।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইশা'র নামাযের পর তারাবীহ পড়ে ফেলে; তারাবীহ পড়ার পর জানতে পারল যে, ইশা'র নামাযে এমন কোন বিষয় সংঘটিত হয়েছিল, যার কারণে ইশা'র নামায শুদ্ধ হয় নি। তখন তার ইশা'র নামায পুনরায় পড়ার পর তারাবীহর নামাযও পুনরায় পড়তে হবে।

৪. মাসআলা ঃ ইশা'র নামায যদি জামাআত সহকারে না পড়া হয়, তবে তারাবীহও জামাআত সহকারে পড়বে না। কেননা, তারাবীহ ইশা'র অনুগামী। (সুতরাং ইশা'র নামায জামাআত সহকারে না পড়লে তারাবীহ জামাআত সহকারে পড়া জায়েয হবে না।) কিন্তু যারা জামাআত সহকারে ইশা'র নামায পড়ে জামাআতে তারাবীহ পড়ছে তাদের সাথে শরীক হয়ে এরূপ ব্যক্তিও তারাবীহর নামায জামাআত সহকারে পড়তে পারে, যে ব্যক্তি ইশা'র নামায জামাআত ব্যতিরেকে একাকী পড়েছে। কেননা, এরূপ ব্যক্তি তাদের অনুগামী বলে বিবেচিত হবে যাদের জন্য (তারাবীহর) জামাআত জায়েয।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন সময় মসজিদে পৌছে, যখন ইশা'র নামায হয়ে গেছে, তখন তাকে প্রথমে ইশা'র নামায পড়তে হবে। তারপর তারাবীহে শরীক হবে। যদি ইত্যবসরে তারাবীহ্র কিছু রাকআত ছুটে যায় সেগুলো বিত্রের নামায পড়ার পর পড়বে এবং এরূপ ব্যক্তি বিত্রের নামায জামাআত সহকারে পড়বে।

৬. মাসআলা ঃ (সম্পূর্ণ রমযান) মাসে একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ ধারাবাহিকভাবে তারাবীহ্র নামাযে পড়া (খতম করা) সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অলসতা বা গাফিলতি করে এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি এ আশঙ্কা হয় যে, যদি সম্পূর্ণ কুরআন পাক পড়া হয় তবে মানুষ নামাযে আসবে না এবং নামাযের জামাআত হবে না অথবা তাদের বেশি অমনঃপূত হবে, তবে যতটুকু পড়লে মানুষের কষ্ট না হয় ততটুকু পড়বে। সূরা ফীল থেকে শেষ পর্যন্ত এ দশটি সূরা পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে একটি করে সূরা পড়বে। যখন দশ রাকআত হয়ে যাবে তখন সূরাগুলোকে পুনরায় পড়বে, অথবা অন্য যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে।

৭. মাসআলা ঃ তাবাবীহ্র নামাযে কুরআন পাকের অধিক খতমের প্রতি মানুষের আগ্রহ বুঝা না গেলে এক খতমের বেশি পড়বে না।

৮. মাসআলা ঃ যদি মানুষের অতি বেশি আগ্রহ থাকে এবং ভারি মনে না করে, তবে এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন পাক খতম করা জায়েয।[১] যদি মানুষ ভারী মনে করে এবং তাদের অমনঃপূত হয়, তবে এরূপ করা মাকরূহ।

৯. মাসআলা ঃ তাবাবীহ্র নামাযে কোন সূরার শুরুতে একবার উচ্চৈঃস্বরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। কেননা, বিসমিল্লাহও কুরআন পাকের একটি আয়াত, যদিও কোন সূরার অংশ নয়। সুতরাং বিসমিল্লাহ যদি একেবারেই না পড়া হয়, তবে সম্পূর্ণ কুরআন পাক খতম হতে এক আয়াত বাকি থেকে যাবে।

---

১. বর্তমানে প্রচলিত শবীনা খতম উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান ইসলামের রুসূম–এ দ্রষ্টব্য। তা মাকরূহ।

আর যদি নিঃশব্দে পড়া হয়, তবে মুক্তাদীদের পূর্ণ কুরআন পাক শ্রবণের খতম পূর্ণ হবে না।

১০. মাসআলা ঃ তারাবীহ সম্পূর্ণ পড়া সুন্নত। যদিও মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাক খতম হয়ে যায়। যেমন ঃ পনের দিনে যদি সম্পূর্ণ কুরআন পাক খতম করা হয়, তবে বাকি দিনগুলোতেও তারাবীহ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

১১. মাসআলা ঃ সঠিক অভিমত মুতাবিক, বর্তমানে তারাবীহ্‌র নামাযে তিনবার সূরা আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ) পড়ার যে প্রচলন রয়েছে তা মাকরূহ।[১]

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায

১. মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নত।

২. মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণের নামায জামাআত সহকারে আদায় করবে, যদি জুমুআর ইমাম বা দেশের (মুসলমান) শাসনকর্তা বা তার প্রতিনিধি ইমামতি করে। এক বর্ণনা মতে, প্রত্যেক ইমাম নিজ মসজিদে সূর্যগ্রহণের নামায পড়াতে পারেন।

৩. মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেবে না; বরং মানুষদের একত্র করতে হলে সূর্যগ্রহণের নামায হওয়ার ঘোষণা দেবে।

৪. মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে বড় বড় সূরা, যেমন ঃ সূরা বাকারা ইত্যাদি পড়া এবং অতি দীর্ঘ রুকূ ও সিজদা করা সুন্নত। এ নামাযে কেরাআত নিঃশব্দে পড়বে।

৫. মাসআলা ঃ নামাযের পর ইমাম দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে এবং মুক্তাদীরা আমীন আমীন বলতে থাকবে। এভাবে সূর্য সম্পূর্ণ গ্রহণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দু'আয় মশগুল থাকবে। কিন্তু যদি এমতাবস্থায় সূর্য অস্ত যায় অথবা অন্য কোন (ফরয) নামাযের সময় হয়ে যায় তবে অবশ্য দু'আ বন্ধ করে নামায পড়ে নেবে।

৬. মাসআলা ঃ চন্দ্রগ্রহণের সময়ও দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নত। কিন্তু এতে জামাআত সুন্নত নয়। প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়বে এবং নিজ নিজ গৃহে পড়বে এবং এজন্য মসজিদে যাওয়াও সুন্নত নয়।

---

১. মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, আজকাল সাধারণ মানুষ এটাকে কুরআন খতমের জন্য আরিহার্য বিষয় মনে করে নিয়েছে। তাদের আমল থেকে এমনটিই প্রকাশ পায়। এ কারণে এটা মাকরূহ। নতুবা কুরআনের কোন সূরা পুনর্বার পড়া মূলতঃ মাকরূহ নয়। হযরত থানবী (রহ.) ইমাদাদুল কফতাওয়া'র তৃতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ১১৮) এক প্রশ্নের উত্তরে এরূপই লিখেছেন। অতএব, কোন সূরা পুর্নবার পড়া মূলতঃ মাকরূহ হোক বা জায়েয, যাই-হোক উপরিউক্ত প্রথা পরিত্যাজ্য।

৭. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যখন কোন ভয়াবহ অবস্থা বা বিপদ-আপদ দেখা দেয়, তখনও নামায পড়া সুন্নত। যেমন ঃ প্রবল আঁধি বায়ু (ঝড়) প্রবাহিত হওয়া, ভূমিকম্প দেখা দেওয়া, বজ্রপাত হওয়া, অধিক হারে নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হওয়া, বেশি বরফ পড়া, বেশি বৃষ্টিপাত হওয়া, কোন মহামারি, যেমন ঃ ডায়রিয়া কলেরা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়া, কোন শত্রু ইত্যাদির ভয় হওয়া। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে যে নামায পড়া হবে তাতে জামাআত করবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে পৃথক পৃথকভাবে পড়বে। নবী করীম (সা.)-এর সামনে যখন কোন বিপদ-আপদ বা পেরেশানী দেখা দিত, তখন তিনি নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

৮. মাসআলা ঃ এখানে যে সকল নামাযের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়াও যত বেশি নফল নামায পড়বে তত বেশি ছওয়াব পাবে এবং মর্তবা বুলন্দ হবে। বিশেষ করে যে সকল ক্ষেত্রে হাদীসে নফল নামায পড়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে নফল নামায পড়ার জন্য নবী করীম (সা.) উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন ঃ রমযান মাসের শেষ দশ দিনের রাত্রিগুলো ও শা'বানের পনের তারিখের রাত্রির বহু ফযীলত রয়েছে। এ সকল রাতে ইবাদত করার অনেক ছওয়াব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমি গ্রন্থের কলেবর সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছায় এ সবের বিশদ বিবরণ এখানে বিবৃত করি নি।

বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

যখন বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, অথচ বৃষ্টি হয় না তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আ করা সুন্নত। বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দু'আ করার মুসতাহাব নিয়ম এই যে, সমস্ত মুসলমান মিলিত হয়ে সাথে ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ লোকজন ও গবাধি পশু নিয়ে ভীতি ও বিনয়ের সাথে পায়ে হেঁটে আটপৌড়ে পোষাক পরে উন্মুক্ত ময়দানে যাবে এবং নতুন করে তওবা করবে। হকদারদের হক আদায় করে দেবে। ময়দানে যাওয়ার সময় সাথে কোন কাফিরকে নেবে না। এরপর আযান ও ইকামত ব্যতীত দুই রাকআত নামায জামাআত সহকারে পড়বে। এতে ইমাম সশব্দে কেরাআত পড়বে। তারপর দু'টি খুতবা পাঠ করবে; যেমনটি ঈদের দিন করা হয়।[১] অতঃপর ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং দু'হাত তুলে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টি বর্ষণের জ্য দু'আ করবে এবং উপস্থিত সকল লোকজনও দু'আ করবে। তিন দিন পর পর এভাবেই করবে। তিন দিনের বেশি করবে না, কেননা, শরীয়তে তিন দিনের বেশি করার প্রমাণ নেই। যদি ময়দানে বের হওয়ার পূর্বে বা একদিন নামায পড়ার পর বৃষ্টি হয়ে যায়, তবুও তিনদিন পূর্ণ করবে। এ তিন দিন রোযা রাখাও মুসতাহাব এবং ময়দানে যাওয়ার পূর্বে সদকা-খয়রাত করাও মুসতাহাব।

---

১. অর্থাৎ, ঈদের দিন যেমন নামাযের পরে খুতবা পাঠ করা হয় তেমনি এতেও নামাযের পর উভয় খুতবা পাঠ করবে।

নামাযের ফরয ও ওয়াজিব সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নামায ইমামের পেছনে পড়ে তার নামাযে কেরাআত পড়তে হবে না। ইমামের কেরাআতই সকল মুক্তাদীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। হানাফী ফিকাহবিদদের মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কেরাআত পড়া মাকরূহ।

২. মাসআলা ঃ মাসবূকের (এক রাকআত ছুটে গেলে) এক রাকআতে (তার বেশি ছুটে গেলে) দুই রাকআতে কেরাআত পড়া ফরয।

৩. মাসআলা ঃ সারকথা এই যে, ইমাম থাকতে মুক্তাদীর কেরাআত পড়তে হবে না। কিন্তু মাসবূকের যেহেতু ছুটে যাওয়া রাকআতগুলোতে ইমাম থাকে না তাই সেগুলোতে তার কেরাআত পড়বে হবে।

৪. মাসআলা ঃ সিজদার জায়গা দাঁড়াবার জায়গা থেকে এক হাতের অধিক উঁচু না হওয়া চাই। এক হাতের চেয়ে অধিক উঁচু জায়গায় সিজদা করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে জায়েয হবে। যেমন ঃ জামাআত অনেক বড় এবং লোকজন এভাবে মিলিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ভূমিতে সিজদা করা সম্ভব নয়, তবে এমতাবস্থায় নামাযরতদের পিঠের উপর সিজদা করা জায়েয; যার পিঠের উপর সিজদা করা হয় এবং যে ব্যক্তি পিঠের উপর সিজদা করে উভয় ব্যক্তি যদি একই নামাযে রত থাকে।

৫. মাসআলা ঃ দুই ঈদের নামাযে অন্যান্য নামাযের মত নিয়মিত তাকবীরগুলো ছাড়াও ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

৬. মাসআলা ঃ ফজরের দুই রাকআতে, মাগরিব ও ইশা'র প্রথম দুই রাকআতে, চাই কাযা হোক বা ওয়াক্তিয়া এবং জুমুআ ও দুই ঈদের নামাযে, তারাবীহ্র নামাযে এবং রমযান মাসে বিত্রের নামাযে ইমামের সশব্দে কেরাআত পড়া ওয়াজিব।

৭. মাসআলা ঃ ফজরের দুই রাকআতে এবং মাগরিব ও ইশা'র প্রথম দুই রাকআতে একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে, সশব্দেও কেরাআত পড়তে পারে এবং নিঃশব্দেও পড়তে পারে। ফিকাহবিদগণ সশব্দে

পড়ার এই মাত্রা নির্ধারণ করেছেন যে, কেরাআত যাতে অন্য ব্যক্তি শুনতে পায় এবং নিঃশব্দে পড়ার এই সীমা বর্ণনা করেছেন যে, কেরাআত পাঠকারী নিজে শুনতে পারে এবং অন্যে শুনতে না পায়।[১]

৮. মাসআলা ঃ জোহর ও আসরের সকল রাকআতে এবং মাগরিবও ইশা'র শেষের দুই রাকআতে ইমামের এবং একাকী না নামায পালনকারী ব্যক্তির নিঃশব্দে কেরাআত পড়া ওয়াজিব।

৯. মাসআলা ঃ যে সকল নফল নামায দিনে পড়া হয় সেগুলোতে নিঃশব্দে কেরাআত পড়বে এবং যে সকল নফল নামায রাত্রিতে পড়া হয় সেগুলোতে ইখতিয়ার আছে; সশব্দেও পড়তে পারে অথবা নিঃশব্দেও পড়তে পারে।

১০. মাসআলা ঃ একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তি যদি ফজর, মাগরিব ও ইশা'র নামাযের কাযা দিনের বেলায় পড়ে, তবে সেগুলোতেও নিঃশব্দে কেরাআত পড়া ওয়াজিব। আর যদি রাতের বেলায় কাযা পড়া হয় তবে ইচ্ছা, সশব্দেও পড়তে পারে, নিঃশব্দে পড়তে পারে।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মাগরিব বা ইশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পর অন্য সূরা পড়তে ভুলে যায়, তবে সে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে[২] সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়বে এবং তখন সে রাকআতগুলোতেও সশব্দে কেরাআত পড়া ওয়াজিব। অতঃপর নামাযের শেষে সিজদায়ে সাহ্ব করবে।

নামাযের কতিপয় সুন্নত

১. মাসআলা ঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে পুরুষের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো এবং মহিলার কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নত। ওযরবশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত উঠালেও কোন আপত্তি নেই।

২. মাসআলা ঃ তাকবীরে তাহরীমার পরপরই পুরুষের নাভির নিচে এবং মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নত।

৩. মাসআলা ঃ পুরুষের হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পাতার উপর রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হতের কব্জি চেপে ধরা এবং বাকি তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছিয়ে রাখা সুন্নত।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম এবং একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তির সূরা ফাতেহার শেষে নিঃশব্দে আমীন বলা এবং ইমাম যদি সশব্দে কেরাআত পড়ে, তবে সকল মুক্তাদীও নিঃশব্দে আমীন বলা সুন্নত।

১. অর্থাৎ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি শুনতে না পায়। যে ব্যক্তি একেবারে নিকটে দাঁড়ানো সেও শুনতে পাবে না–এটা উদ্দেশ্য নয়।

২. অর্থাৎ মাগরিবের নামাযের তৃতীয় রাকআতে এবং ইশা'র নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়বে।

৫. মাসআলা ঃ রুকূর সময় পুরুষের ভালভাবে ঝুঁকে পড়া অর্থাৎ পিঠ, মাথা ও নিতম্ব বরাবর হয়ে যাওয়া সুন্নত। এমনিভাবে পুরুষের উভয় হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখা সুন্নত। রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে ইমামের কেবল ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলা, মুক্তাদীর কেবল رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা এবং একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তির উভয়টি বলা সুন্নত।

৬. মাসআলা ঃ সিজদার সময় পুরুষের পেট উরু থেকে এবং হাতের কনুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখা এবং হাতের বাহু ভূমি থেকে তুলে রাখা সুন্নত।

৭. মাসআলা ঃ প্রথম ও শেষ বৈঠকে পুরুষরা এভাবে বসবে যে, ডান পা'কে আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড় করিয়ে রাখবে, ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকবে এবং বাম পা ভূমিতে বিছিয়ে রেখে তার উপর বসবে। উভয় হাত উরুর উপর এবং হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নিকটবর্তী থাকবে। এটা সুন্নত।

৮. মাসআলা ঃ ইমামের উঁচু আওয়াজে 'সালাম' বলা সুন্নত।

৯. মাসআলা ঃ ইমামের সালাম ফেরানোর সময় সাথের সকল মুক্তাদীর নিয়্যত করা, চাই মুক্তাদী পুরুষ হোক বা মহিলা বা বালক; এবং সাথে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের নিয়্যত করা এবং মুক্তাদীদের সালাম ফেরানোর সময় সাথের নামাযরতদের নিয়্যত করা, সাথের ফেরেশতাদের নিয়্যত করা, এবং ইমাম ডান দিকে হলে ডান সালামে এবং বাম দিকে হলে বাম সালামে এবং বরাবরে থাকলে উভয় সালামে ইমামের নিয়্যত করা সুন্নত।

১০. মাসআলা ঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষের হাত জামার আস্তীন বা চাদর ইত্যাদি থেকে, যদি তীব্র ঠাণ্ডা বা অন্য কোন ওযর না থাকে তবে বের করা সুন্নত।

জামাআতের বর্ণনা

যেহেতু জামাআত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব বা সুন্নতে মুয়াক্কাদা[১]. তাই নামাযের ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহের আলোচনার পর এবং মাকরূহ বিষয়াদির আলোচনার পূর্বে জামাআত সম্পর্কেও আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। জামাআত সংক্রান্ত মাসায়েল অধিক ও গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে তার জন্য পৃথক শিরোনাম স্থাপন করা হয়েছে।

---

১. অর্থাৎ কারও মতে জামাআত ওয়াজিব, আবার কারও মতে, সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এর আলোচনা পরে আসছে।

ন্যূনতম দুই ব্যক্তি একত্র হয়ে নামায পড়াকে জামাআত বলে। এরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অনুসারী ও আপনজন অনুসৃত হয়ে থাকে। অনুসৃতকে ইমাম ও অনুসারীকে মুক্তাদী বলা হয়।

১. মাসআলা ঃ ইমামের সাথে (কমপক্ষে) এক ব্যক্তি নামাযে শরীক হলে জামাআত সংগঠিত হয়। চাই সে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন, বালেগ হোক বা সমঝদার, কিশোর বা নাবালেগ ছেলে। কিন্তু জুমুআ ও দুই ঈদের নামাযে ইমাম ছাড়াও ন্যূনতম তিনজন ব্যতীত জামাআত হয় না।

২. মাসআলা ঃ জামাআত সংঘটিত হওয়ার জন্য ফরয নামায হওয়া জরুরী নয়; বরং নফল নামাযও যদি দুই ব্যক্তি একে অপরের অনুসরণ করে পড়ে, তবে তাতেও জামাআত সংগঠিত হয়ে যাবে। চাই ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ুক অথবা কেবল মুক্তাদী নফল পড়ুক। অবশ্য নফল নামায জামাআতে পড়ায় অভ্যস্ত হওয়া বা তিনজন মুক্তাদীর বেশি হওয়া মাকরূহ।

জামাআতের ফযীলত ও তাকীদ

জামাআতের ফযীলত ও তাকীদ সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস এত অধিক পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সবগুলো এক জায়গায় একত্র করা হয় তবে তাতে একটি বড় কলেবর সমৃদ্ধ পুস্তিকা তৈরি হতে পারে। সে সকল হাদীস পর্যবেক্ষণ করলে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত বের হয় যে, নামায পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য জামাআত একটি উঁচু মানের শর্ত। নবী করীম (সা.) কখনও জামাআত তরক করেন নি। এমন কি অসুস্থ অবস্থায় যখন তাঁর নিজে নিজে চলার মত শক্তি ছিল না তখনও তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেছেন এবং জামাআত সহকারে নামায পড়েছেন। জামাআত তরককারীদের উপর তাঁর ভীষণ ক্রোধ হত এবং জামআত তরক করার কারণে তিনি কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দিতে ইচ্ছা করতেন। নিঃসন্দেহে শরীয়তে মুহাম্মদীতে জামাআতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সে গুরুত্ব আরোপ করাও ছিল যুক্তিসঙ্গত। নামাযের ন্যায় ইবাদতের মর্যাদাও এটাই চায় যে, যে জিনিস দ্বারা নামায পূর্ণাঙ্গ হবে তার প্রতিও বেশ উঁচু মানের গুরুত্ব আরোপিত হওয়া উচিত। আমি এখানে প্রথমে একটি আয়াত উল্লেখ করব, যে আয়াতটি দ্বারা কোন কোন তাফসীরবিদ ও ফিকাহবিদ নামাযের জামাআত সপ্রমাণ করেছেন। তারপর কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করব।

আয়াত ঃ আল্লাহ তা'আলার বলেনঃ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ "আর তোমরা নামায পালনকারীদের সাথে মিলিত হয়ে নামায পড় অর্থাৎ, জামাআত

সহকারে"– এ আয়াতে জামাআত সহকারে নামায পড়ার সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে; কিন্তু যেহেতু কোন কোন তাফসীরবিদ রুকূ শব্দ থেকে বিনম্রতার অর্থগ্রহণ করেছেন, তাই এআয়াত দ্বারা জামআত ফরয প্রমাণিত হবে না।

১. হাদীস ঃ হযরত ইবনে উমর (রা.)–এর সূত্রে বর্ণিত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জামাআত সহকারে নামায পড়লে একাকী নামাযের সাতাশ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

২. হাদীস ঃ নবী করীম (সা.) বলেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে এক জনের সাথে মিলিত হয়ে নামায পড়া উত্তম এবং দু'জনের সাথে মিলিত হয়ে নামায পড়া আরো বেশি উত্তম। এভাবে জামাআত যত বড় হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তত বেশি পসন্দনীয়।

৩. হাদীস ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.)-এর সাহাবীরা তাঁদের পুরানো বাড়ি (মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল বিধায় তা) পরিত্যাগ করে নবী করীম (সা.)–এর নিকটে এসে বসবাস করার ইচ্ছা করে ছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাদের বললেন, তোমরা মসজিদে আসতে তোমাদের যে কদমগুলো ভূমিতে পড়ে তার বিনিময়ে তোমরা কি ছওয়াব পাবে বলে মনে কর না ? [১]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি যতদূর থেকে পায়ে হেঁটে মসজিদে আসবে সে তত বেশি ছওয়াব পাবে।

৪. হাদীস ঃ নবী করীম (সা.) বলেন, যতক্ষণ সময় নামাযের অপেক্ষায় অতিবাহিত হয় তাও নামাযের মধ্যে গণ্য হয়।

৫. হাদীস ঃ নবী করীম (সা.) একদিন ইশা'র সময় জামাআতে উপস্থিত সাহাবীদের বললেন, লোকেরা তো নামায পড়ে ঘুমাচ্ছে। তোমরা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় অতিবাহিত করেছ তাও নামাযের মধ্যে গণ্য হয়েছে।

৬. হাদীস ঃ বুরায়দা আসলামী (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যারা অন্ধকার রাত্রে জামাআতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যায় তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে পূর্ণ আলো প্রদান করা হবে।

৭. হাদীস ঃ হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশা'র নামায জামাআতে পড়বে সে অর্ধেক রাত্রের ইবাদতের ছওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়বে সে পূর্ণ রাত্রের ইবাদতের ছওয়াব পাবে।

---

১. কিন্তু যদি কারও মহল্লায় মসজিদ থাকে সেটা ছেড়ে দূরে যাবে না। কেননা,মহল্লার মসজিদের হক আছে; বরং যদি সে মসজিদে জামাআতও না হয় তবু সেখানে যেয়ে আযান ইকামত বলে একাকী নামায পড়বে।

৮. হাদীস ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি খড়ি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেই, তারপর আযান দিতে হুকুম করি এবং এক জনকে ইমামতি করতে বলি। অতঃপর আমি যারা জামাআতে উপস্থিত হয় না তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেই।

৯. হাদীস ঃ এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি ছোট শিশু ও মহিলাদের প্রতি আমার লক্ষ্য না থাকত, তবে আমি ইশা'র নামাযে মশগুল হয়ে যেতাম এবং যারা নামাযের জামাআতে হাযির হয় না তাদেরকেসহ তাদের বাড়ি-ঘর ও মাল-আসবাব সবই জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য খাদেমদেরকে নির্দেশ দিতাম।

বিশেষ করে ইশা'র নামাযের কথা এ হাদীসে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, এটা হল ঘুমাবার সময়। এ সময় প্রায় সকল লোক ঘরে থাকে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এ বিষয়ের হাদীস হয়রত ইবনে মাসউদ, আবুদ দারদা, ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এরা সকলেই নবী করীম (সা.)-এর সম্মানিত স্বাহাবী।

১০. হাদীস ঃ আবুদ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, কোন জনপদে বা ময়দানে যদি তিনজন মুসলমান থাকে, কিন্তু তারা জামাআতে নামায পড়ে না, তবে নিঃসন্দেহে তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করবে। অতএব হে আবুদ দারদা জামাআতে নামায পড়াকে নিজের জন্য অপরিহার্য মনে কর। দেখ, নেকড়েবাঘ সেই বকরীটাকেই খায় যেটি পাল থেকে পৃথক থাকে। অর্থাৎ, শয়তানও সেই ব্যক্তিকেই বিভ্রান্ত করে যে জামাআত থেকে আলাদা থাকে।

১১. হাদীস ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে মসজিদে আসে না, অথচ তার কোন ওযর নেই তবে তার সেই একাকী পড়া নামায কবুল হবে না।[১]

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, সে ওযরটি কি? হযরত রাসূলুল্লাহ বলেন, ভয় বা অসুস্থতা।

এ হাদীসে ভয় ও অসুস্থতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি, কোন কোন হাদীসে কিছুটা ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে।

---

১. অর্থাৎ, সম্পূর্ণ ছওয়াব পাবে না। এ উদ্দেশ্য নয় যে, তার ফরযই আদায় হবে না। সুতরাং এ ধারণার বশীভূত হয়ে যে, নামায একাকী পড়লে যেহেতু কবূল হবে না তাই নামায একাকীও পড়ব না। কেননা, কোনও ফায়েদা নেই- এরূপ ধারণা করা উচিত নয়।

১২. হাদীস ঃ হযরত মিহজান (রা.) বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা.)-এর সাথে ছিলাম; এমন সময় আযান হল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায পড়তে লাগলেন আর আমি পৃথক একজায়গায় বসে রইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায থেকে অবসর হয়ে বললেন, হে মিহজান! তুমি কেন জামাআতে নামায পড়লে না ? তুমি কি মুসলমান নও? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি মুসলমান তো অবশ্যই; কিন্তু আমি নিজ গৃহে (একাকী) নামায পড়ে এসেছিলাম (তাই জামাআতে শরীক হই নি)। নবী করীম (সা.) বললেন, যখন মসজিদে আস এবং দেখ যে, জামাআত হচ্ছে তখন যদি (কোন কারণবশতঃ বাড়িতে) নামায পড়েও আস তবু মানুষের সাথে মিলিত হয়ে জামাআতে নামায পড়বে।[১] এ হাদীসটি একটু পর্যবেক্ষণ করুন। দেখুন নবী করীম (সা.) তার প্রিয় সাহাবী মিহজান (রা.)-কে জামাআতে নামায না পড়ার কারণে কত কঠোর ও শ্লেষাত্মক কথা বলেছেন যে, তুমি কি মুসলমান নও ?

এখানে কয়েকটি হাদীস নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হল। এখন নবী করীম (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের বাণী শুনুন যে,জামাআতের প্রতি তারা কতটুকু গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং জামাআত তরক করাকে তারা কেমন খারাপ মনে করতেন। কেনই বা তারা জামাআত তরক করাকে খারাপ মনে করবেন না ? নবী করীম (সা.)-এর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির প্রতি তাঁদের চেয়ে অধিক যত্নবান আর কে বা হবেন?

১. আছর[২] ঃ হযরত আসওয়াদ বলেন, আমরা একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে নামাযের প্রতি যত্নশীলতা এবং নামাযের ফযীলত ও তাকীদ সম্পর্কে আলোচনা হল। তখন হযরত আয়েশা (রা.) আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সমর্থন স্বরূপ নবী করীম (সা.)-এর অন্তিমকালের অসুস্থতার একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, একদিন নামাযের ওয়াক্ত হলে আযান দেওয়া হল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আবূ বকরকে নামায পড়াতে বল। আরয করা হল যে, আবূ বকর অত্যন্ত নরম মনের মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়ালে (কেঁদে) অস্থির ও অক্ষম হয়ে পড়বে, তিনি নামায পড়াতে সম্মত হবেন না। কতক্ষণপর তিনি সে কথাটি পুনরায় বললেন, তাকে পুনরায় সে উত্তর দেওয়া হল।

তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার সাথে তদ্রূপ কথা বলছ যেমনটি

---

১. কিন্তু ফজর, আসর ও মাগরিবের নামায যদি একাকী পড়ে ফেলে তারপর জামাআত হয় তবে জামাআতে শরীক হবে না। কেননা, ফজর ও আসরের পর নফল পড়া জায়েয নয় এবং মাগরিবের নামাযে এজন্য শরীক হবে না যে তিন রাকআত নফলের শরীয়তে বিধান নেই।

২. সাহাবীও তাবেঈর বাণীকে আছার বলে।

মিসরের রমণীরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বলেছিল [১] আবূ বকরকে বল, সে নামায পড়িয়ে দিক। যা হোক, হযরত আবূ বকর (রা.) নামায পড়াতে বের হন। ইত্যবসরে নবী করীম (সা.) অসুস্থতা কিছুটা কম বোধ করলেন। তখন তিনি দু'জন লোকের কাঁধের উপর ভর করে জামাআতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন। আমার চোখে সে দৃশ্য এখনও বিদ্যমান। নবী করীম (সা.)-এর কদম মুবারক মাটিতে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ, এতটুকু শক্তিও ছিল না যে, মাটি থেকে পা তুলতে পারেন। ওদিকে হযরত আবূ বকর (রা.) নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখে তিনি পেছনে সরে যেতে চাইলেন, কিন্তু নবী করীম (সা.) তাকে পেছনে সরে আসতে নিষেধ করলেন এবং তাঁর দ্বারাই নামায পড়ালেন।

২. আছর ঃ একদিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা.) সুলায়মান ইবনে আবী হাস্‌মাকে ফজরের নামাযে পান নি। তখন তিনি সুলায়মান ইবনে আবী হাস্‌মার বাড়ীতে যান এবং তার মা'কে জিজ্ঞেস করেন, আজ আমি সুলায়মানকে ফজরের নামাযে দেখি নি। (তার কারণ কি?) তাঁর মা বললেন, সে সারা রাত নামায পড়েছে, যার কারণে সে এ সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন হযরত উমর ফারূক (রা.) বললেন, সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে ফজরের নামায জামাআতে পড়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জামাআত সহকারে ফজর নামায পড়ার ছওয়াব তাহাজ্জুদের চেয়ে বেশি। এ কারণে আলিমগণ লিখেছেন যে, যদি রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করার কারণে ফজরের নামাযে অসুবিধা হয় তবে তা ছেড়ে দেওয়া উত্তম। (আশিআ'তুল লুম'আত)

৩. আছর ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নিশ্চয় আমরা নিজেদেরকে এবং সাহাবায়ে কিরামকে পরীক্ষা করে দেখেছি, কেউই জামাআত তরক করে না, কেবল সেই মুনাফিক ব্যতীত, যার মুনাফিকী প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। অথবা অসুস্থ লোক ব্যতীত, কিন্তু অসুস্থ লোকেরাও দু'জনের কাঁধে ভর করে জামাআতে

---

১. এখানে হযরত আয়েশা (রা.)-কে হযরত যুলায়খার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। উপমা দেওয়ার কারণ এই যে, যখন হযরত যুলায়খার প্রেমের আলোচনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি তাঁর স্বামীর ক্রীতদাসের প্রেমে অস্থির হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি মিসরের অন্যান্য অনেক রমণীকে আপ্যায়নের জন্য দাওয়াত করেন। তাঁর এ আপ্যায়নের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, মহিলারা ইউসুফের সৌন্দর্য দেখুক এবং তার প্রেমে তাকে অনুন্যপায় মনে করুক এবং তাকে অযথা গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকুক। তেমনিভাবে হযরত আয়েশা (রা.) যে ওযর বর্ণনা করেছিলেন তার উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ মানুষ যেন হযরত আবূ বকরের নামায পড়ানোকে অশুভ মনে না করে এবং রাসূল (সা.)-এর ইনতেকালের পর আবূ বকর (রা.)-এর প্রতি মানুষ বিরাগভাবাপন্ন না হয়ে পড়ে।

উপস্থিত হত। নিশ্চয় নবী করীম (সা.) আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম নির্দেশনা হল, যে মসজিদে আযান হয় অর্থাৎ, জামাআত হয় সেখানে নামায পড়া।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, কাল কিয়ামতের দিন যে আল্লাহর সামনে মুসলমানরূপে হাযির হওয়ার বাসনা রাখে, তার উচিত যেখানে আযান হয় অর্থাৎ, জামাআত সহকারে নামায হয় সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায (জামাআত সহকারে) পাবন্দীর সাথে পড়া। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াতের সমস্ত পথ দেখিয়েছেন। এ নামায ও সে সকল পথের অন্যতম। যদি তোমরা তোমাদের বাড়িতে নামায পড়ে নাও, যেরূপ মুনাফিকরা করে তবে নিশ্চয় তোমাদের থেকে তোমাদের নবী (সা.)-এর সুন্নত ছুটে যাবে। আর তোমরা যদি নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত ছেড়ে দাও, তবে নিশ্চয় তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে নামাযের জন্য মসজিদে যায় সে তার প্রতি কদমে একটি করে ছওয়াব পায়, তাকে একটি করে মর্তবা প্রদান করা হয় এবং তার একটি করে গুণাহ মাফ হয়। আমরা যাচাই করে দেখেছি, কেবল মুনাফিক ব্যতীত কেউই জামাআত থেকে দূরে থাকে না। আমাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) অবস্থা তো ছিল এরূপ যে, অসুস্থতার মধ্যেও আমাদেরকে দু'জনের কাঁধে ভর করিয়ে জামাআতে উপস্থিত করা হত এবং নামাযের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত।

৪. আছর ঃ একবার এক ব্যক্তি আযানের পর মসজিদ থেকে নামায না পড়ে চলে গেল। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, লোকটি আবুল কাসেম (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং পবিত্র হুকুম অমান্য করেছে।[১] (মুসলিম)

দেখুন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) জামাআত তরককারী সম্পর্কে কি বলেছেন। এরপরও কি কোন মুসলমান ওযর ব্যতিরেকে জামাআত তরক করার সাহস করতে পারে ? কোন ঈমানদার কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে ?

৫. আছর ঃ হযরত উম্মুদ দারদা (রা.) বলেন, একবার আবুদ দারদা (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ কি ? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে জামাআতে নামায পড়া ব্যতীত আর কিছুই দেখছি না; কিন্তু এখন তাও ছেড়ে দিচ্ছে।

---

১. কোন মসজিদে আযান হওয়ার পর সেখান থেকে চলে যাওয়া, যদি পুনরায় এসে সেখানে নামায পড়ার ইচ্ছা না থাকে তবে মাকরূহ। কিন্তু যদি কোন গ্রহণযোগ্য ওযর থাকে তবে মাকরূহ হবে না।

৬. আছর ঃ নবী করীম (সা.)-এর বহু সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে জামাআতে উপস্থিত হয় না তার নামায হবে না। এ হাদীস উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন, কোন কোন আলিমের মতে, জামাআতের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এ হাদীসে এরূপ বলা হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওযর ব্যতিরেকে জামাআত তরক করা জায়েয নয়।[১]

৭. আছর ঃ মুজাহিদ (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত নামায পড়ে, কিন্তু জুমুআ ও জামাআতে শরীক হয় না তার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? উত্তরে তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ জুমুআ ও জামাআতের মর্তবা কম মনে করে তা তরক করে, তবে তার সম্পর্কে এ উক্তি প্রযোজ্য [২]. কিন্তু যদি জাহান্নামে যাওয়া দ্বারা সামান্য সময়ের জন্য যাওয়া উদ্দেশ্য হয় তবে উক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

৮. আছর ঃ সালাফে সালেহীনের [৩]. যুগে নিয়ম ছিল যে, যখন কারও জামাআত ছুটে যেত, তখন তিনি সাত দিন পর্যন্ত এজন্য আক্ষেপ করতেন। (ইহয়াউল উলূম)

সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় বাণী এখানে উদ্ধৃত হল। এগুলো মূলতঃ নবী করীম (সা.)-এরই বাণী। এখন একটু উম্মতের খ্যাতনামা আলিম ও মুজতাহিদগণের প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখুন জামাআত সম্পর্কে তাঁদের কি অভিমত এবং তাঁরা উপরিউক্ত হাদীসমূহের কি অর্থ গ্রহণ করেছেন ?

জামাআত সম্পর্কে ইমামগণের মতামত

১. জাহেরিয়্যা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কোন কোন অনুসারীর মতে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ব্যতীত নামায হবে না।

২. ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সঠিক মাযহাব হচ্ছে, জামাআত ফরযে আইন তবে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কোন কোন অনুসারীর অভিমতও এরকমই।

৩. ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কোন কোন অনুসারীর অভিমত হচ্ছে জামাআত ফরযে কিফায়া। হানাফী মাযহাবের খ্যাতনামা ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিস ইমাম তাহাবীরও অভিমত তাই।

---

১. বিনা ওযরে একাকী নামায পড়লে শুদ্ধ হয়ে যাবে বটে; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হবে না।

২. কেননা, শরীয়তের বিধি-বিধানকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা কুফরী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তির উল্লিখিত ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে, যখন তার উক্তিতে জাহান্নামে যাওয়া দ্বারা চিরকালের জন্য যাওয়া উদ্দেশ্য হয়।

৩. সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনকে সালাফে সালেহীন বলা হয়।

৪. অধিকাংশ অভিজ্ঞ হানাফী ফিকাহবিদের মতে, জামাআত ওয়াজিব। মুহাক্কিক ইবনে হুমাম, হালাবী ও বাহরুর রায়েক প্রণেতা এ অভিমত পোষণ করেন।

৫. অধিকাংশ হানাফী ফিকাহবিদের মতে, জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা [১] কিন্তু ওয়াজিবের মত। প্রকৃতপক্ষে হানাফীদের উক্ত দুই অভিমতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

৬. আমাদের ফিকাহবিদগণ লিখেছেন যে, কোন জনপদে যদি মানুষ জামাআতে নামায পড়া ছেড়ে দেয় এবং তাদের জামাআতে নামায পড়ার জন্য বুঝালেও তারা তা মানে না, তবে তাদের সাথে লড়াই করা বৈধ।

কিন্‌য়া প্রভৃতি ফিকাহ্‌র কিতাবে আছে, যদি কেউ বিনা ওযরে জামাআত তরক করে, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া দেশের শাসনকর্তার উপর ওয়াজিব। আর তার প্রতিবেশীরা যদি তার এই মন্দ কাজের জন্য কিছু না বলে, তবে তারা গুনাহগার হবে।[২]

৭. যদি কেউ মসজিদে যাওয়ার জন্য ইকামত শোনার অপেক্ষা করে, তবে সে গুনাহগার হবে। কেননা, ইকামত শোনার পর যদি মসজিদে যায় তবে এক দুই রাকআত বা সম্পূর্ণ জামাআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জুমুআ ও জামাআতের জন্য দ্রুত গতিতে যাওয়া জায়েয, যদি অধিক কষ্ট না হয়।

৮. জামাআত তরককারী নিশ্চয়ই গুনাহগার (ফাসেক)। যদি সে বিনা ওযরে কেবল অলসতা করে জামাআত তরক করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯. যদি কেউ দীনী ইলম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দানে দিন রাত ব্যাপৃত থাকে এবং জামাআতে হাযির হয় না, তবে সে ওযরগ্রস্ত গণ্য হবে না এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (বাহরুর রায়েক)

---

১. জামাআতের বিধান সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের বর্ণনা বিভিন্ন রকমের। কেউ বলেছেন জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কেউ বলেছেন, ওয়াজিব। এ দ্বিবিধ বর্ণনাকে কোন কোন ফিকাহবিদ মতভেদরূপে গ্রহণ করেছেন এবং উভয় মতের বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করেন নি। কেউ আবার এ বিরোধ নিরসন করতে চেয়েছেন। যারা এ চেষ্টা করেছেন তাদের কেউ কেউ বলেন, সুন্নত মুয়াক্কাদা মানে ওয়াজিব এবং তার ওয়াজিব হওয়া সুন্নত তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ বলেছেন, সব সময় জামাআতে নামায পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং কখনও কখনও পড়া ওয়াজিব। এ সকল বর্ণনা ফিকাহর কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

২. অর্থাৎ, তাকে জামাআত ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে বাধা না দেয় এবং শক্তি সামর্থ্য মুতাবিক উপদেশ না দেয় এবং সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে সে প্রতিবেশীরা গুণাহগার হবে।

জামাআতের হিকমত ও উপকারিতা

জামাআতে নামায পড়ার হিকমত সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় আলিমগণ বহু কিছু লিখেছেন। কিন্তু আমার সীমিত দৃষ্টি যতটুকু পৌছেছে তাতে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর সার্বিক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম অন্য কারও বক্তব্য আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। যদিও হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর ভাষায় সে আলোচনা শুনতে পারলে পাঠকবৃন্দ অধিক স্বাদ আস্বাদন করতে পারতেন। কিন্তু আমি বিষয়বস্তু সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে তার বক্তব্যের সারমর্ম এখানে বর্ণনা করছি। তিনি বলেন ঃ

১. কোন ইবাদতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেটাকে সমাজে ব্যাপক প্রচলন দান করার চেয়ে অধিক কার্যকর কোন পন্থা নেই। ফলে সেটি এমন এক জরুরী ইবাদতে পরিণত হয়, যা বর্জন করা কোন চিরাচরিত অভ্যাস বর্জন করার ন্যায় দুষ্কর হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, নামাযের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ কোন ইবাদত নেই, যার জন্য এ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

২. ধর্মের (অনুসারীদের) মধ্যে সবধরনের লোক থাকে। অজ্ঞ লোকও থাকে, আলিমও থাকে। সুতরাং এটা অধিক যুক্তিসঙ্গত যে, সকলে এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পরের সামনে এ ইবাদত আদায় করবে। কারও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে অন্য ব্যক্তি তা সংশোধন করে দেবে। যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত একটি অলংকার বিশেষ। পরীক্ষাকারীরা তা পরীক্ষা করে দেখে, তাতে কোন দোষ থাকলে বলে দেয় এবং যা ভাল হয় তা পছন্দ করে। অতএব, জামাআত হল নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

৩. যারা বে-নামাযী তাদের পরিচয়ও প্রকাশ হয়ে পড়বে এতে তাদেরকে ওয়াজ ও নসীহত করার সুযোগ হবে।

৪. কতিপয় মুসলমানের মিলিতভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর নিকট দু'আ প্রার্থনা করা আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার ও ইবাদত কবুল হওয়ার ব্যাপারে এক আশ্চর্যজনক বিশেষত্ব রাখে।

৫. এ উম্মতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল, তাঁর বাণীকে সমুন্নত করা ও কুফরকে অধঃপতিত করা এবং পৃথিবীর বুকে কোন ধর্ম যেন ইসলামের মুকাবিলায় প্রবল না থাকে। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন এই নিয়ম নির্ধারিত হবে যে, সাধারণ-অসাধারণ, মুকীম-মুসাফির, ছোট-বড় সকল মুসলমান নিজেদের কোন বড় ও প্রসিদ্ধ ইবাদতের জন্য এক স্থানে সমবেত হবে এবং ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ করবে। এ সকল যুক্তিতে শরীয়তের পূর্ণ

দৃষ্টি জামাআতের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে, তার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং জামাআত ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৬. জামাআতে এ উপকারিতাও রয়েছে যে, সকল মুসলমান একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকবে। একে অপরের ব্যথা বেদনায় শরীক হতে পারবে। ফলে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানী ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ ও তার দৃঢ়তা সাধিত হবে। এটা শরীয়তের একটি বড় উদ্দেশ্য। কুরআন পাক ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে এর তাকীদ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের এ যুগে জামাআত তরক করা একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জাহেলদের তো কথাই নেই, আমাদের অনেক (দীনী শিক্ষায়) শিক্ষিতদেরকে এ অপরাধের শিকার দেখা যায়। দুঃখের বিষয় যে, তারা হাদীস পড়ে এবং তার অর্থ বুঝে, কিন্তু জামাআত সংক্রান্ত কঠোর হুশিয়ারী বাণীগুলো তাদের পাথরধিক কঠিন হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলে না। কিয়ামতের দিন মহা বিচারকের সামনে যখন সর্বপ্রথম নামাযের মোকদ্দমা পেশ করা হবে এবং যারা নামায আদায় করে নি বা আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে তখন তারা কি জওয়াব দেবে ?

জামাআত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

১. পুরুষ হওয়া; মহিলাদের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়।

২. বালেগ হওয়া; নাবালেগ শিশুদের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়।

৩. স্বাধীন হওয়া; ক্রীতদাসের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়।

৪. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া; উন্মাদ, বেহুঁশ ও পাগলের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়।

৫. যাবতীয় ওযর থেকে মুক্ত হওয়া; ওযরসমূহ থাকা অবস্থায় জামাআত ওয়াজিব নয়, কিন্তু এমতাবস্থায়ও জামাআতে নামায পড়া উত্তম। জামাআতে নামায আদায় না করলে জামাআতের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে।

জামাআত তরক করার ওযর ১৪টি

১. সতর আবৃত করার মত কাপড় না থাকা।

২. মসজিদে যাওয়ার পথে এমন কাদা থাকা, যাতে চলতে কষ্ট হয়, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাস্তায় কাদা-পানি থাকলে জামাআতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার

ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, জামাআত তরক করা আমার পছন্দ নয়।

৩. বৃষ্টি মুষলধারে বর্ষিত হওয়া, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় লিখেন যে, এমতাবস্থায় যদিও জামাআতে হাযির না হওয়া জায়েয আছে; কিন্তু উত্তম হল, মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায পড়া।

৪. শীত এত তীব্র হওয়া যে, বাইরে বা মসজিদে গেলে প্রচণ্ড শীতের কারণে কোন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৫. মসজিদে গেলে যদি মাল-সামান চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬. মসজিদে গেলে যদি কোন শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার ভয় থাকে।

৭. মসজিদে গেলে যদি পথে করযদাতার সাক্ষাৎ হওয়ার এবং তার দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তার করয পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকে। কিন্তু যদি সে করয পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখে (অথচ সে করয আদায়ে টালবাহানা করে) তবে সে জালিম সাব্যস্ত হবে। তার জামাআত তরক করার অনুমতি নেই।

৮. যদি এরূপ অন্ধকার রাত্রি হয় যে, পথ দেখা যায় না, কিন্তু যদি আলোর ব্যবস্থা করার মত সামর্থ্য আল্লাহ তা'আলা দেন, তবে জামাআত তরক করা উচিত নয়।

৯. অন্ধকার রাত্রে প্রচণ্ড ধুলি-ঝড় প্রবাহিত হলে।

১০. কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় রত ব্যক্তি নামাযের জামাআতে চলে গেলে যদি রোগী কষ্ট বা ভয় পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১১. খাবার যদি প্রস্তুত থাকে অথবা প্রস্তুত হচ্ছে, এবং ক্ষুধা এত বেশি যে, খাবার না খেয়ে নামায পড়তে গেলে নামাযে মন না বসার সম্ভবনা থাকে।

১২. পেশাব-পায়খানার চাপ খুব বেশি হলে।

১৩. যদি সফরে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করে থাকে এবং এ আশঙ্কা হয় যে, জামাআতে নামায পড়লে দেরি হয়ে যাবে এবং কাফেলার সাথীরা চলে যাবে। রেলগাড়ি ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টিও এর সাথে তুলনা করা যায়, তবে পার্থক্য এটুকু আছে যে, কাফেলার পর আরেক কাফেলা পেতে অনেক দেরি হয়, আর রেলগাড়ি দৈনিক কয়েকবার পাওয়া যায়। এক সময়ের গাড়ি না পেলে পরবর্তী গাড়িতে যাওয়া যায়। কিন্তু যদি এ বিলম্বের কারণে ক্ষতি বেশি হয়, তবে জামাআত তরক করতে আপত্তি নেই। শরীয়তে এরূপ অসুবিধার শিকার হতে বলা হয় নি।

১৪. এমন কোন অসুস্থতা থাকলে, যার কারণে চলাফেরা করতে পারে না, অথবা অন্ধ, খোঁড়া বা পা কাটা হয়। কিন্তু যে অন্ধ ব্যক্তি অনায়াসে মসজিদে পৌছুতে পারে তার জামাআত তরক করা উচিত নয়।

জামাআত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১ম শর্ত ঃ (ইমাম) মুসলমান হওয়া; ঈমানবিহীন ব্যক্তির ইকতেদা করে জামাআতে নামায পড়া শুদ্ধ নয়।

২য় শর্ত ঃ ইমাম বোধসম্পন্ন হওয়া; মাতাল, বেহুঁশ ও উম্মাদের ইকতেদা করে জামাআতে নামায পড়া শুদ্ধ নয়।

৩য় শর্ত ঃ মুক্তাদীর নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে ইমামের ইকতেদারও নিয়্যত করা, অর্থাৎ মনে মনে এ ইচ্ছা করা যে, "আমি এ ইমামের পেছনে অমুক নামায পড়ছি।" নিয়্যত সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

৪র্থ শর্ত ঃ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের স্থান একই হওয়া, চাই প্রকৃতই একই স্থান হোক, যেমন ঃ উভয় একই মসজিদে[১] বা একই গৃহে দাঁড়াল, অথবা বিধানগতভাবে একই স্থান সাব্যস্ত হোক, যেমন ঃ কোন খালের উপর অবস্থিত পুলের উপর জামাআত কায়েম হয় এবং ইমাম পুলের অপর দিকে খালের ওপারে দাঁড়ায়ে, কিন্তু মাঝখানে (অর্থাৎ পুলের উপর) একের পর এক নামাযের সারিগুলো থাকে, তবে এমতাবস্থায় যদিও ইমাম ও খালের ওপারস্থ মুক্তাদীদের মাঝে খালটি বিভাজক হয় এবং এ কারণে প্রকৃতপক্ষে উভয়ের স্থান অভিন্ন হয় না, তবু যেহেতু মাঝখানে পুলের উপর একের পর এক নামাযের সারিগুলো রয়েছে তাই এ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদীর স্থান বিধানগতভাবে একই সাব্যস্ত হবে এবং ইকতেদা শুদ্ধ হবে।

১ মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়ায় এবং ইমাম মসজিদের ভেতরে থাকে, তবে ইকতেদা শুদ্ধ। কেননা, মসজিদের ছাদ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উভয় স্থান বিধানগতভাবে একই বিবেচিত হবে। এমনিভাবে কোন দালানের ছাদ যদি মসজিদের সংলগ্ন হয় এবং মাঝখানে কোন আড়াল না থাকে, তবে সেই স্থানটিও বিধানগতভাবে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত ধর্তব্য হবে। সেই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে মসজিদের ভেতরকার ইমামের ইকতেদা করা জায়েয।

২. মাসআলা ঃ মসজিদ বা ঘর যদি খুব বড় হয় অথবা মাঠ হয় এবং ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ জায়গা খালি থাকে, তবে সেই দুইটি

---

১. অর্থাৎ, যখন সেই মসজিদ বা গৃহ বেশি বড় না হয়, কেননা, বড় মসজিদ ও বড় গৃহের বিধান সামনে বর্ণিত হবে।

জায়গা (অর্থাৎ, মুক্তাদীর দাঁড়াবার জায়গা ও ইমামের দাঁড়াবার জায়গা পৃথক ধর্তব্য হবে এবং ইকতেদা শুদ্ধ হবে না।

৩. মাসআলা ঃ এমনিভাবে ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে যদি কোন খাল থাকে, যাতে নৌকা ইত্যাদি চলতে পারে, অথবা এতবড় হাউয রয়েছে, যাতে সামান্য নাপাকী পড়লেও শরীয়ত তাকে পাক বলে রায় দেয় অথবা জন সাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত পথ থাকে, যার উপর দিয়ে গরুর গাড়ি ইত্যাদি চলতে পারে এবং মাঝখানে কোন কাতার না থাকে তবে উভয় স্থানকে এক ধরা যাবে না। কাজেই এরূপ ব্যবধানে ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। অবশ্য যদি খুব ছোট নালা মাঝখানে থাকে, যা একটি সংকীর্ণ রাস্তার সমান নয়[১] তবে সেটা ইকতেদার প্রতিবন্ধক নয়।

৪. মাসআলা ঃ এমনিভাবে দুই সারির মাঝখানে যদি উক্তরূপ কোন খাল বা রাস্তা থাকে, তবে খাল বা রাস্তার অপর দিকের সারির পেছনে এ পারের লোকদের ইকতেদা শুদ্ধ হবে না।

৫. মাসআলা ঃ আরোহীর পেছনে পদচারীর ইকতেদা বা এক আরোহীর পেছনে অন্য আরোহীর ইকতেদা শুদ্ধ নয়। কেননা, উভয়ের স্থান এক নয়, কিন্তু যদি একই বাহনজন্তুতে উভয় ব্যক্তি আরোহী হয়, তবে তাদের ইকতেদা শুদ্ধ হবে।

৫ম শর্ত ঃ মুক্তাদী ও ইমাম উভয়ের নামায পৃথক পৃথক না হওয়া। যদি মুক্তাদীর নামায ইমামের নামাযের বিপরীত হয়, তবে ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। যেমন ঃ ইমাম জোহরের নামায পড়ছে, আর মুক্তাদী আসরের নামাযের নিয়্যত করে অথবা ইমাম গতকালের জোহরের কাযা পড়ছে, আর মুক্তাদী আজকের জোহরের নিয়্যত করে। কিন্তু যদি ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে জামাআতে গতকালের জোহরের কাযা পড়ে অথবা আজকের জোহরের কাযা পড়ে তবে তা জায়েয। এমনিভাবে ইমাম যদি ফরয পড়ে আর মুক্তাদী নফল পড়ে তবে ইকতেদা শুদ্ধ হবে। কেননা, ইমামের নামায সবল।

৬. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি তারাবীহ পড়তে চায় এবং ইমাম নফল পড়ে, তবে এ ক্ষেত্রেও ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। কেননা, ইমামের নামায দুর্বল।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ ইমামের নামায শুদ্ধ হওয়া।

ইমামের নামায যদি অশুদ্ধ হয় তবে সকল মুক্তাদীর নামাযও অশুদ্ধ হবে চাই সে অশুদ্ধ হওয়ার কারণ নামায শেষ হওয়ার পূর্বে জানা হোক বা নামায

---

১. অর্থাৎ, যে পথ দিয়ে একটি উট চলতে পারে তাকে সংকীর্ণ রাস্তা ধরা হয়। সুতরাং যে নালা বা প্রণালীর প্রস্থ সেই সংকীর্ণ রাস্তা থেকে কম হয় তা ইকতেদার প্রতিবন্ধক নয়।

শেষ হওয়ার পর। যেমন ঃ (অনবধানতা হেতু) ইমামের কাপড়ে গালীজা নাজাসাত (গুরু নাপাকী) এক দেরহামের চেয়ে বেশি ছিল এবং তা নামায শেষ হওয়ার পর বা নামাযের মধ্যে জানা গেল, অথবা ইমামের ওযূ ছিল না এবং নামাযের পর বা নামাযের মধ্যে তা স্মরণ পড়ল।

৭. মাসআলা ঃ কোন কারণে যদি ইমামের নামায অশুদ্ধ হয় এবং মুক্তাদীদের তা জানা না থাকে, তবে মুক্তাদীদেরকে যথাসম্ভব তা জানিয়ে দেওয়া ইমামের উপর অপরিহার্য। যাতে তারা নিজেদের নামায পুনরায় পড়ে নেয়। চাই লোক মারফত অবহিত করুক বা পত্রের মাধ্যমে।

৭ম শর্ত ঃ মুক্তাদী ইমামের চেয়ে অগ্রসর হয়ে না দাঁড়ানো। চাই পাশাপাশি দাঁড়াক বা আগে-পিছে।

মুক্তাদী যদি ইমামের চেয়ে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। ইমামের চেয়ে মুক্তাদীর অগ্রসর হয়ে দাঁড়ানো তখনই সাব্যস্ত হবে যখন মুক্তাদীর পায়ের গোড়ালী ইমামের পায়ের গোড়ালী অপেক্ষা সামনে বেড়ে যায়। কিন্তু যদি পায়ের গোড়ালী অগ্রসর না হয়; বরং পায়ের পাতা বা আঙ্গুল লম্বা হওয়ার কারণে পায়ের আঙ্গুলগুলো সামনে বেড়ে যায়, তবে তাতে মুক্তাদীর সামনে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ানো সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় ইকতেদা শুদ্ধ হবে।

৮ম শর্ত ঃ ইমামের উঠা, বসা, রুকূ, কাওমা, সিজদা ও জলসা ইত্যাদি মুক্তাদীর জানা থাকা। চাই ইমামকে দেখে জানুক বা ইমামের বা কোন মুকাব্বিরের আওয়াজ শুনে জানুক বা অন্য কোন মুক্তাদীকে দেখে জানুক।

যদি (কোন কারণবশতঃ) ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মুক্তাদী জানতে না পারে এবং তা মাঝখানে কোন অন্তরাল থাকার কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে, তবে ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি মাঝখানে পর্দা বা প্রাচীর ইত্যাদির মত কিছু অন্তরাল থাকা সত্ত্বেও ইমামের উঠা-বসা জানতে পারে তবে ইকতেদা শুদ্ধ হবে।

৮. মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুসাফির না মুকীম জানা না থাকে, কিন্তু বিভিন্ন লক্ষণে মুকীম বলে মনে হয় এবং সে শহরে বা গ্রামে হয়, আর সে মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়ায় অর্থাৎ, চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং মুক্তাদী উক্ত সালামের কারণে ইমাম ভুল করেছে বলে সন্দেহ করে, তবে সে মুক্তাদী কর্তৃক তার চার রাকআত পূর্ণ করার পর ইমামের অবস্থা যাচাই করা তার উপর ওয়াজিব যে, ইমামের ভুল হয়েছে, নাকি তিনি মুসাফির। যাচাইয়ের পর যদি তিনি মুসাফির সাব্যস্ত হন তবে নামায শুদ্ধ হবে, আর যদি

ইমামের ভুল হওয়া প্রমাণিত হয় তবে নামায পুনরায় পড়বে। কিন্তু যদি যাচাই না করে; বরং মুক্তাদী ঐ সন্দেহের অবস্থায় নামায পড়ে চলে যায়, তবে এমতাবস্থায়ও নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব।

৯. মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুকীম বলে মনে হয়, কিন্তু সে শহরে বা গ্রামে নামায পড়াচ্ছে না; বরং শহর বা গ্রামের বাইরে পড়াচ্ছে এবং সে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়ায় এবং ইমাম ভুল করেছে বলে মুক্তাদীর সন্দেহ হয়, তবে এমতাবস্থায়ও মুক্তাদী তার নামায চার রাকআত পূর্ণ করবে। নামাযের পর ইমামের অবস্থা জেনে নিলে ভাল, কিন্তু যদি নাও জেনে নেয় তবু তার নামায নষ্ট হবে না। কেননা, শহর বা গ্রামের বাইরে ইমাম যে মুসাফির হবেন তা বলাই বাহুল্য। "ইমাম ভুল করেছে"—মুক্তাদীর এরূপ ধারণা করা। বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থী। সুতরাং এমতাবস্থায় ইমামের অবস্থা যাচাই করা আবশ্যক নয়। এমনিভাবে ইমাম যদি চার রাকআত বিশিষ্ট নামায শহর বা গ্রামে বা মাঠে ময়দানে পড়ায় এবং সে মুসাফির বলে কোন মুক্তাদীর সন্দেহ হয়, কিন্তু ইমাম পূর্ণ চার রাকআত পড়ায় তখনও নামাযের পর ইমামের অবস্থা যাচাই করা মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া ফজর ও মাগরিবের নামাযে কখনও ইমাম মুসাফির কি মুকীম তা যাচাই করা আবশ্যক নয়। কেননা, উক্ত দুই নামাযে মুকীম ও মুসাফির সমান। সারকথা এই যে, ইমামের অবস্থা যাচাই করার প্রয়োজন কেবল সেই ক্ষেত্রেই হয়, যখন ইমাম শহর বা গ্রামে বা অন্য কোন জায়গায় চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকআত পড়ায় এবং ইমাম ভুল করেছে বলে মুক্তাদীর সন্দেহ হয়।

৯ম শর্ত ঃ কেরাআত ব্যতীত অন্য সকল রুকনে ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীর শরীক থাকা। তা ইমামের সঙ্গেই আদায় করুক বা তারপরে বা তার পূর্বে যদি সেই রুকনের শেষ পর্যায় নাগাদ ইমাম মুক্তাদীর সাথে সেই রুকনে শরীক হয়।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ, ইমামের সাথেই রুকূ-সিজদা করা। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ, ইমাম রুকূ করে দাঁড়াবার পর মুক্তাদীর রুকূ করা। তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ, ইমামের পূর্বে রুকূ করা, তবে রুকূতে এত বেশি বিলম্ব করা যে, ইমামের রুকূ তার রুকূর সাথে মিলিত হয় (অর্থাৎ, মুক্তাদী রুকূতে থাকতেই ইমাম রুকূতে যায়।)

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন রুকনে ইমামের সাথে মুক্তাদী শরীক না হয়, যেমন– ইমাম রুকূ করল, কিন্তু মুক্তাদী রুকূ করল না, অথবা ইমাম দুই সিজদা করল, কিন্তু মুক্তাদী একটি মাত্র সিজদা করল, অথবা ইমামের পূর্বে কোন রুকন আদায় করতে শুরু করল এবং রুকনের শেষ পর্যায় নাগাদ ইমাম তাতে শরীক হল না। উদাহরণঃ মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকূতে গেল, কিন্তু ইমামের রুকূতে যাওয়ার পূর্বে সে দাঁড়িয়ে গেল এ উভয় অবস্থায় ইকতেদা শুদ্ধ হবে না।

১০ম শর্ত ঃ মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের চেয়ে কম বা সমান হওয়া। সুতরাং–

১. যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার পেছনে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ইকতেদা করা জায়েয। শরীয়তের দৃষ্টিতে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির বসে থাকা দাঁড়ানোর মতই।

২. তায়াম্মুমকারী ওযূর বদলে তায়াম্মুম করুক বা গোসলের বদলে করুক, তার পেছনে ওযূ ও গোসলকারী ব্যক্তির ইকতেদা করা জায়েয। কেননা, পবিত্রতার ব্যাপারে তায়াম্মুম ও ওযূ-গোসল সমান। একটি অপরটি থেকে কম বা বেশি নয়।

৩. মাসাহকারী চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করুক বা পটির উপর মাসাহ করুক, তার পেছনে ওযূ ও ধৌতকারীর ইকতেদা করা জায়েয। কেননা, মাসাহ করা ও ধৌত করা দ্বারা একই পর্যায়ের পবিত্রতা হাসিল হয় একটির উপর অন্যটির প্রাধান্য নেই।

৪. ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির ইকতেদা করা জায়েয, যদি উভয়ে একই ওযরে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমন উভয়ের ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ঝরে অথবা উভয়ের বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ থাকে।

৫. উম্মী [১] ব্যক্তির পেছনে উম্মী ব্যক্তির ইকতেদা করা জায়েয, যদি মুক্তাদীদের মধ্যে কোন কারী না থাকে।

৬. বালেগ পুরুষের পেছনে মহিলা বা নাবালেগের ইকতেদা করা জায়েয।

৭. মহিলার পেছনে মহিলার ইকতেদা করা জায়েয।

৮. নাবালেগ ছেলের পেছনে নাবালেগ ছেলে-মেয়ের ইকতেদা করা জায়েয।

৯. ফরয বা ওয়াজিব নামায পালনকারীর পেছনে নফল নামায পালনকারীর ইকতেদা করা জায়েয। যেমন– কেউ জোহরের নামায পড়ে ফেলেছে পুনরায় সে কোন জোহরের নামায পালনকারীর পেছনে নামায পড়ল অথবা কেউ ঈদের নামায পড়ে ফেলেছে পুনরায় সে অন্য জামাআতের নামাযে শরীক হল।

১০. নফল নামায পালনকারীর পেছনে নফল নামায পালনকারীর ইকতেদা করা জায়েয।

১১. কসমের নামায পালনকারীর ইকতেদা নফর নামায পালনকারীর পেছনে জায়েয। কেননা, কসমের নামাযও মূলতঃ নফলই বটে। অর্থাৎ, এক ব্যক্তি কসম খেল যে, আমি দু'রাকআত নামায পড়ব। অতঃপর সে কোন নফল নামায পালনকারীর পেছনে ইকদেতা করে দু'রাকআত পড়ে নেয়, তবে তার নামায হয়ে যাবে এবং তার কসমও পূর্ণ হয়ে যাবে।

---

১. যে ব্যক্তি নামাযে ফরয কেরাআত তথা এক আয়াত পরিমাণ কুরআন পাক মুখস্থ পড়তে পারে না তাকে উম্মী বলে এবং যে ব্যক্তি এ পরিমাণ কেরাআত মুখস্থ পড়তে পারে তাকে কারী বলে।

১২. মানতের নামায পালনকারীর পেছনে মানতের নামায পালনকারীর ইকতেদা করা জায়েয, যদি উভয়ের মানত এক হয়। যেমন, এক ব্যক্তি কোন বিষয়ে মানত করার পর অপর এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক ব্যক্তি যে মানত করেছে আমিও সেই মানত করলাম। কিন্তু যদি এরূপ না হয়, বরং এক ব্যক্তি দুই রাকআতের পৃথক মানত করেছে এবং অপর ব্যক্তি অন্য মানত করেছে, তবে এরূপ দু'জনের মধ্যে একজনের পেছনে অপরজনের ইকতেদা করা জায়েয হবে না।

সারকথা এই যে, মুক্তাদী (মানগতদিক থেকে) ইমামের চেয়ে নিম্ন বা সমান হলে ইকতেদা জায়েয হবে। এখন আমি সে সকল প্রকার লিপিবদ্ধ করব যেগুলোতে (মানগত দিক থেকে) ইমামের চেয়ে মুক্তাদীর মান বেশি। চাই এ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতই মুক্তাদীর মান বেশি হোক বা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা হোক, ইকতেদা জায়েয হবে না।

১. নাবালেগের পেছনে বালেগ পুরুষ বা মহিলার ইকদেতা জায়েয নয়।

২. মহিলার পেছনে বালেগ পুরুষ বা নাবালেগ ছেলের ইকতেদা জায়েয নয়।

৩. নপুংসকের পেছনে নপুংসকের ইকতেদা জায়েয নয়। নপুংসক এরূপ লোককে বলা হয়, যার শরীরের গঠনে পুরুষের চিহ্ন ও মহিলার চিহ্ন এ পর্যায়ের থাকে যে, সে পুরুষ না মহিলা নির্ণয় করা যায় না। এ ধরনের লোক খুব কমই হয়ে থাকে।

৪. যে মহিলার হায়েযের নির্দিষ্ট সময়ের কথা মনে নেই তার ইকতেদা তারই মত মহিলার পেছনে জায়েয নয়। [১]

এ দুই অবস্থায় (অর্থাৎ, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার) ইমামের চেয়ে মুক্তাদীর মান বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে ইকতেদা জায়েয হবে না। কেননা এ দু'টির প্রথমটিতে যে নপুংসক লোকটি ইমাম, সে মহিলা হতে পারে এবং যে নপুংসক লোকটি মুক্তাদী, সে পুরুষ হতে পারে। এমনিভাবে দ্বিতীয়টিতে যে মহিলা ইমাম তার এ সময়টি হায়েযের হতে পারে এবং যে মহিলাটি মুক্তাদী তার এ সময়টি পবিত্রতার হতে পারে।

৫. মহিলার পেছনে নপুংসক লোকের ইকতেদা জায়েয নয়। কেননা, সে নপুংসক লোকটি পুরুষ হতে পারে।

---

১. অর্থাৎ, যে মহিলার প্রথমে একটি বিশেষ রীতি মুতাবিক হায়েয আসত। তারপর কোন রোগব্যাধির কারণে তার স্রাব হতে থাকে এবং সে তার হায়েযের রীতিটি ভুলে যায়।

৬. পাগল, মাতাল, বেহুঁশ বা জ্ঞান লোপ পাওয়া ব্যক্তির পেছনে সজ্ঞান ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ইকতেদা জায়েয নয়।

৭. ফোঁটা ফোঁটা পেশাব ঝরে এরূপ ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে পাক (বা ওযরবিহীন) ব্যক্তির ইকতেদা জায়েয নয়।

৮. দুইটি ওযরে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে এক ওযরে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির ইকতেদা জায়েয নয়। যেমন ঃ কারও কেবল বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে, সে এরূপ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করল, যার বায়ু নির্গত হওয়া ও ফোঁটা পেশাব ঝরা এ দু'টি রোগ আছে।

৯. এক ধরনের ওযরে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে অন্য ধরনের ওযরে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির ইকতেদা জায়েয নয়। যেমন, যার ফোঁটা ফোঁটা পেশাব ঝরে সে এরূপ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করল, যার নাক থেকে রক্ত পড়ে।

১০. উম্মী লোকের পেছনে কারীর ইকতেদা করা জায়েয নয়। কারী তাকেই বলে, যে এতটুকু কুরআন শুদ্ধ করে মুখস্থ পড়তে পারে যাতে নামায হয়ে যায়। উম্মী এরূপ লোককে বলে, যার এটুকুও মুখস্থ নেই।

১১. মুক্তাদীদের মধ্যে যদি কোন কারী থাকে তবে উম্মী লোকদের পেছনে উম্মী লোকদের ইকতেদা করা জায়েয নয়। কেননা, এমতাবস্থায় সে উম্মী ইমামের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, সেই কারীকে ইমাম বানানো সম্ভব ছিল এবং তার কেরাআত সকল মুক্তাদীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যখন ইমামের নামায নষ্ট হয়ে গেল তখন সকল মুক্তাদীরও নামায নষ্ট হয়ে গেল, যাদের মধ্যে সেই উম্মী লোকটিও রয়েছে।

১২. বোবা লোকের পেছনে উম্মীর ইকতেদা করা জায়েয নয়। কেননা, উম্মী লোকটি যদিও উপস্থিত কেরাআত পড়তে পারে না, কিন্তু সে পড়তে সক্ষম। কারণ, সে কেরাআত শিখতে পারে। বোবার মধ্যে তো এ সক্ষমতাটুকুও নেই।

১৩. যার শরীরের যতটুকু আবৃত রাখা ফরয ততটুকু আবৃত রাখা ব্যক্তির সতর খোলা ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করা জায়েয নয়।

১৪. যে ব্যক্তি রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম তার পেছনে যারা রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম তাদের ইকতেদা করা জায়েয নয়। আর যে ব্যক্তি কেবল সিজদা করতে অক্ষম তার পেছনেও (সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তির) ইকতেদা করা জায়েয নয়।

১৫. নফল নামায পালনকারীর পেছনে ফরয নামায পালনকারীর ইকতেদা করা জায়েয নয়।

১৬. নফল নামায পালনকারীর পেছনে মানতের নামায পালনকারীর ইকতেদা করা জায়েয নয়। কেননা, মানতের নামায ওয়াজিব।

১৭. কসমের নামায পালনকারীর পেছনে মানতের নামায পালনকারীর ইকতেদা করা জায়েয নয়। যেমন কেউ কসম করল যে, আজ আমি চার রাকআত নামায পড়ব এবং অন্য কোন ব্যক্তি চার রাকআত নামাযের মানত করল, তবে সেই মানতকারী ব্যক্তি যদি কসমকারী ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করে নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে না। কেননা, মানতের নামায ওয়াজিব এবং কসমের নামায নফল। কেননা, কসমপূর্ণ করা ওয়াজিব হলেও তাতে নামায না পড়ে কাফ্‌ফারা দিলেও চলে।

১৮. যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে আরবী হরফগুলো উচ্চারণ করতে পারে না, যেমন– س কে ث -এর মত করে এবং ر কে ل -এর মত করে উচ্চারণ করে অথবা অন্য কোন হরফে এরূপই বিকৃতি ও পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে তার পেছনে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণকারী ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে না। অবশ্য যদি সম্পূর্ণ কেরাআতের মধ্যে যদি এক আধটা হরফ (অসতর্কতা বশতঃ) এরূপ ভুল হয়ে যায় তবে ইকতেদা শুদ্ধ হবে।

১১তম শর্ত ঃ ইমাম এরূপ ব্যক্তি না হওয়া চাই, যার একাকী নামায পড়া ওয়াজিব।

অর্থাৎ, এরূপ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করা শুদ্ধ নয়, যার জন্য তখন (ইকতেদা করার সময়) একাকী নামায পালন করা জরুরী। যেমন– মাসবূক ব্যক্তির ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর একাকী আদায় করা আবশ্যক। সুতরাং কেউ যদি মাসবূকের পেছনে ইকতেদা করে, তবে তার ইকতেদা শুদ্ধ হবে না।

১২তম শর্ত ঃ ইমাম অন্য কোন ইমামের মুক্তাদী না হওয়া।

অর্থাৎ, এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো যাবে না, যে অন্য কোন ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায পড়ছে। চাই সে পূর্ণাঙ্গ মুক্তাদী হোক, যেমন ঃ মুদরিক, অথবা অপূর্ণাঙ্গ তবে বিধানগত, যেমন ঃ লাহেক। যখন সে ইমামের সাথে পড়তে না পারা রাকআতগুলো পড়ছে, তখনও সে বিধানগতভাবে মুক্তাদী, কাজেই কোন ব্যক্তি যদি মুদরিক ও লাহেকের পেছনে ইকতেদা করে, তবে তার ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে মাসবূক যদি লাহেকের বা লাহেক মাসবূকের ইকতেদা করে তবে তাও শুদ্ধ হবে না।

জামাআত শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে বারোটি শর্ত আমি এখানে বর্ণনা করেছি, যদি এর মধ্য থেকে কোন শর্ত কোন মুক্তাদীর মধ্যে পাওয়া না যায়, তবে তার

ইকতেদা শুদ্ধ হবে না। আর কোন মুক্তাদীর ইকতেদা শুদ্ধ না হলে তার সেই নামাযও শুদ্ধ হবে না, যা সে ইকতেদা করে আদায় করেছে।

জামাআতের বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ জুমুআ ও দুই ঈদের নামাযে জামাআত শর্ত। অর্থাৎ, এ নামাযগুলো একাকী পড়া শুদ্ধই নয়। (ইমাম ব্যতীত অন্ততঃ তিনজন লোক থাকতে হবে।) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য জামাআত ওয়াজিব, যদি কোন ওযর না থাকে। তারাবীহ্‌র নামাযের জন্য জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যদিও এক খতম কুরআন মজীদ জামাআত সহকারে আদায় হয়ে যায় (তবুও অবশিষ্ট দিনগুলোর তারাবীহর নামায জামাআত সহকারে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা)। এমনিভাবে সূর্য গ্রহণের নামায ও রমযান মাসে বিত্‌রের নামাযে জামআত মুস্তাহাব। রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময় বিত্‌রের নামায নিয়মিত জামাআতে পড়া মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু যদি নিয়মিত না পড়ে; বরং কখনও কখনও দু'তিন জন মিলিত হয়ে জামাআতে পড়ে নেয় তবে তা মাকরূহ হবে না। চন্দ্রগ্রহণের নামায ও অন্য সকল নফল নামাযে জামাআত যদি এরূপ গুরুত্বের সাথে করা হয়, যেরূপ ফরয নামাযে হয়ে থাকে, অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষকে সমবেত করে যদি (নফল নামাযে) জামাআত করা হয় তবে তা মাকরূহ তাহরীমী। কিন্তু যদি আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে এবং কাউকে ডাকাডাকি না করে যদি দু'তিন জন লোক এক হয়ে কোন নফল নামায পড়ে নেয়, তবে তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে সব সময় করবে না।

এমনিভাবে চারটি শর্ত সাপেক্ষে মসজিদে প্রত্যেক ফরয নামাযের (একবার জামাআত হয়ে যাওয়ার পর) দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ তাহরীমী। শর্তগুলো এই–

১. মসজিদটি যদি মহল্লার (ভেতরে অবস্থিত) হয় এবং সদর রাস্তার উপর না হয় মহল্লাহর মসজিদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ মসজিদ, যার ইমাম ও নামাযী নির্দিষ্ট থাকে।

২. প্রথম জামাআতটি উচ্চৈঃস্বরে আযান ও ইকামত দিয়ে করা হয়েছে।

৩. প্রথম জামাআতটি তারা পড়েছে, যারা সে মহল্লার অধিবাসী এবং যারা সেই মসজিদের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

৪. দ্বিতীয় জামাআতটি সেই আঙ্গিক ও গুরুত্বের সাথে করা হয়, যে আঙ্গিক ও গুরুত্বের সাথে প্রথম জামাআত করা হয়েছে। এই চতুর্থ শর্তটি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর অভিমত মুতাবিক। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, পূর্ববর্তী জামাআতের আঙ্গিক পরিবর্তন করা হলেও দ্বিতীয় জামাআত করা

মাকরূহ হবে। অতএব যদি দ্বিতীয় জামাআত মসজিদে না করে; বরং ঘরে আদায় করে তবে মাকরূহ হবে না।

এমনিভাবে উল্লিখিত চারটি শর্তের মধ্যে কোন শর্ত যদি না পাওয়া যায়, যেমন– মসজিদ যদি সদর রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত হয় এবং মহল্লার মসজিদ না হয়, যার সংজ্ঞা উপরে বর্ণিত হয়েছে তবে তাতে দ্বিতীয়; বরং তৃতীয় চতুর্থ জামাআতও মাকরূহ নয়। অথবা প্রথম জামাআত যদি উচ্চৈঃস্বরে আযান ও ইকামত দিয়ে আদায় না করা হয় তবে দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ নয়। কিংবা প্রথম জামাআতটি তারা করেছে, যারা সেই মসজিদের মহল্লায় থাকে না এবং যারা সেই মসজিদের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নয়, অথবা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর অভিমত মুতাবিক, দ্বিতীয় জামাআত এরূপ আঙ্গিকে করা না হয়, যে আঙ্গিকে প্রথম জামাআত আদায় করা হয়েছে, যেমন ঃ প্রথম জামাআতের ইমাম যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে সেই জায়গা ছেড়ে দাঁড়ায় তবে পূর্ববর্তী জামাআতের আঙ্গিক পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ যদিও কিছু কিছু লোক ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর অভিমত মুতাবিক আমল করে থাকেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রবল। বর্তমান যুগে দীনী বিষয়ে, বিশেষ করে নামাযের জামাআতের ব্যাপারে যে উদাসীনতা ও অলসতা প্রদর্শিত হচ্ছে তার দাবিও এই যে, পূর্ববর্তী জামাআতের আঙ্গিক পরিবর্তন সত্ত্বেও দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ বলে ফতওয়া দেওয়া চাই। অন্যথায় মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এ আশায় প্রথম জামাআত পরিত্যাগ করে বসবে যে, আমরা নিজেরা দ্বিতীয় জামাআত করে নেব।

ইমাম ও মুক্তাদী সংক্রান্ত মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ নামাযে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যিনি ইমামতির উপযুক্ত এবং যার মধ্যে ভাল গুণাবলী বেশি, তাকেই ইমাম নিযুক্ত করা মুসল্লীদের কর্তব্য। যদি একাধিক লোক এমন থাকে, যারা ইমামতির যোগ্যতায় সমান, তবে অধিক লোকের অভিমত মুতাবিক কাজ করবে। অর্থাৎ, যাঁর প্রতি অধিক সংখ্যক লোকের রায় থাকে তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করবে। ইমামতির জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি থাকতে যদি মুসল্লীগণ এমন কাউকে ইমাম নিয়োগ করে যিনি অপক্ষোকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন, তবে তারা সুন্নত তরক করার অপরাধে অপরাধী হবে।

২. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মাসায়েল ভালভাবে জানে, তার মধ্যে যদি বাহ্যতঃ কোন পাপাচার না থাকে, তার সুন্নত পরিমাণ কেরাআত মুখস্ত থাকে এবং শুদ্ধ করে কুরআন পড়তে পারে, তবে সে ব্যক্তিই ইমামতির জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। তারপর যে ব্যক্তি কেরাআত ভাল পড়ে অর্থাৎ, তাজবীদের নিয়ম-কানুন মুতাবিক পড়ে, তারপর যে ব্যক্তি অপেক্ষোকৃত অধিক পরহেযগার; তারপর যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী; তারপর যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক সদাচারী; তারপর যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক সুদর্শন; তারপর যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক সম্ভ্রান্ত; তারপর যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল; তারপর যে ব্যক্তির লেবাস-পোষাক অপেক্ষাকৃত ভাল; তারপর যে ব্যক্তির মাথা অপেক্ষাকৃত বেশি বড়, তবে মানানসই পরিমাণ, তারপর মুসাফিরদের তুলনায় মুকীম অগ্রগণ্য; তারপর যে ব্যক্তি বংশানুক্রমে আযাদ. তারপর ছোট হাদাছের জন্য তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি বড় হাদাছের জন্য তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির চেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কারও কারও মতে, বড় হাদাছের জন্য তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি অগ্রগণ্য হবে। যার মধ্যে দু'টি গুণ রয়েছে সে একগুণের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। যেমন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মাসায়েলও জানে এবং কেরাআতও শুদ্ধ পড়ে সে কেবল নামাযের মাসায়েল জানা ব্যক্তি যার কেরাআত শুদ্ধ নয় তার তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

৩. মাসআলা ঃ কারও গৃহে নামাযের জামাআত হলে সে ঘরের মালিক (যোগ্যতাসম্পন্ন হলে) ইমামতির জন্য অগ্রগণ্য। তারপর সে ব্যক্তি, যাকে গৃহের মালিক ইমামতি করতে বলে। কিন্তু গৃহের মালিক যদি একেবারে মূর্খ হয় এবং অন্যেরা মাসায়েল সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে তাদের থেকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইমাম মনোনীত হবে।

৪. মাসআলা ঃ যে মসজিদে কোন (যোগ্য) ইমাম নিযুক্ত আছে সে মসজিদে তার উপস্থিতিতে অন্য কারও ইমামতি করার অধিকার নেই; কিন্তু নিযুক্ত ইমাম যদি অন্য কাউকে ইমামতি করতে বলে তবে তাতে কোন আপত্তি নেই।

৫. মাসআলা ঃ কাযী অর্থাৎ, শরীয়তের বিচারপতি বা মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান (ইমামতি করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন হলে) তার উপস্থিতিতে অন্য কারও ইমামতি করার অধিকার নেই।

৬. মাসআলা ঃ ইমামের প্রতি মুসল্লীগণ অসন্তুষ্ট থাকলে তাদের অসন্তুষ্টিতে ইমামতি করা মাকরূহ তাহরীমী। কিন্তু সে ইমাম যদি অন্য সকলের তুলনায় ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাখে। অর্থাৎ, ইমামের গুণাবলী তার সমান কারও মধ্যে পাওয়া না যায় তবে তার ইমামতি করা মাকরূহ হবে না; বরং এমতাবস্থায় যে বক্তি তার ইমামতির ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকবে, ভুল তারই।

৭. মাসআলা ঃ ফাসেক (পাপাচারী) ও বেদআতীকে ইমাম বানানো মাকরূহ তাহরীমী। কিন্তু, আল্লাহ না করুন, এরূপ লোক ছাড়া যদি অন্য কোন ভাল লোক সেখানে উপস্থিত না থাকে তবে মাকরূহ হবে না। এমনিভাবে যদি বেদআতী বা ফাসেক ইমাম প্রভাবশালী হয়, তাকে অপসারিত করার মত শক্তি না থাকে অথবা তাকে অপসারণ করা হলে বড় বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায়ও (তার পেছনে নামায পড়া) মুক্তাদীদের জন্য মাকরূহ হবে না।

৮. মাসআলা ঃ এরূপ ক্রীতদাস, যে ফিকাহ শাস্ত্রের বিধান মুতাবিক ক্রীতদাস সাব্যস্ত হয়–এমন ব্যক্তি নয় যাকে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সুযোগ ক্রয় করা হয়েছে–এরূপ ব্যক্তি যদি মুক্তিপ্রাপ্তও হয় তবে তাকে ইমাম নিযুক্ত করা, এমনিভাবে গ্রামের গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিকে অথবা এরূপ অন্ধ ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা-অপবিত্রতার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে না বা এরূপ ব্যক্তিকে, যে রাতের বেলায় চোখে কম দেখে এবং ব্যভিচার প্রসূত অর্থাৎ, অবৈধ সন্তানকে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু এরূপ লোক যদি জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হয় এবং লোকেরা এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করতে অপছন্দ না করে তবে মাকরূহ হবে না। এমনিভাবে এরূপ কোন সুদর্শন যুবক, যার দাড়ি গজায় নি তাকে ইমাম নিযুক্ত করা এবং নির্বোধ ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ তানযীহী।

৯. মাসআলা ঃ নামাযের সকল ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের উপর ওয়াজিব। তবে সুন্নত ও মুস্তাহাবের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। অতএব ইমাম যদি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হয় এবং সে রুকূতে যাওয়া ও রুকূ থেকে উঠার সময় হাত তোলে, তবে হানাফী মুক্তাদীর হাত তোলা আবশ্যক নয়।[১] কেননা, হাত উঠানো তাদের মতেও সুন্নত।

এমনিভাবে ফজরের নামাযে শাফেঈ মাযহাবের ইমাম কুনূত পড়লে হানাফী মুক্তাদীদের জন্য তা জরুরী নয়। কিন্তু বিতরের নামাযে যেহেতু কুনূত পড়া ওয়াজিব তাই শাফেঈ মাযহাবের ইমাম যদি তার মাযহাব মুতাবিক রুকূর পরে কুনূত পড়ে তবে হানাফী মুক্তাদীদেরও রুকূর পরে পড়া উচিত।

১০. মাসআলা ঃ নামাযে সুন্নত পরিমাণ কেরাআত অপেক্ষা বেশি বড় বড় সূরা পড়া বা রুকূ-সিজদা ইত্যাদিতে অনেক বেশি বিলম্ব করা ইমামের জন্য মাকরূহ। বরং মানুষের প্রয়োজন ও দুর্বলতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের

---

১. এবং উত্তমও নয়, বরং মাকরূহ।

কর্তব্য। মুক্তাদীদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বেশি দুর্বল তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কেরাআত ইত্যাদি পড়া, এমনকি অধিক প্রয়োজনের সময় সুন্নত পরিমাণ কেরাআতের চেয়েও ছোট কেরাআত পড়া উত্তম, যাতে মানুষের কষ্ট হওয়ার কারণে জামাআত ছোট হওয়ার আশঙ্কা না হয়।

১১. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি একজনই হয়, সে বালেগ পুরুষ হোক বা নাবালেগ ছেলে তবে তাকে ইমামের ডান পার্শ্বে ইমামের বরাবরে বা কিছুটা পেছনে সরে দাঁড়াতে হবে। যদি সে ইমামের বাম দিকে বা ইমামের সোজা পেছনে দাঁড়ায় তবে তা মাকরূহ হবে।

১২. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি একাধিক হয় তবে তাদের ইমামের পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়াতে হবে। আর যদি তারা ইমামের বরবার ডান পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে দাঁড়ায় এবং তারা সংখ্যায় দু'জন হয় তবে মাকরূহ তানযীহী হবে, আর দু'য়ের অধিক হলে মাকরূহ তাহরীমী হবে। কেননা, মুক্তাদী দু'য়ের অধিক হলে সামনে দাঁড়ানো ইমামের জন্য ওয়াজিব।

১৩. মাসআলা ঃ যদি নামায শুরু করার সময় মুক্তাদী এক জনই থেকে থাকে এবং সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়ায়, তারপর আরও কিছু মুক্তাদী এসে জামাআতে শরীক হয়, তবে প্রথম মুক্তাদীর (নামাযের অবস্থায়ই আস্তে আস্তে পা পেছনের দিকে সরিয়ে) পেছনে সরে আসা উচিত যাতে সকল মুক্তাদী মিলিত হয়ে ইমামের পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু যদি সে নিজে সরে না আসে তবে আগন্তুক মুক্তাদীদের থেকে কেউ তাকে আস্তে পেছনে টেনে নেবে। মাসআলা জানা না থাকার কারণে যদি আগন্তুক মুক্তাদিগণ ইমামের ডান বা বাম পার্শ্বে দাড়িয়ে যায় এবং প্রথম মুক্তাদীকে পেছনে টেনে না আনে তবে ইমাম (এক কদম) সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, যাতে সকল মুক্তাদী মিলিত হয়ে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি মুক্তাদীদের পেছনে সরে দাঁড়ানোর মত জায়গা না থাকে তখনও ইমাম সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মুক্তাদী যদি নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে অনবগত হয়; যেমনটি আমাদের বর্তমান যুগে প্রবল, তবে তাকে পেছনে টেনে আনা উচিত নয়। কেননা, এতে হয়ত সে এমন কোন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে, যাতে তার নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে।

১৪. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি মহিলা বা নাবালেগা মেয়ে হয় তবে মুক্তাদী ইমামের পেছনে দাঁড়াবে; মুক্তাদী একজন হোক বা একাধিক।

১৫. মাসআলা ঃ মুক্তাদীদের মধ্যে যদি বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকে, কিছু পুরুষ কিছু মহিলা, কিছু নাবালেগ ছেলে-মেয়ে, তবে ইমাম নিম্নবর্ণিত নিয়মে তাদের সারিবদ্ধ করে নেবে, প্রথমে পুরুষদের সারি; তারপর নাবালেগ ছেলেদের সারি; তারপর বালেগা মহিলাদের সারি; তারপর নাবালেগা মেয়েদের সারি।

১৬. মাসআলা ঃ ইমামের কর্তব্য কাতারগুলো সোজা করে দেওয়া, অর্থাৎ, মানুষকে সারির মধ্যে আগে, পিছে হয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করবে। সবাইকে সারি খুব সোজা করে দাঁড়াতে নির্দেশ দেবে। সারির মধ্যে একে অপরের সাথে গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়াবে। সারির মাঝে ফাঁক থাকা উচিত নয়।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একাকী সারির পেছনে দাঁড়ানো মাকরূহ। বরং এমতাবস্থায় সামনের সারি থেকে কোন ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে নিজের সাথে দাঁড় করাবে। কিন্তু কাউকে পেছনে টেনে আনলে যদি সে তার নামায নষ্ট করে ফেলবে বলে আশঙ্কা হয় অথবা সে খারাপ ভাববে বলে মনে হয়, তবে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দেবে।[১]

১৮. মাসআলা ঃ সামনের সারিতে জায়গা থাকতে পরবর্তী সারিতে দাঁড়ানো মাকরূহ। হাঁ, সামনের সারি পূর্ণ হয়ে গেলে তখন পরবর্তী সারিতে দাঁড়াবে।

১৯. মাসআলা ঃ এরূপ জায়গায় পুরুষ কর্তৃক কেবল মহিলাদের ইমামতি করা মাকরূহ তাহরীমী, যেখানে অন্য কোন পুরুষ বা সেই ইমামের কোন মাহরাম মহিলা, যেমন– তার স্ত্রী, মা, বোন বা এরূপ কেউ না থাকে। তবে অন্য কোন পুরুষ বা ইমামের মাহরামা কোন মহিলা থাকলে তখন মাকরূহ হবে না।[২]

২০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ফজর, মাগরিব বা ইশা'র ফরয একাকী নীরবে পড়ছে, এমতাবস্থায় কেউ তার ইকতেদা করল তখন তাতে দু'টি সূরত হতে পারে ঃ

এক. প্রথম ব্যক্তি মনে মনে নিয়্যত করল যে, আমি এখন ইমাম হলাম, যাতে নামায জামাআত সহকারে আদায় হয়।

দুই. প্রথম ব্যক্তি ইমামতির নিয়্যত করল না; বরং সে পূর্ববৎ এই মনে করে যে, সে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু আমি তার ইমামতি করব না, আমি আগের মত একাকীই পড়ছি।

প্রথম সূরতে প্রথম ব্যক্তিটি কেরাআত যতটুকু পড়েছে, সেখানে থেকে সশব্দে কেরাআত পড়া তার উপর ওয়াজিব। অতএব যদি সূরা ফাতিহা বা পরবর্তী সূরারও কিছু অংশ নীরবে পড়ে ফেলে থাকে তবে সে সেখান থেকেই

---

১. যেহেতু এজন্য অনেক মাসায়েল সম্পর্কে অবগতি থাকা আবশ্যক অথচ এযুগে অনবগতিই প্রবল, তাই যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দেবে; পেছনে টানবে না।

২. এ মাসআলাটি দুররে মুখতার থেকে সংগৃহীত। এ মাসআলায় ফিকাহবিদগণের মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু মূল গ্রন্থকার এখানে যে অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটাই তাঁর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা বা পরবর্তী সূরার অবশিষ্ট অংশ সশব্দে পড়বে। কেননা, ফজর, মাগরিব ও ইশা'র ফরয নামাযে সশব্দে কেরাআত পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সূরতে সশব্দে কেরাআত পড়া তার উপর ওয়াজিব নয়, তবে সে মুক্তাদীর নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, মুক্তাদীর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম কর্তৃক ইমামতির নিয়্যত করা আবশ্যক নয়।

২১. মাসআলা ঃ ইমাম বা একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তি যখন ঘর বা ময়দানে নামায পড়ে তখন তার নিজের ডান বা বাম ভ্রু বরাবর এক হাত বা তার চেয়ে উঁচু এবং (ন্যূনতম) এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা কোন জিনিস দাঁড় করে দেওয়া মুসতাহাব। হাঁ, যদি মসজিদে নামায পড়ে অথবা এমন কোন জায়গায়, যেখানে লোক চলাচল করে না সেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই। সে জিনিসটিকে সুত্রা বলা হয়। ইমামের সুত্রা সকল মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট। সুত্রা স্থাপন করার পর সুতরার বাইরে দিয়ে চলাচল করাতে কোন গুণাহ হয় না, কিন্তু সুত্রার ভেতর দিয়ে কেউ চলাচল করলে সে গুণাহগার হবে।

২২. মাসআলা ঃ লাহেক এরূপ মুক্তাদীকে বলা হয়, জামাআতে শরীক হওয়ার পর যার কিছু রাকআত ছুটে যায়, চাই তা ওযরের কারণে হোক, যেমন ঃ (কেউ জামাআতে শরীক হওয়ার পর) নামাযের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল, আর এ ফাঁকে নামাযের কোন রাকআত বা তার অংশ বিশেষ ছুটে গেল, অথবা মানুষের ভিড়ের কারণে রুকূ-সিজদা ইত্যাদি করতে পারল না। অথবা ওযূ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ওযূ করতে গেল, আর এ ফাঁকে তার কিছু রাকআত ছুটে গেল (খাওফের নামাযে প্রথম দল হল লাহেক, এমনিভাবে যে মুকীম ব্যক্তি মুসাফিরের ইকতেদা করে এবং মুসাফির নামায কসর করে সেই মুকীম ব্যক্তিও ইমামের নামায শেষ করার পর লাহেক।) অথবা কোন ওযর ব্যতিরেকে রাকআত ছুটে যাক। যেমন ঃ কেউ ইমামের পূর্বেই কোন রাকআতের রুকূ-সিজদা করে ফেলল।[১] যার ফলে সেই রাকআতটি অযথা সাব্যস্ত হয়ে গেল তখন সেই রাকআতটির হিসাবে তাকে লাহেক বলা হবে। অতএব, লাহেক এর উপর ওয়াজিব প্রথমে তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করে নেওয়া। ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করার পর যদি জামাআত তখনও চলতে থাকে তবে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। আর যদি জামাআত শেষ হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট নামাযও পড়ে নেবে।

২৩. মাসআলা ঃ লাহেককে তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো বেলায়ও মুক্তাদী গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, মুক্তাদী যেমন ঃ নামাযে কেরাআত পড়ে না তেমনি লাহেকও কেরাআত পড়বে না; বরং সে কেবল চুপ করে দাঁড়িয়ে

---

১. অর্থাৎ, ইমামের আগেই রুকূ বা সিজদায় চলে যায় এবং ইমামের পূর্বেই আবার উঠে যায়।

থাকবে। এমনিভাবে মুক্তাদীর ভুল হয়ে গেলে যেমন তার সিজদায়ে সাহ্ব দিতে হয় না, তেমনি লাহেককেও সিজদায়ে সাহ্ব দিতে হবে না।

২৪. মাসআলা ঃ মাসবূক অর্থাৎ, ইমামের সাথে শরীক হওয়ার পূর্বে যে মুক্তাদীর দু'এক রাকআত ছুটে গেছে, সে প্রথমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে নামাযের যেটুকু অংশ অবশিষ্ট আছে তা জামাআতে আদায় করবে। ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর উঠে দাঁড়াবে এবং তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করবে।

২৫. মাসআলা ঃ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তির মত কেরাআত সহকারে আদায় করবে। যদি সেই রাকআতগুলোতে কোন (ওয়াজিব সংক্রান্ত) ভুল হয়ে যায়, তবে তার সিজদায়ে সাহবও করা আবশ্যক।

২৬. মাসআলা ঃ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এরূপ ধারাবাহিকভাবে আদায় করবেঃ প্রথমে কেরাআত বিশিষ্ট রাকআতগুলো পড়বে, তারপর কেরাআতবিহীন রাকআতগুলো। আর ইমামের সাথে যে রাকআতগুলো পড়েছে সেগুলোর হিসাবে তাশাহহুদের জন্য বসবে। অর্থাৎ, সে রাকআতের হিসাবে যেটি দ্বিতীয় রাকআত হবে তাতে প্রথম বৈঠক করবে এবং যেটি তৃতীয় রাকআত হয় এবং তা যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট ওয়াজিব (বা ফরয) নামাযে হয়, তবে তাতে শেষ বৈঠক করবে। এ হিসাবে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাকআতে বসবে।

উদাহরণ ঃ জোহরের নামাযের তিন রাকআত হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তি এসে জামাআতে শরীক হল। এরূপ ব্যক্তি ইমামের সালাম ফেরানো পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এ ধারাবাহিকতা সহকারে আদায় করবে যে, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা (বা সূরার অংশ) পড়তঃ রুকূ-সিজদা করে প্রথম বৈঠক করবে। কেননা, এ রাকআতটি (ইমামের সঙ্গে পাওয়া রাকআতের সাথে) মিলিয়ে পড়া রাকআতের হিসাবে দ্বিতীয় রাকআত। এরপর দ্বিতীয় রাকআতেও সূরা ফাতিহার পর সূরা পড়বে এবং এরপর বসবে না। কেননা, এ রাকআতটি (ইমামের সঙ্গে পাওয়া রাকআতের সাথে) মিলিয়ে পড়া রাকআতগুলোর হিসেবে তৃতীয় রাকআত। এরপর তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়বে না। কেননা, এটি কেরাআতের রাকআত ছিল না। এর রাকআতের পর বসবে। এটা শেষ বৈঠক।

২৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ লাহেকও হয় এবং মাসবূবকও হয়, যেমনঃ কেউ এক বা একাধিক রাকআত হয়ে যাওয়ার পর জামাআতে শরীক হয়েছে এবং জামাআতে শরীক হওয়ার পর তার আরও কিছু রাকআত ছুটে গেছে। এমতাবস্থায় সে জামাআতে শরীক হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো প্রথমে আদায় করবে, যেগুলো ছুটে যাওয়ার কারণে সে লাহেক হয়েছে। কিন্তু সেই রাকআতগুলো আদায় করার সময় সে নিজেকে ইমামের পেছনে ইকতেদাভুক্ত মনে করবে। অর্থাৎ, সে কেরাআত পড়বে না এবং ইমামের রাকআতগুলোর ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এরপর যদি জামাআত চলতে থাকে তবে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। অন্যথায় অবশিষ্ট নামাযও পড়ে নেবে। এরপর সেই রাকআতগুলো পড়বে, যেগুলো ছুটে যাওয়ার কারণে সে মাসবূক হয়েছে।

উদাহরণ ঃ আসরের নামাযের এক রাকআত হয়ে যাওয়ার পর কেউ এসে জামাআতে শরীক হল। শরীক হওয়ার পরেই তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেল এবং সে ওযূ করতে গেলে ইত্যবসরে জামাআত শেষ হেয় গেল। এমতাবস্থায় সে লোকটি প্রথমে সেই তিন রাকআত আদায় করবে যেগুলো তার জামাআতে শরীক হওয়ার পর ছুটেছে। অতঃপর সেই রাকআতটি পড়বে যা তার জামাআতে শরীক হওয়ার পূর্বে ছুটেছিল। জামাআতে শরীক হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো সে মুক্তাদীর মত আদায় করবে অর্থাৎ, কেরাআত পড়বে না। এ তিন রাকআতের প্রথম রাকআত পড়ার পর বসবে। কেননা, এটা ইমামের দ্বিতীয় রাকআত এবং ইমাম এ রাকআতে বসেছিল। এরপর দ্বিতীয় রাকআতে বসবে না। কেননা, এটা ইমামের তৃতীয় রাকআত। এরপর তৃতীয় রাকআতে বসবে। কেননা, এটা ইমামের চতুর্থ রাকআত এবং এ রাকআতে ইমাম বসেছিল। এরপর সেই রাকআতটি পড়বে, যেটি তার জামাআতে শরীক হওয়ার পূর্বে ছুটেছিল এবং সে রাকআতেও বসবে। কেননা, এটা তার চতুর্থ রাকআত। এ রাকআতে তাকে কেরাআতও পড়তে হবে। কেননা, এ রাকআতে সে মাসবূক হয়েছে। মাসবূক তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করার ক্ষেত্রে একাকী নামায পালনকারীর মত গণ্য হয়।

২৮. মাসআলা ঃ নামাযের সকল রুকন ইমামের সাথে সাথে বিলম্ব ব্যতিরেকে আদায় করা মুক্তাদীদের জন্য সুন্নত। তাহরীমাও ইমামের তাহরীমার সাথে, রুকূও ইমামের রুকূর সাথে, কাওমাও তাঁর কাওমার সাথে এবং সিজদাও তাঁর সিজদার সাথে।

মোটকথা ঃ মুক্তাদী তার নামাযের প্রতিটি কাজ ইমামের প্রতিটি কাজের সাথে আদায় করবে। কিন্তু প্রথম বৈঠকে ইমাম যদি মুক্তাদিদের তাশাহ্হুদ শেষ করার পূর্বে দাঁড়িয়ে যায়, তবে মুক্তাদীগণ তাশাহ্হুদ শেষ করে দাঁড়াবে।[১] এমনিভাবে শেষ বৈঠকে ইমাম যদি মুক্তাদিদের তাশাহ্হুদ শেষ করার পূর্বে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে মুক্তাদিগণ তাশাহ্হুদ শেষ করে তারপর সালাম ফেরাবে। হাঁ, রুকূ-সিজদায় যদি মুক্তাদীগণ তাসবীহ পড়ে না সারে তবু ইমামের সাথেই দাঁড়িয়ে যাবে।

জামাআতে শামিল হওয়া, না হওয়ার মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ মহল্লা বা বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদে এমন সময় গিয়ে পৌঁছে, যখন সেখানে জামাআত হয়ে গেছে তখন জামাআতের খোঁজে অন্য মসজিদে যাওয়া তার জন্য মুসতাহাব। এছাড়া তার এও এখতিয়ার আছে যে, সে তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে একত্র করে জামাআত করতে পারে।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ নিজ গৃহে একাকী ফরয নামায পড়ে ফেলে, তারপর দেখে যে, সেই ফরয নামাযের জামাআত হচ্ছে এবং সেটা যদি জোহর বা ইশা'র ওয়াক্ত হয়, তবে তার সেই জামাআতে শরীক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ফজর, আসর বা মাগরিবের ওয়াক্ত হলে জামাআতে শরীক হবে না। কেননা, ফজর ও আসরের নামাযের পর নফল নামায পড়া মাকরূহ। আর মাগরিবের সময় এজন্য জামাআতে শরীক হবে না যে, দ্বিতীয়বার পড়া নামাযটি হবে নফল, অথচ তিন রাকআত নফল শরীয়তে অনুমোদিত নয়।

৩. মাসআলা ঃ কেউ একাকী ফরয নামায পড়তে শুরু করল, এমতাবস্থায় যদি সেই ফরয নামাযেরই জামাআত শুরু হয় এবং ফরয নামাযটি দুই রাকআত বিশিষ্ট হয়, যেমন ঃ ফজরের নামায, তখন তার বিধান হল এই যে, যদি একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তি প্রথম রাকআতের সিজদা না করে থাকে তবে সে নামায ছেড়ে দেবে এবং জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। আর যদি এমন হয় যে, সে প্রথম রাকআতের সিজদা করেছে বটে, দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা করে নি তবে

---

১. যদিও এ আশঙ্কা থাকে যে, ইমাম রুকূতে চলে যাবে। যদি বাস্তবিকই ইমাম রুকূতে চলে যায়, তবে মুক্তাদী তাশাহ্হুদ শেষ করার পর তিন তাসবীহ পরিমাণ দাঁড়িয়ে রুকূতে যাবে। এরূপ ধারাবাহিকভাবে সকল রুকন আদায় করে যাবে। চাই ইমামকে যতদূরে গিয়েই পাক না কেন। এটা ইকতেদার পরিপন্থী হবে না। কেননা, ইমামের সাথে সাথে কাজে শরীক থাকাকে যেমন ইকতেদা বলে তেমনি ইমামের পেছনে পেছনে তাকে অনুসরণ করে যাওয়াকেও ইকতেদা বলে। ইমামের পূর্বে কোন কাজ করা ইকতেদার পরিপন্থী।

সেক্ষত্রেও নামায ছেড়ে দেবে এবং জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। শ্য যদি সে দ্বিতীয় রাকআতেরও সিজদা করে ফেলে থাকে, তবে উভয় রাকআত পূর্ণ করবে। আর সেই ফরয নামাযটি যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট হয়, যেমন ঃ মাগরিবের নামায, তবে তার বিধান হল এই যে, যদি সে দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা না করে ফেলে তাহলে সে নামায ছেড়ে দেবে। কিন্তু যদি সে দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা করে ফেলে, তবে সে নামায পূর্ণ করবে এবং তারপর জামাআতে শরীক হবে না। কেননা, তিন রাকআত নফল নামায জায়েয নেই। আর সে ফরয নামায যদি চার রাকআত বিশিষ্ট হয়, যেমন ঃ জোহর, আসর ও ইশা, তবে যদি সে প্রথম রাকআতের সিজদা না করে থাকে তাহলে নামায ছেড়ে দেবে। কিন্তু যদি সে সিজদা করে ফেলে, তবে দু'রাকআতের পর তাশাহহুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে এবং জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। আর যদি তৃতীয় রাকআত শুরু করে ফেলে এবং সেই রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তবে নামায ছেড়ে দেবে। আর যদি সিজদা করে ফেলে থাকে তবে নামায পূর্ণ করবে। যে সকল ক্ষেত্রে নামায পূর্ণ করা হবে তন্মধ্যে মাগরিব, ফজর ও আসরের নামাযে পুনরায় জামাআতে শরীক হবে না। জোহর ও ইশা'র নামাযে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। আর যখন নামায ছেড়ে দিতে হয় তখন দণ্ডায়মান অবস্থায় (ডানদিকে) এক সালাম ফিরিয়ে ছেড়ে দেবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ নফল নামায শুরু করে থাকে, অপর দিকে ফরয নামাযের জামাআত শুরু হল তবে নফল নামায ছাড়বে না; বরং এমতাবস্থায় দু'রাকআত পূর্ণ করতঃ সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হবে; যদিও চার রাকআতের নিয়্যত করে থাকে না কেন।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি জোহর বা জুমুআর সুন্নতে মুয়াক্কাদা চার রাকআত পড়তে শুরু করে, অপর দিকে ফরযের জামাআত শুরু হয় বা জুমুআর খুতবা শুরু হয়, তবে জাহের মাযহাব মতে, দুই রাকআত পূর্ণ করতঃ সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হবে এবং যদি জুমুআর দিন হয় এবং খুতবা চলতে থাকে, তবে খুতবা শ্রবণে শরীক হবে। অনেক ফিকাহবিদের মতে, চার রাকআত পূর্ণ করাই অধিক গ্রহণযোগ্য। আর যদি তৃতীয় রাকআত শুরু করে ফেলে তবে চার রাকআত পূর্ণ করা আবশ্যক।

৬. মাসআলা ঃ যদি ফরয নামাযের জামাআত শুরু হয় এবং সুন্নত পড়লে জামাআতের কোন রাকআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সুন্নত বা অন্য কোন নফল নামায শুরু করবে না। হাঁ, যদি নিশ্চিত বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় যে, কোন রাকআত ছুটবে না তবে সুন্নত পড়ে নেবে। যেমন ঃ জোহরের সময় ফরযের জামাআত শুরু হল, আর এ আশঙ্কা হল যে, সুন্নত

পড়লে জামাআতের কোন রাকআত ছুটে যাবে, তবে এমতাবস্থায় ফরযের আগের সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়বে না। অতঃপর জোহর বা জুমুআর ফরযের পরবর্তী সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করে তারপর পূর্ববর্তী সুন্নত পড়া উত্তম। কিন্তু ফজরের সুন্নত যেহেতু অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই তার বিধান হল এই যে, সুন্নত পড়ে জামাআতে শরীক হলে যদি জামাআতে এক রাকআতও পাওয়ার আশা থাকে, তবে সুন্নত আগে পড়ে নেবে।[১] যদি এক রাকআতও পাওয়ার আশা না থাকে তবে পড়বে না। এরপর ইচ্ছা হলে সূর্যোদয়ের পর পড়বে।

৭. মাসআলা ঃ যদি এ আশঙ্কা হয় যে, নামাযের সমস্ত মুসতাহাব ও সুন্নতের প্রতি যত্নবান হয়ে ফজরের সুন্নত পড়তে গেলে জামাআত ছুটে যাবে, তবে এমতাবস্থায় মুসতাহাব ও সুন্নতসমূহ বাদ দিয়ে কেবল ফরয ও ওয়াজিব আদায় করে সুন্নত পড়ে নেবে।

৮. মাসআলা ঃ ফরয নামাযের জামাআত চলাকালে কোন সুন্নত পড়তে হলে, চাই তা ফজরের সুন্নত হোক বা অন্য কোন নামাযের সুন্নত হোক, এমন জায়গায় পড়বে, যা মসজিদ থেকে পৃথক। কেননা, যেখানে ফরয নামাযের জামাআত চলতে থাকে সেখানে অন্য কোন নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। যদি এরূপ আলাদা কোন জায়গা পাওয়া না যায়, তবে নামাযের সারির বাইরে মসজিদের কোন কোনায় পড়ে নেবে।

৯. মাসআলা ঃ জামাআতের শেষ বৈঠক পেলে, রাকআত না পেলেও জামাআতের ছওয়াব পেয়ে যাবে।

১০. মাসআলা ঃ ইমামের সাথে যে রাকআতের রুকূ পাবে সেই রাকআতটিও পাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু যদি রুকূ না পাওয়া যায় তবে সে রাকআতটি পাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে না।

যে সকল কারণে নামায নষ্ট হয়

১. মাসআলা ঃ নামাযরত অবস্থায় নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লুকমা দেওয়ার কারণে (অর্থাৎ, কেউ কুরআন শরীফ ভুল পড়াও তাকে সতর্ক করে দেয়ার কারণে) নামায নষ্ট হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ যেহেতু লুকমা দেয়া সংক্রান্ত মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে এবং কোন কোন লেখক এ বিষেয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, তাই আমি এতদ্‌সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল এখানে উল্লেখ করছি।

---

১. জাহের মাযহাব এটাই যে, কমপক্ষে এক রাকআত জামাআতে পাওয়ার আশা থাকলে আগে সুন্নত পড়ে নেবে, নতুবা তখন সুন্নত পড়বে না। অপর এক অভিমত মুতাবিক, শেষ বৈঠকে শরীক হওয়ার মত আশা থাকলেও আগে সুন্নত পড়বে। তবে জাহের মাযহাবের অভিমতটিই শ্রেয়।

২. মাসআলা ঃ সঠিক অভিমত এই যে, মুক্তাদী যদি তার ইমামকে লুকমা দেয়, তবে নামায নষ্ট হবে না। চাই ইমাম নামাযের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কেরাআত পড়ে থাকুক বা না থাকুক। এখানে প্রয়োজন পরিমাণ বলতে এ পরিমাণ কেরাআত উদ্দেশ্য, যতটুকু পড়া সুন্নত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হল, রুকূতে চলে যাওয়া। যেমনটি পরবর্তী মাসআলায় আসছে।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম যদি প্রয়োজন পরিমাণ কেরাআত পড়ে ফেলে, তবে তার উচিত রুকূতে চলে যাওয়া এবং মুক্তাদীদেরকে লুকমা দিতে বাধ্য না করা। এরূপ করা (অর্থাৎ, মুক্তাদীদেরকে লুকমা দিতে বাধ্য করা) মাকরূহ। এমনিভাবে মুক্তাদীদেরও উচিত, বিশেষ প্রয়োজন না দেখা দিলে ইমামকে লুকমা না দেওয়া। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে লুকমা দেওয়াও মাকরূহ। বিশেষ প্রয়োজন বলতে উদ্দেশ্য হল এই যে, ইমাম ভুল পড়ে সামনে পড়তে চায় অথবা রুকূ না করে বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে মুক্তাদী লুকমা দেবে। আর যদি, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকেও নিজের ইমামকে লুকমা দেয় তবু নামায নষ্ট হবে না, যেমনটি পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন নামাযরত ব্যক্তিকে লুকমা দেয় এবং লুকমা দাতা ব্যক্তি তার মুক্তাদী নয়, চাই সেও নামাযে থাকুক বা না থাকুক তবে যাকে লুকমা দেওয়া হল, সে যদি লুকমা গ্রহণ করে তবে সে লুকমা গ্রহণকারী ব্যক্তির নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তার ভুল যদি তার নিজেরই স্মরণে আসে, চাই লুকমাদাতা ব্যক্তির লুকমা দেওয়ার সাথে সাথে আসুক বা আগে-পরে; লুকমাদাতার লুকমার কারণে সে কোন রকম প্রভাবান্বিত না হয় এবং নিজের স্মরণের উপর নির্ভর করে পড়ে, তবে যাকে লুকমা দেওয়া হয়েছে তার নামায নষ্ট হবে না।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন নামাযরত ব্যক্তি এমন কাউকে লুকমা দেয়, যে তার তার ইমাম নয়,চাই সে ব্যক্তি নামাযরত হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় লুকমাদাতা ব্যক্তির নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৬. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি অন্য কারও পড়া শুনে বা কুরআন শরীফ দেখে ইমামকে লুকমা দেয়, তবে লুকমাদাতার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম যদি সে লুকমা গ্রহণ করে, তবে তাঁর নামাযও নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কুরআন শরীফ দেখে বা অন্য কারও পড়া শুনে মুক্তাদীর পূর্বের মুখস্থকৃত পড়া স্মরণে আসে, অতঃপর নিজের স্মরণের উপর নির্ভর করে লুকমা দেয়, তবে নামায নষ্ট হবে না।

৭. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় কুরআন শরীফ দেখে একটি আয়াত পড়ে তবু নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার দেখে পড়া আয়াতটি তার পূর্ব থেকে মুখস্থ থেকে থাকে, তবে নামায নষ্ট হবে না। অথবা

তা পূর্ব থেকে মুখস্থ ছিল না বটে, কিন্তু দেখে পড়া অংশটুকু পরিমাণ এক আয়াতের চেয়ে কম, তবে নামায নষ্ট হবে না।

৮. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি পুরুষের সাথে এভাবে দাঁড়ায় যে, একজনের কোন অঙ্গ অপর জনের কোন অঙ্গের বরাবর হয়ে যায়, তবে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এমন কি, যদি সিজদায় যাওয়ার সময় মহিলার মাথা পুরুষের পা বরাবর হয়ে যায় তবু নামায নষ্ট হয়ে যাবে। শর্তগুলো এই ঃ

১ম শর্ত ঃ মহিলা বালেগা হতে হবে। চাই যুবতী হোক বা বৃদ্ধা। অথবা সহবাসের উপযোগী নাবালেগা হতে হবে। অতএব, যদি কোন কম বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে নামাযে কোন পুরুষের বরাবরে দাঁড়ায় তবে নামায নষ্ট হবে না।

২য় শর্ত ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়জন নামাযরত হতে হবে। সুতরাং একজন যদি নামাযরত থাকে এবং অপরজন নামাযরত না থাকে, তবে এমতাবস্থায় উভয়ের এরূপ বরাবর হওয়ার কারণে নামায নষ্ট হবে না।

৩য় শর্ত ঃ উভয়ের মাঝখানে কোন আড়াল না থাকতে হবে। অতএব উভয়ের মাঝখানে যদি কোন পর্দা থাকে, অথবা কোন সুতরা অন্তরায় হয়, অথবা উভয়ের মাঝখানে এতটুকু জায়গা খালি থাকে, যেখানে একজন মানুষ অনায়াসে দাঁড়াতে পারে, তবে এক্ষেত্রেও নামায নষ্ট হবে না।

৪র্থ শর্ত ঃ মহিলাটির মধ্যে তার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে। অতএব মহিলাটি যদি পাগলী হয় অথবা হায়েয বা নেফাসগ্রস্ত হয়, তবে তার বরাবর হওয়ার কারণে নামায নষ্ট হবে না। কেননা, এ সকল অবস্থায় সেই মহিলাটি নামাযের মধ্যে গণ্য নয়।

৫ম শর্ত ঃ জানাযার নামায না হতে হবে। সুতরাং জানাযার নামাযে পুরুষ মহিলা একে অপরের বরাবরে দাঁড়াবার কারণে নামায নষ্ট হবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ পুরুষ মহিলা একে অপরের বরাবরে দাঁড়ানো এক রুক্ন পরিমাণ হতে হবে।[১] সুতরাং এর চেয়ে কম সময় যদি একে অপরের বরাবরে দাঁড়ায়, তবে নামায নষ্ট হবে না। যেমন ঃ একে অপরের বরাবরে এতটুকু সময় দাঁড়াল, যাতে রুকূ ইত্যাদি করা যায় না। তারপর একে অপরের বরাবরে দাঁড়ানো না থাকে, তবে এ সামান্য সময় বরাবরে দাঁড়াবার কারণে নামায নষ্ট হবে না।

৭ম শর্ত ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের তাহরীমা এক হতে হবে। অর্থাৎ, মহিলাটি তার বরাবরে দাঁড়ানো পুরুষ মুক্তাদী, কিংবা তারা উভয়ে তৃতীয় কোন ব্যক্তির মুক্তাদী হতে হবে।

---

১. **নামাযের রুক্ন চারটি ঃ** কেয়াম, কেরাআত, রুকূ ও সিজদা। এখানে এক রুক্ন পরিমাণ বলতে এতটুকু সময় উদ্দেশ্য, যাতে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা হয়।

৮ম শর্ত ঃ ইমাম কর্তৃক সেই মহিলার ইমামতির নিয়্যত করতে হবে। নামাযের শুরুতে করুক বা নামাযের মাঝখানে[১] যখন সেই মহিলা নামাযে শরীক হয়েছে তখন করুক। ইমাম যদি সেই মহিলার ইমামতির নিয়্যত না করে থাকে তবে পুরুষের সাথে তার বরাবর হয়ে দাঁড়াবার কারণে পুরুষের নামায নষ্ট হবে না; বরং এমতাবস্থায় সেই মহিলার নামাযই শুদ্ধ নয়।

৯. মাসআলা ঃ যদি ইমামের ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে কাউকে খলীফা নিযুক্ত না করে মসজিদের বাইরে চলে যায়, তবে মুক্তাদীদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১০ মাসআলা ঃ ইমামের ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি এমন কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে, যার মধ্যে ইমাম হওয়ার উপযুক্ততা নেই; যেমন ঃ কোন পাগল, নাবালেগ ছেলে বা কোন মহিলাকে খলীফা নিযুক্ত করল, তবে এমতাবস্থায় সবার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।[২]

১১. মাসআলা ঃ পুরুষ যদি নামাযে রত থাকে এবং মহিলা সে পুরুষকে নামাযের মধ্যেই চুমু দেয়, তবে সেই পুরুষের নামায নষ্ট হবে না। অবশ্য যদি চুমু দেওয়ার সময় পুরুষের কামভাব জাগ্রত হয়, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর মহিলা যদি নামাযরত থাকে এবং কোন পুরুষ তাকে চুমু দেয়, তবে মহিলার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। চাই পুরুষ কামভাব সহকারে চুমু দিক বা কামভাব ব্যতিরেকে এবং এতে মহিলার কামভাব জাগ্রত হোক বা না হোক।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যেতে চায়, তবে নামাযরত অবস্থায় তাকে বাধা দেওয়া এবং তাকে একাজ থেকে বিরত রাখা জায়েয; যদি এ বাধা প্রদান করতে গিয়ে আমলে কাছীর (নামাযের পরিপন্থী কাজ) না হয়। যদি আমলে কাছীর হয় তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সকল কারণে নামায মাকরূহ হয়

১. মাসআলা ঃ নামাযের সময় পরিহিত পোশাক স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম পরিধান করা অর্থাৎ, যে কাপড় যেভাবে পরিধান করার নিয়ম এবং যেভাবে সম্ভ্রান্ত লোকেরা পরিধান করে তার বিপরীত নিয়মে ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীমী।

---

১. আলোচ্য মাসআলার এ অংশটির ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। যেমন ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ও ফাতাওয়া শামীতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, ইমাম যদি নামায শুরু করার সময় সেই মহিলাটির ইমামতির নিয়্যত করে থাকে, তবে সেটাই কেবল ধর্তব্য হবে। নামাযের মাঝখানে নিয়্যত করলে তা ধর্তব্য হবে না। সুতরাং কোন মহিলা যদি নামাযের মাঝখানে এসে জামাআতে শরীক হয় এবং ইমাম সে মহিলার ইমামতির নিয়্যত করে নেয় তবু তার বরাবরে দাঁড়াবার কারণে একই তাহরীমার অন্তর্ভুক্ত পুরুষের নামায নষ্ট হবে না।

২. অর্থাৎ, ইমাম, খলীফা, মুক্তাদী সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

উদাহরণ ঃ কেউ চাদর পরল, কিন্তু চাদরের কেনারা কাঁধের উপর তুলে দিল না; অথবা জামা পরল, কিন্তু হাতায় হাত ঢুকাল না, তবে এতে নামায মাকরূহ হবে।

২. মাসআলা ঃ খোলা মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু যদি কেউ বিনয় ও তুচ্ছতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এরূপ করে, তবে তাতে কোন আপত্তি নেই।

৩. মাসআলা ঃ নামায পড়ার সময় কারও টুপি বা পাগড়ী যদি মাথা থেকে পড়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ (এক হাত দিয়ে) তা তুলে নিয়ে পরে নেওয়া উত্তম। কিন্তু পরতে যেয়ে আমলে কাছীরে (নামাযের পরিপন্থী কাজে) লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হলে তবে পরবে না।

৪. মাসআলা ঃ পুরুষদের দুই হাতের কনুই সিজদা করার সময় যমীনে বিছিয়ে দেওয়া মাকরূহ তাহরীমী।

৫. মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ মিহরাবের ভেতরে দাঁড়িয়ে ইমামের নামায পড়ানো মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু যদি মিহরাবের বাইরে দাঁড়ায় এবং সিজদা মিহরাবের ভেতরে করে তবে মাকরূহ হবে না।

৬. মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে এক হাত বা ততোধিক উঁচু জায়গায় কেবল ইমামের দাঁড়ানো মাকরূহ তানযীহী। ইমামের সাথে যদি কয়েকজন মুক্তাদীও থাকে তবে মাকরূহ হবে না। কিন্তু যদি কেবল একজন মুক্তাদী থাকে, তবে মাকরূহ হবে। কারও কারও মতে, এক হাতের চেয়ে কম উঁচু হলেও যদি সাধারণ দৃষ্টিতে উঁচু দেখা যায়, তবে তাও মাকরূহ হবে।

৭. মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে যদি সকল মুক্তাদী ইমাম থেকে পৃথক কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়ায়, তবে তা মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু কেন প্রয়োজন থেকে থাকলে সে কথা ভিন্ন। যেমন ঃ জামাআত যদি বড় হয় এবং জায়গার সংকুলান না হয়, তবে মাকরূহ হবে না। অথবা কিছু মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে থাকে, আর কিছু পৃথক উঁচু জায়গায় থাকে, তবে তাও জায়েয।

৮. মাসআলা ঃ ইমামের পূর্বে কোন কাজ (যেমন ঃ রুকূ-সিজদা ইত্যাদি) করা মুক্তাদীর জন্য মাকরূহ তাহরীমী।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম যখন দাঁড়িয়ে কেরাআত পড়ছে তখন মুক্তাদী কর্তৃক কোন দু'আ ইত্যাদি পড়া বা কুরআন পাকের কোন কেরাআত পড়া মাকরূহ তাহরীমী। চাই তা সূরা ফাতিহা হোক বা অন্য কোন সূরা হোক।

নামাযের মধ্যে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বর্ণনা

নামাযের মধ্যে যদি কারও হাদাছ হয়ে যায় এবং তা বড় হাদাছ হয় যার কারণে গোসল ফরয হয়ে থাকে, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তা ছোট হাদাছ হয় (যার কারণে ওযূ ফরয হয়ে থাকে) তবে তা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে হবে, নতুবা অনিচ্ছাকৃতভাবে। অর্থাৎ, তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বা তার কার্যকারণের মধ্যে মানুষের ইচ্ছা কাজ করে থাকবে অথবা থাকবে না। যদি তা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ঃ কেউ নামাযের মধ্যে খিলখিল করে হেসে উঠে অথবা নিজের শরীরে আঘাত করে রক্ত বের করে ফেলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পেটের বায়ু বের করে অথবা কেউ ছাদের উপর উঠছে, এমতাবস্থায় তার পায়ের সাথে লেগে কোন পাথরের টুকরা বা অন্য কিছু ছাদ থেকে পড়ে কোন নামাযরত ব্যক্তির মাথায় আঘাত হানে, যার ফলে রক্ত বের হয়ে পড়ে, তবে এ সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, উল্লিখিত সকল বিষয় মানুষের ইচ্ছায় প্রকাশ পায়। আর যদি তা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তবে তা দু'ধরনের হতে পারে। হয় তা এমন কোন বিষয় হতে পারে, যা কমই সংঘটিত হয়, যেমন ঃ উন্মাদ হয়ে যাওয়া, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া বা ইমাম মরে যাওয়া ইত্যাদি, অথবা এমন কোন বিষয় যা প্রায়শঃ সংঘটিত হয়, যেমন ঃ পেটের বায়ু, পেশাব, পায়খানা, মযী ইত্যাদি বের হওয়া। অতএব, এমন কোন বিষয় যদি হয় যা কমই সংঘটিত হয়, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তা এমন কোন বিষয় হয়, যা হারে কম সংঘটিত হয় না। তবে নামায নষ্ট হবে না; বরং এরূপ ব্যক্তি শরীয়তের পক্ষ থেকে এই ইখতিয়ার ও অনুমতি প্রাপ্ত যে, সে তার হাদাছ দূরীভূতকরার পর (তার নামাযের অবশিষ্টাংশ আদায় করে) সেই নামায পূর্ণ করতে পারে। এটাকে 'বেনা' বলা হয়। কিন্তু যদি সে নামায পুনরায় পড়ে নেয় অর্থাৎ, পুনরায় শুরু থেকে পড়ে তবে সেটাই উত্তম। আর যদি 'বেনা' করে তবে সে ক্ষেত্রে নামায নষ্ট না হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে ঃ

১. হাদাছের অবস্থায় কোন রুক্ন আদায় করবে না।

২. চলমান অবস্থায় কোন রুক্ন আদায় করবে না। যেমন ঃ ওযূ করতে যাওয়ার সময় বা ওযূ করে আসার সময় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে না, কেননা, কুরআন শরীফ পড়া নামাযের রুক্ন।

৩. নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করবে না এবং এমন কোন কাজও করবে না, যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

৪. হাদাছ সংঘটিত হওয়ার পর কোন ওযর ব্যতিরেকে এক রুক্ন আদায় করার সময় পরিমাণ বিলম্ব করবে না; বরং তৎক্ষণাৎ ওযূ করতে যাবে। তবে

কোন ওযরবশতঃ বিলম্ব হয়ে গেলে তাতে কোন আপত্তি নেই। যেমন ঃ নামাযের সারি যদি বেশি হয় এবং সে যদি প্রথম সারিতে থেকে থাকে, যার ফলে সারিগুলো ডিঙিয়ে আসা কঠিন হয়। ১.

১. **মাসআলা ঃ** একাকী নামাযরত ব্যক্তির যদি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ ওযূ করে নেওয়া এবং যত দ্রুত সম্ভব ওযূ সমাপ্ত করা উচিত। তবে ওযূ সকল সুন্নত ও মুসতাহাব সহকারে আদায় করা এবং এর মাঝে কোন রকম কথাবার্তা বলা না চাই। পানি যদি নিকটে থাকে তবে দূরে যাবে না। সারকথা এই যে, যতটুকু নড়াচড়া একান্ত জরুরী, তার চেয়ে বেশি করবে না, ওযূ করার পর ইচ্ছা করলে সেখানেই (অর্থাৎ, ওযূর জায়গার নিকটবর্তী কোন স্থানে) তার অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করতে পারে এবং এটাই উত্তম। আর ইচ্ছা করলে যেখানে প্রথমে ছিল সেখানে যেয়েও পড়তে পারে। তবে উত্তম হল এই যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে সালাম ফিরিয়ে প্রথম নামায শেষ করে ফেলবে এবং তারপর ওযূ করে নতুন করে নামায পড়বে।

২. **মাসআলা ঃ** ইমামের যদি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তা যদি শেষ বৈঠকেও হয়, তবে তার তৎক্ষণাৎ ওযূ করার জন্য চলে যাওয়া চাই। উত্তম হল এই যে, ইমাম মুক্তাদীদের মধ্যে যাকে ইমামতির জন্য উপযুক্ত মনে করে তাকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেবে। মুদরিককে (যে নামাযের শুরু থেকেই ইমামের সঙ্গে নামাযে শরীক রয়েছে) খলীফা নিযুক্ত করা উত্তম। মাসবূককে খলীফা নিযুক্ত করাও জায়েয। মাসবূককে খলীফা নিযুক্ত করলে তাকে ইঙ্গিতে বলে দেবে যে, আমার এত রাকআত নামায বাকি আছে। রাকআত বুঝাবার জন্য আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। যেমন ঃ এক রাকআত বাকি থাকলে এক আঙ্গুল তুলবে, আর দু'রাকআত থাকলে দুই আঙ্গুল তুলবে। রুকূ রয়ে গেলে হাঁটুতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেবে; সিজদা রয়ে গেলে কপালে হাত দেবে; কেরাআত রয়ে গেলে মুখে হাত দেবে, সিজদায়ে তিলাওয়াত রয়ে গেলে কপাল ও মুখে হাত দেবে, সিজদায়ে সাহ্ব করতে হলে বুকের উপর হাত দেবে; যদি সে এ সকল সংকেত বুঝে। নচেৎ তাকে খলীফা বানাবে না। অতঃপর যখন সে নিজে ওযূ শেষ করবে তখন জামাআত চলতে থাকলে জামাআতে এসে তারই নিযুক্ত করা খলীফার মুক্তাদী হয়ে যাবে। যদি ওযূ করে ওযূর জায়গার কাছেই দাঁড়িয়ে যায়, তবে যদি মাঝখানে এমন কোন জিনিস অন্তরাল থাকে বা কোন ব্যবধান থাকে, যার কারণে

---

১. অতএব এক্ষেত্রে কষ্ট করে সারিগুলো ডিঙিয়ে বের হতে যদি এক রুকূন পরিমাণ সময় বিলম্ব হয়ে যায় তবে তাতে কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া এরূপ ব্যক্তির জন্য যেমন সারি ডিঙিয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছা জায়েয, তেমনি ওযু ভঙ্গ হওয়া ব্যক্তি ইমাম হোক বা মুক্তাদী, তারও সারি ডিঙিয়ে বের হয়ে ওযূ করতে যাওয়া এবং প্রয়োজনে কেবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও জায়েয।

ইকতেদা শুদ্ধ হয় না তবে সেখানে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করা জায়েয হবে না। আর যদি এরূপ কোন ব্যবধান বা অন্তরাল না থাকে, তবে সেখানে থেকে ইকতেদা করা জায়েয হবে। ইত্যবসরে জামাআত যদি শেষ হয়ে যায় তবে সে নিজের নামায পূর্ণ করে নেবে। চাই যেখানে ওযূ করেছে সেখানে পড়ুক বা যেখানে প্রথমে ছিল সেখানে এসে পড়ুক।

৩. মাসআলা ঃ পানি যদি মসজিদের মেঝেতেই থাকে, তবে খলীফা নিযুক্ত করা জরুরী নয়। ইচ্ছা হয়, খলীফা নিযুক্ত করবে, না হয় করবে না; বরং সে নিজেই ওযূ করে এসে আবার ইমাম হয়ে যাবে। মুক্তাদীগণ (ইমাম ওযূ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত) এতটুকু সময় যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ইমামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।

৪. মাসআলা ঃ খলীফা নিযুক্ত করার পর ইমাম আর ইমাম থাকে না; বরং তার খলীফার মুক্তাদী হয়ে যায়। অতএব, যদি জামাআত হয়ে যায় তবে ইমাম তার নামায এভাবে পূর্ণ করবে, যেরূপ 'লাহেক' পূর্ণ করে থাকে। ইমাম যদি কাউকে খলীফা নিযুক্ত না করে; বরং মুক্তাদীরা নিজেদের থেকে কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে অথবা কোন মুক্তাদী নিজেই অগ্রসর হয়ে ইমামের স্থানে দাঁড়ায় এবং ইমামতি করার নিয়্যত করে তবে তাও জায়েয; যদি তখনও পর্যন্ত ইমাম মসজিদের বাইরে না যেয়ে থাকে অথবা নামায মসজিদে না হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে ইমাম যদি নামাযের সারির বাইরে বা সুত্‌রার বাইরে না যেয়ে থাকে। যদি নামাযের সারি বা সুত্‌রার সীমানা পার হয়ে যায়, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তখন অন্য কেউ ইমাম হতে পারবে না।[১]

৫. মাসআলা ঃ মুক্তাদীর যদি (নামাযের মধ্যে) ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় তবে তারও তৎক্ষণাৎ ওযূ করে নেওয়া উচিত। ওযূ করার পর জামাআত চলতে থাকলে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। জামাআত চলতে না থাকলে নিজে একাকী নামায পূর্ণ করে নেবে। জামাআত চলতে থাকলে মুক্তাদী তার পূর্বের জায়গায় গিয়ে নামায পড়বে। অবশ্য যদি ইমামের ও তার ওযূর জায়গার মাঝখানে ইকতেদা শুদ্ধ না হওয়ার মত কোন অন্তরাল না থাকে তবে ওযূর জায়গার নিকটবর্তী স্থানেও দাঁড়ানো জায়েয। আর জামাআত যদি সমাপ্ত হয়ে যায় তবে মুক্তাদীর ইচ্ছা, চাইলে পূর্বে যেখানে ইকতেদা করেছিল সেখানে গিয়ে নামায পূর্ণ করতে পারে অথবা ওযূর জায়গার নিকটবর্তী কোন স্থানেও পূর্ণ করতে পারে এবং এটাই উত্তম।

---

১. অর্থাৎ, সেই অসম্পূর্ণ জামাআতকে পূর্ণ করার জন্য পূর্ববর্তী ইমামের খলীফা স্বরূপ কেউ ইমাম হতে পারবে না। এমতাবস্থায় পুনরায় নতুন করে জামাআত করবে।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম যদি কোন মাসবূক মুক্তাদীকে তার স্থলে খলীফা নিযুক্ত করে, তবে সে প্রথমে ইমামের যে কয় রাকআত নামায রয়ে গেছে সেগুলো আদায় করবে (কিন্তু সালাম ফিরাবে না)। তারপর কোন মুদরিক মুক্তাদীকে সালাম ফিরানোর জন্য তদস্থলে খলীফা নিযুক্ত করবে (সেমতে সেই মুদরিক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।) এবং মাসবূক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করতে ব্যাপৃত হবে।

৭. মাসআলা ঃ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর যদি কারও উম্মাদনা দেখা দেয় বা বড় হাদাছ হয়ে যায় অথবা অনিছাকৃতভাবে ছোট হাদাছ হয় বা বেহুঁশ হয়ে যায়, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় সে নামায পড়তে হবে।

৮. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত মাসআলাগুলো যেহেতু সূক্ষ্ম এবং আজ-কাল ইলমের চর্চাও কম, তাই এ সকল মাসায়েল পালন করতে গেলে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই উত্তম হল, নামাযের মধ্যে ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে তার উপর 'বেনা' না করা; বরং এমতাবস্থায় (ডান দিকে) সালাম ফিরিয়ে নামায ছেড়ে দেবে এবং ওযূ করে নতুন করে নামায পড়বে।

সিজদায়ে সাহ্ব সংক্রান্ত মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যে সব নামাযে শব্দ না করে কেরাআত পড়া ওয়াজিব, (যেমন ঃ জোহর, আসর ও দিনের বেলার নফল ও সুন্নত) সে সব নামাযে যদি কেউ–ইমাম হোক বা একাকী নামাযরত ব্যক্তি–ভুলবশতঃ সশব্দে কেরাআত পড়ে অথবা যে সব নামাযে সশব্দে কেরাআত পড়া ওয়াজিব (যেমন ঃ ফজর, ইশা, মাগরিব) সে সব নামাযে যদি ইমাম শব্দ না করে কেরাআত পড়ে [১] তবে তার সিজদায়ে সাহ্ব করতে হবে।

অবশ্য যে সব নামাযে শব্দ না করে কেরাআত পড়া নিয়ম, তন্মধ্যে কোন নামাযে যদি এত সামান্য পরিমাণ কেরাআত সশব্দে পড়া হয়, যা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যেমন ঃ দু'তিনটি শব্দ মুখ থেকে সশব্দে বের হয়ে গেল, অথবা যে সব নামাযে ইমামের জন্য কেরাআত সশব্দে পড়া নিয়ম, তন্মধ্যে কোন নামাযে যদি এরূপ (দু'তিনটি শব্দ) শব্দ না করে পড়ে ফেলে, তবে সিজদা সাহ্ব আবশ্যক নয়। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

কাযা নামাযের মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যদি কতিপয় লোকের কোন ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে যায়, তবে তারা সেই কাযা নামায জামাআত সহকারে আদায় করবে। সশব্দে

---

১. এক্ষেত্রে একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তির উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব নয়।

কেরাআত পড়ার নামায হলে সশব্দে কেরাআত পড়বে, আর আস্তে কেরাআত পড়ার নামায হলে আস্তে কেরাআত পড়বে।

২. মাসআলা ঃ কোন নাবালেগ ছেলে যদি ইশা'র নামায পড়ে ঘুমায় এবং ফজরের সময় হওয়ার পর ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বীর্যের দাগ দেখতে পায়, যার ফলে বুঝা যায় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, তবে গ্রহণযোগ্য অভিমত মুতাবিক পুনরায় তার ইশা'র নামায পড়তে হবে।

আর যদি ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বীর্যের দাগ দেখতে পায়, তবে সর্বসম্মত অভিমত মুতাবিক ইশা'র নামাযের কাযা পড়তে হবে।

পীড়িত ব্যক্তি সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা

১. মাসআলা ঃ কোন ওযরগ্রস্ত ব্যক্তি যদি (নামাযের কিছু অংশের) রুকূ-সিজদা ইশারায় আদায় করে,তারপর নামাযের মধ্যেই রুকূ-সিজদা করার মত শক্তি পায়, তবে তার সেই আংশিক আদায়কৃত নামায নষ্ট হয়ে যাবে। নতুন করে নামায পড়া তার উপর ওয়াজিব। আর যদি ইশারা করে রুকূ-সিজদা করার পূর্বেই সুস্থ হয়ে যায়, তবে পূর্বের নামায শুদ্ধ। তার উপর 'বেনা' করা জায়েয।

২. মাসআলা ঃ কোন (মুক্তাদী) ব্যক্তি যদি কেরাআত দীর্ঘ হওয়ার কারণে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং এতে তার কষ্ট হয়, তবে তার জন্য কোন প্রাচীর, গাছ, বা খুঁটি ইত্যাদির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। তারাবীহ্র নামাযে দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের অনেক সময় এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

মুসাফিরের নামায সংক্রান্ত মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ পনের দিন অবস্থান করার নিয়্যত করে তবে দু'জায়গায়; এবং সে দু'টি জায়গার মাঝে এ পরিমাণ ব্যবধান যে, এক জায়গার আযান অন্য জায়গায় শোনা যায় না, যেমন ঃ কেউ দশ দিন মক্কা শরীফে ও পাঁচ দিন মিনায় থাকার ইচ্ছা করল,তবে এমতাবস্থায় সে মুসাফিরই গণ্য হবে (তাকে মুকীম বলা যাবে না)।

২. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত অবস্থায় যদি রাত্রে একই জায়গায় এবং দিনের বেলায় অপর জায়গায় অবস্থান করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেখানে রাত্রে অবস্থান করার ইচ্ছা করেছে সেটা তার জন্য 'আবাসস্থল' সাব্যস্ত হবে। (এবং সেখানে তাকে মুকীম গণ্য করা হবে।) সেখানে তার নামায কসর করার অনুমতি থাকবে না। আর যেখানে দিনের বেলায় থাকে সেটি যদি রাত্রি যাপন করার জায়গা থেকে মুসাফির হওয়ার মত দূরত্বে অবস্থিত হয়, তবে সেখানে গেলে মুসাফির হবে। আর যদি এতটুকু দূরত্বে অবস্থিত না হয় তবে মুকীম থাকবে।

৩. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত মাসআলায় একটি জায়গা যদি পার জায়গা থেকে এত নিকটে অবস্থিত হয় যে, এক জায়গার আযানের ধ্বনি অপর জায়গায় শোনা যেতে পারে তবে এরূপ দু'টি জায়গাকে একই জায়গা গণ্য করা হবে এরূপ দু'টি জায়গায় পনের দিন থাকার ইচ্ছা করলে মুকীম হয়ে যাবে।

৪. মাসআলা ঃ মুসাফিরের পেছনে মুকীমের ইকতেদা করা সর্বাবস্থায় জায়েয। চাই ওয়াক্তিয়া নামায হোক বা কাযা। মুসাফির ইমাম যখন দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে তখন মুকীম মুক্তাদী দাঁড়িয়ে তার অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে নেবে এবং অবশিষ্ট রাকআতগুলোতে সে কেরাআত পড়বে না; বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেননা, সে লাহেক। ইমামের উপর আরোপিত বিধান যেহেতু মুক্তাদীর উপর বর্তায় তাই এ ক্ষেত্রে সেই মুক্তাদীর জন্যও প্রথম বৈঠক ফরযরূপে বিবেচিত হবে।[১]

মুসাফির ইমামের জন্য মুসতাহাব, দুই দিকে সালাম ফিরাবার পর সাথে সাথেই মুক্তাদীদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, সে মুসাফির। আরও বেশি উত্তম, সে যে মুসাফির একথা নামায শুরু করার পর্বেও জানিয়ে দেওয়া।

৫. মাসআলা ঃ মুসাফিরও মুকীমের পেছনে ইকতেদা করতে পারে, তবে নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে করা চাই। নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে গেলে ফজর ও মাগরিবের নামাযে ইকতেদা করতে পারে। জোহর, আসর ও ইশা'র নামাযে পারবে না। কেননা, মুসাফির যখন (কাযা নামাযে) মুকীমের ইকতেদা করবে তখন ইমামের অনুসরণের কারণে মুক্তাদীও চার রাকআত পড়বে, অথচ ইমামের প্রথম বৈঠক ফরয নয়; কিন্তু মুক্তাদীর জন্য ফরয। অতএব, (এই প্রথম বৈঠকের ক্ষেত্রে) ফরয পালনকারীর ইকতেদা এমন ব্যক্তির পেছনে হল, যে ফরয পালনকারী নয়। সুতরাং এরূপ ইকতেদা জায়েয নয়।[২]

৬. মাসআলা ঃ কোন মুসাফির যদি নামাযরত অবস্থায় ইকামতের নিয়্যত করে, চাই নামাযের শুরুতে করুক অথবা মাঝে বা শেষে করুক, কিন্তু সিজদায়ে সাহ্ব বা সালামের পূর্বে করে নেয়, তবে সেই নামায তাকে পূর্ণ পড়তে হবে। সে নামায কসর করা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি সিজদায়ে সাহ্ব বা সালামের পর ইকামতের নিয়্যত করে, তবে সে নামায কসরই থাকবে (পুনরায় নামায পূর্ণ

১. অর্থাৎ, প্রথম বৈটক ওয়াজিব বটে, কিন্তু যেহেতু মুসাফির ইমামের জন্য সেটি শেষ বৈঠক হিসাবে ফরয, কাজেই ইমামের অনুসারী হিসাবে মুক্তাদীর জন্য ও তা ফরয রূপে বিবেচিত হবে।

২. আর নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে মুসাফির ব্যক্তি মুকিমের পেছনে ইকতেদা করলে সেটা নফল পালনকারীর পেছনে ফরয পালনকারীর ইকতেদা হয় না, কেননা ইকতেদা করার কারণে মুসাফিরের যিম্মায়ও চার রাকআত পড়া ফরয হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ইকতেদা করলেও মুসাফিরের উপর চার রাকআত ফরয হয় না।

করতে হবে না। আর যদি নামাযের মধ্যেই নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায়) যদি নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ইকামতের নিয়্যত করে কিংবা লাহেক অবস্থায় ইকামের নিয়্যত করে, তবে তার নিয়্যতের ক্রিয়া সেই নামাযে প্রকাশ পাবে না। সুতরাং সেই নামায যদি চার রাকআত বিশিষ্ট হয়, তবে এ ক্ষেত্রে সেই নামায কসর করা তার জন্য ওয়াজিব।

উদাহারণ ঃ ১. কোন মুসাফির ব্যক্তি জোহরের নামায শুরু করল, এক রাকআত পড়ার পর নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল। এরপর সে ইকামতের নিয়্যত করল। এমতাবস্থায় তার এ নিয়্যত সেই নামাযে ক্রিয়াশীল হবে না সুতরাং তাকে সেই নামায কসর পড়তে হবে।

উদাহারণ ঃ ২. কোন মুসাফির অপর এক মুসাফিরের মুক্তাদী হল এবং লাহেক হয়ে গেল। এরপর সে তার ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করতে লাগল, এমতাবস্থায় সে যদি ইকামতের নিয়্যত করে, তবে তার এ নিয়্যত সেই নামাযে ক্রিয়াশীল হবে না এবং সেই নামাযটি যদি চার রাকআত বিশিষ্ট হয়, তবে তাকে সেই নামায কসর পড়তে হবে।

ভয়কালীন নামায

যখন কোন শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়, শত্রু চাই মানুষ হোক কিংবা হিংস্র জন্তু বা অজগর ইত্যাদি, এমতাবস্থায় যদি সকল মুসলমান বা কিছু সংখ্যক লোকও একত্রে জামাআতে নামায পড়তে না পারে এবং সওয়ারী হতে নামারও অবকাশ না পায়, তবে সবাই সওয়ারীর উপর বসে বসে একা একা ইশারায় নামায পড়ে নেবে। তখন কেবলামুখী হওয়াও শর্ত নয়। অবশ্য যদি দুইজন একই সওয়ারীতে বসা থাকে, তবে তারা উভয়ে জামাআত করবে। আর যদি এতটুকুরও অবকাশ না হয়, তবে ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত হবে। তখন নামায পড়বে না। অবস্থা শান্ত হওয়ার পর কাযা পড়ে নেবে।

আর যদি এরূপ সম্ভব হয় যে, কিছু লোক মিলে জামাআতে নামায পড়তে পারে, যদিও সবাই মিলে পড়তে পারে না, তবে এমতাবস্থায় তাদের জামাআত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তখন এ নিয়মে নামায পড়বে ঃ অর্থাৎ উপস্থিত সকল মুসলমানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। একভাগ শত্রুর সামনে অবস্থান নেবে, আর অপর ভাগ ইমামের সাথে নামায শুরু করবে। যদি তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন ঃ জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা; আর তারা যদি মুসাফির না হয় এবং কসর না করে তবে ইমাম যখন দু'রাকআত নামায পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে তখন এভাগ চলে যাবে। আর যদি তারা কসর করে কিংবা দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন ঃ ফজর, জুমুআ, দুই ঈদের

নামায অথবা মুসাফিরের জোহর, আসর ও ইশা'র নামায, তবে এক রাকআতের পরেই এ ভাগ চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল সেখান থেকে এসে ইমামের সাথে অবশিষ্ট নামায পড়বে। ইমাম অপর দল আসার অপেক্ষা করবে। এরপর ইমাম অবশিষ্ট নামায শেষ করে সালাম ফিরাবে। আর এরা সালাম না ফিরিয়ে শত্রু সম্মুখে চলে যাবে এবং প্রথম দল এখানে এসে অবশিষ্ট নামায কেরাআত ব্যতিরেকে শেষ করে সালাম ফিরাবে। কেননা, তারা লাহেক। তারপর এরা শত্রু-সম্মুখে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল এখানে এসে তাদের নামায কেরাআত সহকারে সমাপ্ত করে সালাম ফিরাবে। কেননা, তারা মাসবূক।

১. মাসআলা ঃ নামাযরত অবস্থায় শত্রু-সম্মুখে যাওয়ার সময় বা সেখান থেকে নামায পড়ার জন্য আসার সময় পায়ে হেঁটে যাতায়াত করবে। অন্যথায় কেউ যদি সওয়ারীতে চড়ে যাতায়াত করে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, এটা আমলে কাছীর অর্থাৎ, নামাযের পরিপন্থী কাজ।

২. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় দল কর্তৃক ইমামের সাথে অবশিষ্ট নামায পড়ে চলে যাওয়া এবং প্রথম দল আবার এখানে এসে তাদের নামায পূর্ণ করা, তারপর দ্বিতীয় দল এখানে এসে তাদের নামায শেষ করা মুসতাহার ও উত্তম। নতুবা এও জায়েয আছে যে, প্রথম দল নামায পড়ে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে অবশিষ্ট নামায পড়ার পর নিজেদের সম্পূর্ণ নামায শেষ করে তারপর শত্রুর সম্মুখে যাবে। এরা যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন প্রথম দল তাদের নামায সেখানেই পড়ে নেবে, এখানে আসবে না।

৩. মাসআলা ঃ নামায পড়ার এই নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন সবাই একই ইমামের পেছনে নামায পড়তে চায় যেমন ঃ দলে কোন বুযুর্গ ব্যক্তি আছেন, সবাই তাঁর পেছনে নামায পড়তে চায়। নতুবা এ পন্থাই উত্তম যে, একদল এক ইমামের পেছনে তাদের সম্পূর্ণ নামায শেষ করে শত্রু-সম্মুখে যাবে। এরপর দ্বিতীয় দল অপর এক ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে তাদের সম্পূর্ণ নামায তারা পড়ে নেবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি এ আশঙ্কা হয় যে, শত্রু সন্নিকটে রয়েছে এবং দ্রুত এখানে পৌঁছে যাবে। আর এ ধারণাবশতঃ তারা প্রথম নিয়ম অনুযায়ী নামায পড়ে নেয়। তারপর দেখো গেল যে, সে ধারণা ভুল ছিল, তবে এমতাবস্থায় ইমামের নামায শুদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু মুক্তাদীদের সে নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। কেননা, অত্যন্ত তীব্র সঙ্কটময় মুহূর্তের জন্য সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আমলে কাছীর (নামাযের পরিপন্থী কাজ) সহকারে এ নামায শরীয়তে বিধিত হয়েছে। তীব্র প্রয়োজন ব্যতিরেকে এ পরিমাণ আমলে কাছীর নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন নাজায়েয লড়াই হয় তখন এ নিয়মে নামায পড়ার অনুমতি নেই, যেমনঃ বিদ্রোহীরা মুসলিম শাসনকর্তার উপর আক্রমণ করল, অথবা কোন অবৈধ পার্থিব উদ্দেশ্যে কেউ কারও বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হল, তবে এরূপ লোকদের জন্য এ পরিমাণ আমলে কাছীর মাফ হবে না।

৬. মাসআলা ঃ শত্রুর কারণে কেবলার দিক ছেড়ে অন্য কোন দিকে ফিরে নামায শুরু করল, ইত্যবসরে শত্রু যদি পালিয়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাদের কেবলার দিকে ফিরে যাওয়া চাই, নতুবা তাদের নামায শুদ্ধ হবে না।

৭. মাসআলা ঃ নির্বিঘ্নে কেবলার দিকে ফিরে নামায পড়ছে, এমতাবস্থায় শত্রু এসে গেল তখন তৎক্ষণাৎ তাদের শত্রুর দিকে ফিরে যাওয়া জায়েয। তখন নামাযের জন্য কেবলার দিকে ফেরা শর্ত থাকবে না।

৮. মাসআলা ঃ যদি এরূপ হয় যে, (নৌকা বা জাহাজ ডুবে যাওয়ার কারণে) কেই নদীতে সাঁতরাচ্ছে, আর নামাযের সময় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে তখন সম্ভব হলে (বয়া, কাঠ বা অন্য কিছুর সাহায্য নিয়ে) কিছুক্ষণ হাত-পা নাড়ানো বন্ধ রাখবে এবং এ সময় ইশারায় নামায পড়ে নেবে।

এ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া, উপরিউক্ত বিষয়াদির আলোচনা থেকে অবসর হয়ে "জুমুআর বর্ণনা" লিখতে শুরু করছি। কেননা, জুমুআর নামায ইসলামের অতি বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এ কারণে ঈদের নামাযের আলোচনার পূর্বে জুমুআর নামাযের বর্ণনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

জুমুআর নামাযের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার নিকট নামাযের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন জিনিস নেই। এ কারণে নিষ্কলুষ শরীয়তে অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে এরূপ কঠোর তাকীদ ও ফযীলত বর্ণিত হয় নি। এ কারণেই সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার যে অসংখ্য নেয়ামত বান্দার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত; বরং জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত বান্দার উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হয়ে থাকে তার শুকরিয়া আদায়ের জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

জুমুআর দিনে যেহেতু সব চেয়ে বেশি নেয়ামত মানুষকে দেওয়া হয়েছে, এমন কি, মানব জাতির প্রথম পুরুষ হযরত আদম (আ.)-কেও এ দিনেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এই দিনে একটি বিশেষ নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

জামাআতে নামায পড়ার হিকমত ও উপকারিতা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে এও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জামাআত যত বড় হয় ততই তার উপকারিতা অধিক প্রকাশ পায়। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন বিভিন্ন মহল্লার লোক ও মসজিদ মহল্লার অধিক সংখ্যক অধিবাসী এক জায়গায় একত্র হয়ে নামায পড়ে। বলাবাহুল্য যে, দৈনিক পাঁচবার এভাবে সবার একত্র হওয়ার বিধান দেওয়া হলে তা অত্যন্ত কষ্টকর হত। এ সকল কারণে শরীয়তে সপ্তাহে একদিন এভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, এ দিন বিভিন্ন মহল্লা ও মসজিদ মহল্লার লোকজন সকলে একত্র হয়ে এ ইবাদত পালন করবে। জুমুআর দিন যেহেতু সকল দিনের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, তাই এই বিশেষ ইবাদতের জন্য সে দিনটিই ধার্য করা হয়। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও আল্লাহ তা'আলা এ ইবাদতের বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এনিয়ে মতভেদ করেছিল। ফলে তারা এ মহান সৌভাগ্য তেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং এ ফযীলতও এ উম্মতের ভাগ্যে জুটে। ইহুদীরা এজন্য শনিবার ধার্য করেছে। কারণ, এ দিন আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেছিলেন। আর খৃষ্টানগণ রবিবার ধার্য করে। কেননা রবিবারে সৃষ্টিকার্য শুরু হয়েছিল। সুতরাং আজও পর্যন্ত এ দুই সম্প্রদায় এ দু'টি দিনে ইবাদতের প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ইবাদতে ব্যাপৃত থাকে। খৃষ্টানদের আধিপত্যপূর্ণ দেশসমূহে এ কারণে রবিবারে সকল অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায়।

জুমুআর দিনের ফযীলত

১. নবী (সা.) বলেন, সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এ দিনেই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। যার ফলে এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। এটা অনেক বড় নেয়ামত। কিয়ামতও এ দিনেই সংঘটিত হবে। (মুসলিম শরীফ)

২. ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর রাত্রের মর্যাদা শবে কদরের চেয়েও বেশি। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ এই যে, এ রাত্রে সরওয়ারে আলম (সা.) তাঁর মাতৃগর্ভে শুভাগমন করেছিলেন। হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত ও অশেষ মঙ্গল নিহিত। (আশি'আতুল লুম'আত শরহে মিশকাত ফারসী)

৩. নবী (সা.) বলেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, তখন কোন মুসলমান যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা কবুল করেন। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের ভাষ্যকার আলিমগণ হাদীসে উল্লিখিত মুহূর্তটি নির্দিষ্ট করতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী শরহে সিফরুস সাআদাত গ্রন্থে ৪০টি অভিমত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দু'টি অভিমতকে তিনি প্রধান্য দিয়েছেন। একটি এই যে, সে সময়টি খুতবা পড়ার সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়টি এই যে, সে সময়টি দিনের শেষ ভাগে রয়েছে। এই দ্বিতীয় অভিমতটি আলিমদের একটি বড় দল গ্রহণ করেছেন। অনেক সহীহ হাদীসও এর সমর্থনে রয়েছে। শায়খ দেহলবী (রহ.) বলেন, এ রেওয়ায়াতটি সহীহ যে, হযরত ফাতিমা (রা.) জুমুআর দিন তাঁর কোন খাদিমাকে জুমুআর দিন শেষ হওয়ার সময় তাকে অবহিত করতে বলে দিতেন, যাতে তিনি যিক্‌র ও দু'আয় মশগুল হতে পারেন। (আশি'আতুল লুম'আত)

৪. নরী (সা.) বলেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোৎকৃষ্ট। এ দিন (কিয়ামতের জন্য) শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এ দিন তোমরা আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়বে। কেননা, সে দিন[১] আমার সামনে তা পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আপনার সামনে তা কিভাবে পেশ করা হবে অথচ মৃত্যুর পরতো আপনার হাঁড়ও থাকবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা পরকালের জন্য নবীদের শরীর হজম করা যমীনের উপর হারাম করে দিয়েছেন।[২] (আবূ দাঊদ শরীফ)

৫. নবী (সা.) বলেন, (পবিত্র কুরআনে) 'শাহেদ' শব্দ দ্বারা জুমুআর দিন উদ্দেশ্য। জুমুআর দিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন দিন নেই। এদিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, তখন মু'মিন বান্দা যে দু'আই করে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন এবং যে বিষয় থেকেই পানাহ চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে পানাহ দেন। (তিরমিযী শরীফ)

'শাহেদ' শব্দটি সূরা বুরূজে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এদিনের কসম করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ

"কসম গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আসমানের, কসম প্রতিশ্রুত দিবসের (অর্থাৎ, কিয়ামতের) এবং শাহেদ (জুমুআর দিন) ও মাশহুদ (আরাফার দিন)-এর।

---

১. বিশেষভাবে সেই দিনটির কথা হাদীসে বলা হয় নি।

২. অর্থাৎ, মাটি আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীরে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। যেমন তারা দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় ছিলেন, তেমনি কবরেও তাদের শরীর তেমনি থাকে।

৬. নবী (সা.) বলেন, জুমুআর দিন সকল দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার চেয়ে জুমুআর দিনের মর্যাদা বেশি। (ইবনে মাজাহ)

৭. নবী (সা.) বলেন, যে মুসলমান জুমুআর দিন বা জুমুআর রাত্রে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবর আযাব থেকে হেফাজত করেন। (তিরমিযী শরীফ)

৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একদিন

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করলাম) তখন তার নিকট একজন ইহুদী বসা ছিল। সে বলল, যদি এরূপ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত তবে আমরা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদের দিনের মত উদযাপন করতাম। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতটি দু'টি ঈদের দিন অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, সেদিন জুমুআর দিন ছিল এবং আরাফাতের দিনও ছিল। সুতরাং আমাদের ঈদ বানাবার প্রয়োজন নেই, সেদিন তো এমনিতেই দু'টি ঈদের দিন ছিল।

৯. নবী (সা.) বলতেন, জুমু'আর রাত আলোকোজ্জ্বল রাত এবং জুমুআর দিন আলোকোজ্জ্বল দিন। (মিশকাত শরীফ)

১০. কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতের উপযোগীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামের উপযোগীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন এবং এ দিন সেখানেও থাকবে; যদিও সেখানে দিন রাত থাকবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিন, রাতের পরিমাণ এবং ঘন্টার হিসাব শিক্ষা দিবেন। অতএব, যখন জুমু'আর দিন আসবে এবং সে সময় আসবে, যখন মুসলমানরা দুনিয়াতে জুমু'আর নামাযের জন্য বের হত তখন জান্নাতের একজন ফেরেশতা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা অতিরিক্ত পুরস্কারের ময়দানে চল। সে ময়দান এত বিশাল হবে যার দৈর্ঘ-প্রস্থ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। সেখানে আসমানের সমান উঁচু মেশকের বড় বড় স্তূপ থাকবে। নবীগণকে নূরের মিম্বরের উপর এবং মু'মিনদেরকে ইয়াকূতের কুরসীতে বসতে দেওয়া হবে। অতঃপর যখন সবাই নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত করবেন এবং সে

বাতাসে সেখানকার স্তুপীকৃত মেশক উড়বে। বাতাস সে মেশককে তাদের কাপড়ে, মুখে ও চুলে লাগিয়ে দেবে। সে বাতাস মেশ্‌ক লাগানোর নিয়ম এরূপ নারী থেকে অধিক জানে, যাকে সমগ্র বিশ্বের খুশবু দেওয়া হয় (এবং সে তার ব্যবহার জানে)। তখন আল্লাহ তা'আলা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন যে, আমার আরশ এসব লোকের মাঝখানে নিয়ে রাখ। তারপর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দুনিয়াতে আমাকে না দেখে আমার প্রতি ঈমান এনেছিলে, আমার রাসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করেছিলে এবং আমার হুকুম মেনে ছিলে। আজ তোমরা আমার নিকট কিছু চাও! আজ অতিরিক্ত পুরস্কার দানের দিন। তখন সবাই সমস্বরে বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! আমি যদি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হতাম তবে তোমাদেরকে আমার জান্নাতে স্থান দিতাম না। আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দানের দিন, সুতরাং তোমরা আরও কিছু চাও। তখন সবাই একবাক্যে বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে আপনার সৌন্দর্য দেখিয়ে দিন, যাতে আমরা স্বচক্ষে আপনার পবিত্র সত্তা অবলোকন করতে পারি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পর্দা উম্মোচন করে দেবেন এবং তাদের সামনে আত্ম প্রকাশ করবেন, আর তাদেরকে তাঁর জগৎ ভাসানিয়া আলোর ফোয়ারায় পরিবেষ্টন করে নেবেন। জান্নাতবাসীগণ কখনও বিদগ্ধ হবে না-এই নির্দেশ যদি তাদের সম্পর্কে পূর্ব থেকে না থাকত তবে তারা এ নূর কিছুতেই সহ্য করতে পারত না; বরং ভস্মীভূত হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে বলবেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে চলে যাও। তাদের দৈহিক সৌন্দর্য সেই নূরে রব্বানীর কারণে দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট যাবে, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে দেখতে পাবে না এবং তারাও তাদের স্ত্রীদেরকে দেখতে পাবে না। কিছুক্ষণ পর যখন সেই পরিবেষ্টনকারী নূর সরে যাবে তখন তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। তাদের স্ত্রীরা বলবে, যাওয়ার সময় তোমাদের যে আকৃতি ছিল, তা এখন আর নেই। অর্থাৎ, তার চেয়ে হাজারো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা উত্তরে বলবে, হাঁ, এটা একারণে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র সত্তাকে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন এবং আমরা স্বচক্ষে সেই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছি। (শরহে সিফরুস সাআদাত) দেখুন তারা জুমুআর দিন কত বড় নেয়ামত লাভ করল।

১১. প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় জাহান্নামের আগুনের তেজ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, কিন্তু জুমুআর দিন জুমু'আর বরকতে তার তেজ বৃদ্ধি করা হয় না।

(ইহয়াউল উলূম)

১২. নবী (সা.) এক জুমুআর দিন বললেন, হে মুসলমানগণ! এদিনকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ঈদের দিন স্বরূপ ধার্য করেছেন। সুতরাং এ দিন তোমরা গোসল করবে, যার কাছে সুগন্ধি থাকে সে সুগন্ধি লাগাবে এবং এদিন অবশ্যই মিসওয়াক করবে। (ইবনে মাজাহ)

জুমুআর দিনের আদব

১. প্রত্যেক মুসলমানেরই বৃহস্পতিবার দিন (শেষ বেলা) থেকেই জুমুআর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার আসরের পর দরূদ, ইসতিগফার ও তাসবীহ-তাহলীল বেশি করে পড়বে। পরিধানের কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখবে। ঘরে সুগন্ধি না থাকলে, যদি সম্ভব হয় সে দিনই আনিয়ে রাখবে, যাতে জুমুআর দিন এসব কাজে ব্যাপৃত হতে না হয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদীন বলেছেন যে, জুমুআর ফায়েদা সবচেয়ে বেশি সে ব্যক্তি পায়, যে জুমুআর প্রতীক্ষায় থাকে এবং বৃহস্পতিবার হতে জুমুআর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর সবচেয়ে বেশি হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে এটাও জানে না যে, জুমুআ কবে? এমন কি, জুমুআর দিন সকাল বেলায় লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে যে, আজ কি বার ? কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি জুমুআর প্রাতি বেশি যত্নশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে (বৃহস্পতিবার দিন গত) জুমুআর রাত্রে জামে মসজিদেই গিয়ে থাকতেন। (ইহয়াউল উলূম, ১খ, পৃ. ১৬১)

২. জুমুআর দিন গোসল করবে; মাথার চুল ও শরীর ভালভাবে পরিষ্কার করবে। এদিন মিসওয়াক করাও অধিক ফযীলতের কাজ। (প্রাগুক্ত)

৩. জুমুআর দিন গোসল করে যার কাছে যেরূপ উত্তম পোষাক আছে, তা পরিধান করবে। সম্ভব হলে সুগন্ধি লাগাবে এবং নখ ইত্যাদি কেটে নেবে। (প্রাগুক্ত)

৪. জামে মসজিদে খুব সকালে যাবে। যে যত সকালে যাবে সে তত অধিক ছওয়াব যাবে। নবী (সা.) বলেন, জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ জামে মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকে এবং যে প্রথমে আসে তাকে প্রথমে, যে তারপর আসে তাকে দ্বিতীয় নম্বরে, এভাবে ক্রমানুসারে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে নেয়। যে প্রথমে আসে সে আল্লাহর রাস্তায় একটি উট কুরবানী করার সমান ছওয়াব পায়; যে তারপর আসে সে একটি গরু কুরবানী করার সমান ছওয়াব পায়। (যে তৃতীয় নম্বরে আসে সে একটি বকরী কুরবানী করার সমান ছওয়াব পায়।) তারপর যে আসে সে আল্লাহর রাস্তায় একটি মোরগ যবাহ করার সমতুল্য ছওয়াব পায়। অতঃপর যে আসে সে আল্লাহর রাস্তায় একটি ডিম দান করার সমতুল্য ছওয়াব পায়। তারপর যখন খুতবা শুরু হয় তখন ফেরেশতাগণ সে খাতা বন্ধ করে দেন এবং খুতবা শুনায় ব্যাপৃত হন। (বুখারী ও মুসলিম)

পূর্ববর্তী যুগে জুমুআর দিন ভোর বেলায় ফজরের পর থেকেই শহরের রাস্তা ও অলিগলি লোকজনে পরিপূর্ণ দেখা যেত। সবাই এত ভোরে জামে মসজিদে যেত। মানুষের ভিড়াভিড়ি হত প্রচণ্ড, যেমন ঈদের দিন হয়ে থাকে। এরপর যখন এ রীতি মুসলমানদের থেকে ক্রমশ লোপ পেতে থাকল তখন লোকেরা বলল যে, ইসলামের মধ্যে এই প্রথম বিদআত জারি হল।[১]

এ পর্যন্ত লিখে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, মুসলমানরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের দেখে কেন লজ্জিত হয় না? তারা তাদের ইবাদতের দিন অর্থাৎ, ইহুদীরা শনিবারে ও খৃষ্টানরা রোববারে তাদের উপাসনালয় ও গির্জাগৃহে কত ভোর বেলায় যেয়ে থাকে এবং ব্যবসায়ীরা কত ভোর বেলায় বেচা-কেনার জন্য বাজারে যেয়ে উপস্থিত হয়। অতএব, দীনের অনুসারীরা কেন দীনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে না। (ইহয়াউল উলূম)

আসলে মুসলমানরা এ যুগে এই বরকতময় দিবসের মর্যাদা একেবারে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের এতটুকু খবরও থাকে না যে, আজ কোন দিন এবং তার কি-বা মর্যাদা? আক্ষেপের বিষয় যে, যে দিনটি এককালে মুসলমানদের নিকট ঈদের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান ছিল, যে দিনটির জন্য রাসূল (সা.)-এর গর্ববোধ ছিল এবং যে দিনটি পূর্ববর্তী উম্মতের ভাগ্যে জুটে নি, আজ মুসলমানদের হাতে সেই দিনটির এত অবমাননা ও অবহেলা হচ্ছে। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে এভাবে নষ্ট করা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক, যার অশুভ ফলাফল আমরা নিজেদের চোখেই দেখছি। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৫. জুমুআর নামাযে পায়ে হেঁটে গেলে প্রত্যেক কদমে এক বছর রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়। (তিরমিযী শরীফ)

৬. নবী (সা.) জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ লাম-মীম সাজদা ও সূরা দাহ্‌র (হাল আতা আলাল ইনসান) এ সূরা দু'টি পাঠ করতেন। এ জন্য এ সূরা দু'টি জুমুআর দিন ফজরের নামাযে মুসতাহাব মনে করে কখনও কখনও পড়বে। আবার কোন কোন সময় বাদও দেবে যাতে লোকেরা এটাকে ওয়াজিব মনে না করে।

৭. জুমুআর নামাযে নবী (সা.) সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকূন অথবা সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন।

---

১. অর্থাৎ, ভোর বেলায় মসজিদে গমন না করা। এখানে 'বিদআত' দ্বারা বিদআতের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। তার মানে নতুন বিষয়। এখানে বিদআত দ্বারা শরঈ বিদআত উদ্দেশ্য নয়। শরঈ বিদআত হল, ইবাদত মনে করে দীনের মধ্যে নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করা। এরূপ করা হারাম। জুমুআর দিন ভোর বেলায় মসজিদে না যাওয়া হারাম নয়।

৮. জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে বা পরে সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহ্ফ পড়ে কিয়ামতের দিন আরশের নিচ থেকে আসমানের সমান উঁচু এক প্রকার নূর প্রকাশ পাবে। কিয়ামতের অন্ধকারে সে নূর তার কাজে আসবে এবং সে জুমুআ থেকে বিগত জুমুআ পর্যন্ত তার যত গুনাহ হয়েছে সবই মাফ হয়ে যাবে। (শরহে সিফরুস সাআদাত)

আলিমগণ লিখেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে গুনাহ দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কেননা, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তিনিই সকল দয়ালুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।)

৯. জুমুআর দিন দরূদ শরীফ পড়লেও অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। এজন্যই হাদীস শরীফে জুমুআর দিন বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

জুমুআর নামাযের ফযীলত ও তাকীদ

জুমুআর নামায ফরযে আইন। কুরআন মজীদ, মুতাওয়াতির হাদীস ও আইম্মায়ে উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এটা ইসলামের এক মহান প্রতীকী ইবাদত। জুমুআর নামায অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির এবং ওযর ব্যতীত তরককারী ব্যক্তি ফাসিক।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মুমিগণ! যখন জুমুআর দিন (জুমুআর) নামাযের আযান হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা জান।[১] (সূরা জুমুআ ঃ ৯)

এ আয়াতে 'আল্লাহর যিক্‌র" দ্বারা জুমুআর নামায ও জুমুআর খুতবা উদ্দেশ্য। আর "ধাবিত হওয়া" মানে কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে বেশ গুরুত্ব সহকারে মসজিদে যাওয়া।

২. নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, তারপর চুলে তেল লাগায় এবং খুশবু ব্যবহার করে জুমুআর নামাযের জন্য মসজিদে যায় এবং মসজিদে গিয়ে কাউকে তার জায়গা থেকে তুলে না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে এবং যে পরিমাণ

---

১. এটা একটি উৎসাহ প্রদায়ক বাক্য। অর্থাৎ, তোমরা মুসলমান, তোমরা তো এ ব্যাপারে অবগত আছ। অবগতদের তো এর ব্যতিক্রম করা উচিত নয়।

নফল নামায পড়ার তার সৌভাগ্য হয়, পড়ে। এরপর ইমাম যখন খুতবা দেন[১] তখন চুপ করে খুতবা শোনে তবে তার বিগত জুমুআ থেকে এ জুমুআ পর্যন্ত যত (সগীরা) গুনাহ্ হয়েছে সব মাফ হয়ে যায়। (বুখারী শরীফ)

৩. নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে এবং ভোরে ভোরে পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, গাড়ি-ঘোড়া ব্যবহার না করে। এরপর খুতবা শোনে এবং এর মাঝে কোন অনর্থক কাজ না করে তবে সে তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে পূর্ণ এক বছরের ইবাদতের অর্থাৎ, এক বছরের রোযা ও নামাযের ছওয়াব পাবে। (তিরমিযী শরীফ)

৪. ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ যেন জুমুআর নামায তরক করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। ফলে সে ভীষণ গাফিলতিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।[২] (সহীহ্ মুসলিম)

৫. নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জুমুআ অলসতাবশতঃ অর্থাৎ, কোন ওযর ব্যতিরেকে তরক করে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। (তিরমিযী শরীফ)

৬. তারেক ইবনে শিহাব (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, ক্রীতদাস অর্থাৎ, যে শরীয়তের নিয়ম মুতাবিক কারও মালিকানাধীন থাকে এবং মহিলা, নাবালেগ ছেলে ও অসুস্থ ব্যক্তি এ চার প্রকার লোক ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমুআর নামায জামাআত সহকারে পড়া ফরয এবং আল্লাহর হক। (আবূ দাঊদ শরীফ)

৭. ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) জুমুআর নামায তরককারীদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার দৃঢ় ইচ্ছা হল[৩] যে, কাউকে আমার স্থলে ইমাম নিযুক্ত করি, আর আমি গিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেই, যারা জুমুআর নামাযে হাজির হয় না। (সহীহ্ মুসলিম)

এ বিষয়ের হাদীস জামাআত তরক করার ব্যাপারেও বর্ণিত হয়েছে। যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন মিম্বরের উপর এসে বসবে তখন থেকেই নামায পড়াও কথা বলা না জায়েয। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত।

২. আল্লাহ্ না করুন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যার উপর গাফিলতি চেপে বসে, তার পক্ষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

৩. দৃঢ় ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনা করে তিনি তা বাস্তবায়ন করেন নি।

৮. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ওযর ব্যতিরেকে জুমুআর নামায তরক করে তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়, যা পরিবর্তন ও পরিমার্জন থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।[১]

(মিশকাত শরীফ)

অর্থাৎ, তার উপর নেফাকের অভিযোগ সর্বদা থাকবে। অবশ্য যদি সে তওবা করে অথবা সর্বোত্তম দয়ালু আল্লাহ কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন তবে সেটা ভিন্ন কথা।

৯. জাবির (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উপর জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়া ফরয; কেবল অসুস্থ, মুসাফির, মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং ক্রীত দাস ব্যতীত। অতএব, কেউ যদি কোন অযথা কাজে বা ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেন।[২] আর তিনি তো অনপেক্ষ ও প্রশংসিত। (মিশকাত শরীফ)

অর্থাৎ, তিনি কারও ইবাদতের পরওয়া করেন না এবং এতে তার কোন ফায়েদাও নেই, তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। কেউ তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করুক বা না করুক।

১০. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পরপর কয়েক জুমুআ তরক করল সে যেন ইসলামকে তার পশ্চাতে নিক্ষেপ করল।

(আশি'আতুল লুম'আত)

১১. জনৈক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল যে, এক ব্যক্তি মারা গেছে, সে জুমুআ ও জামাআতে শরীক হত না। তার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? তিনি উত্তরে বলেন, সে জাহান্নামে যাবে।[৩] এরপর প্রশ্নকারী লোকটি তাকে এক মাস যাবৎ রোজ এ প্রশ্ন করতে থাকে এবং তিনিও এ জওয়াবই দিতে থাকেন। (ইহয়াউল উলূম)

উপরিউক্ত হাদীসমূহের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালেও সহজেই এ কথা বুঝে আসে যে, শরীয়তে জুমুআর নামাযের প্রতি কঠোর তাকিদ রয়েছে। জুমুআর নামায তরককারীদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এখনও কি কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করে এ ফরয তরক করার মত দুঃসাহস করতে পারে ?

---

১. তার মানে এ নয় যে, সে প্রকৃত অর্থে মুনাফিক অর্থাৎ, কাফির হয়ে যাবে; বরং এর মানে এটা মুনাফিকসুলভ কাজ এবং এরূপ করা গুনাহ।

২. অর্থাৎ, তার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দেন না। তিনি তো বেপরওয়া আছেনই, উপরন্তু তিনি কারও থেকে উপকৃত হন না এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। যে ভাল কাজ করে সে নিজের কল্যাণেই করে। সুতরাং বান্দা যখন নিজের কর্মদোষে জাহান্নামে যাওয়ার ব্যবস্থা করল তখন আল্লাহ তা'আলারও তাতে কোন পরওয়া নেই।

৩. এরই কাছাকাছি একটি রেওয়ায়াত ব্যাখ্যা সহকারে জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

জুমুআর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

১. মুকীম হওয়া। অতএব, মুসাফিরের উপর জুমুআ ফরয নয়।

২. সুস্থ হওয়া। অতএব, যে রোগী জামে মসজিদ পর্যন্ত নিজে নিজে পায়ে হেঁটে যেতে অক্ষম তার উপর জুমুআ ফরয নয়। বার্ধক্যের কারণে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ দুর্বল হয়ে যায় যে, মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না অথবা যদি অন্ধ হয়, তবে এরূপ লোক অসুস্থ বলে গণ্য এবং তাদের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

৩. স্বাধীন হওয়া। ক্রীতদাসের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

৪. পুরুষ হওয়া। মহিলার উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

৫. জামাআত তরক করার জন্য যে সব ওযরের বর্ণনা ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে সে সব ওযর না থাকা। যদি সে সব ওযরের মধ্য থেকে কোন ওযর পাওয়া যায়, তবে জুমুআর নামায ফরয হবে না। যেমন ঃ (ক) মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, (খ) কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকা, (গ) মসজিদে যাওয়ার পথে কোন শত্রুর ভয় থাকা।

৬. অন্যান্য ফরয নামায ফরয হওয়ার যে সকল শর্ত আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি সেগুলোও এখানে ধর্তব্য। অর্থাৎ, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া, মুসলমান হওয়া।

এখানে যে সব শর্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো ছিল জুমুআর নামায ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত শর্তাবলী না পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও জুমুআর নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে অর্থাৎ, জোহরের ফরয তার যিম্মা থেকে বাদ যাবে। যেমন ঃ কোন মুসাফির বা কোন মহিলা জুমুআর নামায পড়ল।[১]

জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১. শহর হওয়া। অর্থাৎ, বড় শহর বা মফস্বল শহর হওয়া।

অতএব, অজ পাড়া গাঁ বা বিলের মধ্যে জুমুআর নামায পড়া শুদ্ধ নয়। অবশ্য যে গ্রামের (লোকজনের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও) বসবাস প্রায় মফস্বল শহরের মত, যেমন ঃ তিন-চার হাজার লোক বাস করে।[২] তবে সেখানে জুমুআর নামায পড়া শুদ্ধ।

---

১. যদিও জামাআতে মহিলাদের শরীক না হওয়া চাই।

২. লোক সংখ্যার উল্লিখিত পরিমাণ উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হল মফস্বল শহরের মত সুযোগ সুবিধা থাকা।

২. জোহরের ওয়াক্ত হওয়া। অতএব, জোহরের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে জুমুআর নামায পড়া শুদ্ধ নয়। এমন কি, জুমুআর নামায পড়া অবস্থায় যদি জোহরের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায় তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে; যদিও শেষ বৈঠক তাশাহহুদ পরিমাণ হয়ে যেয়ে থাকে। আর এ কারণেই জুমুআর নামাযের কাযা পড়া হয় না।[১]

৩. খুতবা দান। অর্থাৎ, মুসল্লীদের সামনে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করা, চাই কেবল সুবহানাল্লাহ বলে হোক বা আলহামদুল্লিাহ বলে হোক; যদিও কেবল এতটুকু বলে খুতবা শেষ করা সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মাকরূহ বটে।

৪. নামাযের পূর্বে খুতবা দান। যদি নামাযের পর খুতবা দেওয়া হয় তবে নামায শুদ্ধ হবে না।

৫. খুতবা জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া। অতএব জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে খুতবা দিলে নামায হবে না।

৬. জামাআত হওয়া। অর্থাৎ, খুতবার শুরু থেকে প্রথম রাকআতের সিজদা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইমাম ব্যতিরেকেই ন্যূনতম তিনজন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা চাই; যদিও খুতবার সময় যে তিনজন উপস্থিত ছিল তারা নামাযে উপস্থিত ছিল না; বরং নামাযে উপস্থিত তিনজন ছিল ভিন্ন লোক। তবে শর্ত হল এই যে, সে তিনজন লোক ইমামতির উপযুক্ত হতে হবে। অতএব, যদি কেবল মহিলা বা নাবালেগ ছেলে থেকে থাকে তবে নামায হবে না।

৭. যদি সিজদা করার পূর্বে লোকজন চলে যায় এবং তিনজনের কম অবশিষ্ট থাকে অথবা কেউই না থাকে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সিজদা করার পর চলে যায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৮. সর্বসাধারণের শরীক হওয়ার অবাধ অনুমতি সহকারে প্রকাশ্যে জুমুআর নামায পড়া। সুতরাং বিশেষ কোন জায়গায় লুকিয়ে জুমুআর নামায পড়া শুদ্ধ নয়। যদি এমন কোন স্থানে জুমুআর নামায পড়া হয় যেখানে সর্বসাধারণের আসার অনুমতি নেই অথবা জুমুআর দিন মসজিদের দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে নামায হবে না।

এখানে জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার যে সকল শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এ সকল শর্ত না পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়ে তবে তার নামায হবে না। পুনরায় তাকে জোহরের নামায পড়তে হবে। যেহেতু এরূপ নামায নফলে পরিণত হয় এবং এরূপ গুরুত্বের সাথে নফল নামায পড়া মাকরূহ তাই এমতাবস্থায় জুমুআর নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী।

---

১. কাজেই কোন কারণে জুমুআর নামায পড়তে না পারলে বা জুমুআর নামায শুদ্ধ না হলে তার পরিবর্তে জোহরের নামায পড়তে হবে।

জুমুআর খুতবার মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যখন সমস্ত মুসল্লী উপস্থিত হয়ে যায় তখন ইমাম মিম্বরের উপর উঠে বসবেন এবং মুয়ায্যিন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন। আযানের পর তৎক্ষণাৎ ইমাম দাঁড়িয়ে খুতবা শুরু করবেন।

২. মাসআলা ঃ খুতবার মধ্যে বারোটি বিষয় সুন্নত ঃ (১) দাঁড়িয়ে খুত্বা দেওয়া, (২) দু'টি খুত্বা পড়া, (৩) দুই খুতবার মাঝখানে এতটুকু সময় বসা, যতক্ষণে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায়, (৪) উভয় হাদাছ (ওযূ ও গোসলের প্রয়োজন) থেকে পবিত্র হওয়া, (৫) খুতবা দানকালে মুসল্লীদের অভিমুখী হওয়া, (৬) খুতবা শুরু করার পূর্বে মনে মনে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়া, (৭) এপরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে খুতবা দেওয়া, যাতে মানুষ শুনতে পারে, (৮) খুতবার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত আটটি বিষয় থাকা ঃ (ক) আল্লাহর শোক্‌র, (খ) আল্লাহর প্রশংসা, (গ) জগৎস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও নবী (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দান, (ঘ) নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ, (ঙ) ওয়াজ-নসীহত, (চ) কুরআন পাকের দু'একটি আয়াত বা কোন সূরা তিলাওয়াত করা, (ছ) দ্বিতীয় খুতবায় উপরিউক্ত বিষয়াবলীর পুনরাবৃত্তি করা, (জ) দ্বিতীয় খুতবায় ওয়াজ-নসীহতের পরিবর্তে মুসলমানদের জন্য দু'আ করা। এগুলো খুতবার মধ্যকার আট প্রকার বিষয়-বস্তুর তালিকা। অতঃপর খুতবার (বারোটি সুন্নতের মধ্য থেকে) অবশিষ্ট সুন্নতগুলোর তালিকা পেশ করা হচ্ছে ঃ (৯) খুতবা অতি দীর্ঘ না করা; বরং নামাযের (সমান সমান বা তার) চেয়ে খাটো করা, (১০) মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া। কিন্তু মিম্বর থাকা সত্ত্বেও লাঠি বা অন্য কিছুর উপর ভর করে দাঁড়ানো এবং হাতের উপর হাত বেঁধে রাখা, যেমনটি বর্তমান যুগে কোন কোন লোককে করতে দেখা যায়, শরীয়তে এর কোন প্রমাণ নেই। (১১) উভয় খুতবাই আরবী ভাষায় (এবং গদ্যে) হওয়া। আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা পড়া বা অন্য ভাষায় পদ্য ইত্যাদি মিলিয়ে পড়া, যেমনটি বর্তমানে কোন কোন আম-সাধারণ লোকের অভ্যাস রয়েছে, সুন্নতে মুয়াক্কাদার খেলাফ ও মাকরূহ তাহরীমী। (১২) খুতবা শ্রবণকারীগণ কিবলামুখী হয়ে বসা। দ্বিতীয় খুতবায় নবী (সা.)-এর আওলাদ, সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত সহধর্মীণীগণের জন্য, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস (রা.)-এর জন্য দু'আ করা মুসতাহাব। দেশের মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের জন্য দু'আ করা জায়েয, কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরূহ তাহরীমী।

৩. মাসআলা ঃ যখন ইমাম খুতবার জন্য উঠে দাঁড়ান তখন থেকে নামায পড়া বা পরস্পরে কথাবার্তা বলা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য তারতীব সহকারে কাযা নামায পড়া যার যিম্মায় অপরিহার্য, এরূপ ব্যক্তির এ সময়েও কাযা নামায পড়া জায়েয; বরং ওয়াজিব। অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ না করা পর্যন্ত এ সব বিষয় নিষিদ্ধ।

৪. মাসআলা ঃ যখন খুতবা শুরু হয় তখন খুতবা শোনা উপস্থিত সকলের উপর ওয়াজিব। চাই ইমামের নিকটে বসুক বা দূরে। যে কোন কাজ খুতবা শোনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তা করা মাকরূহ তাহরীমী। এমনিভাবে খাওয়া, পান করা, কথাবার্তা বলা, হাঁটা-চলা করা, সালাম বা সালামের উত্তর দেওয়া, তাসবীহ পড়া বা কাউকে শরীয়তের কোন মাসআলা বলা নামাযরত অবস্থায় যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি এ সময়ও নিষিদ্ধ। হাঁ, খুতবা দানরত অবস্থায় খতীব কাউকে শরীয়তের মাসআলা বলতে পারেন।

৫. মাসআলা ঃ যদি সুন্নত বা নফল পড়া অবস্থায় খুতবা শুরু হয়ে যায় তবে গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে, নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলে তা পূর্ণ করে নেবে, আর যদি নফল হয় তবে দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে।

৬. মাসআলা ঃ দুই খুতবার মাঝখানে ইমাম যখন বসেন তখন ইমামের বা মুক্তাদীদের হাত তুলে দু'আ করা মাকরূহ তাহরীমী। হাঁ, হাত না তুলে যদি মনে মনে দু'আ করা হয় তবে তা জায়েয; যদি মুখে আস্তে বা জোরে কিছু উচ্চারণ না করা হয়। কিন্তু নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরূপ দু'আ করার কোন প্রমাণ নেই। রমযান মাসের শেষ জুমুআর খুতবায় বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া যেহেতু নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নয় এবং ফিকাহর কিতাবাদিতেও এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না, তদুপরি এরূপ সর্বদা করলে সাধারণ লোকজন এটাকে জরুরী মনে করতে পারে তাই এটা বিদআত।

জ্ঞাতব্য ঃ বর্তমান যুগে এ খুতবার প্রতি এমন জোর দেওয়া হচ্ছে যে, যদি কেউ না পড়ে তবে তাকে দোষারোপ করা হয় এবং এ খুতবা শোনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় (এরূপ করা উচিত নয়)।

৭. মাসআলা ঃ কিতাব বা অন্য কিছু দেখে খুতবা পড়া জায়েয।

৮. মাসআলা ঃ খুতবার মধ্যে যদি নবী (সা.)-এর নাম আসে তবে মুক্তাদীদের জন্য মনে মনে দরূদ শরীফ পড়ে নেওয়া জায়েয।

নবী (সা.)-এর জুমুআর খুতবা

নবী (সা.)-এর খুতবা উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সর্বদা এ খুতবাই পড়তে হবে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, কখনও কখনও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্য ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের নিয়্যতে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়ম ছিল এই যে, যখন সকল লোকজন এসে যেত তখন তিনি আগমন করতেন এবং উপস্থিতদেরকে সালাম দিতেন। তারপর হযরত বিলাল (রা.) আযান দিতেন। যখন আযান শেষ হত তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং সাথে সাথে খুতবা শুরু করতেন। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে খুতবার সময় লাঠি বা ধনুকের উপর হাত দিয়ে ভর করে দাঁড়াতেন। কখনও মিহরাবের নিকট যে খুঁটি ছিল তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর লাঠি বা অন্য কিছুতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার কোন প্রমাণ নেই।

(যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ.১২০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'টি খুতবা পড়তেন। দুই খুতবার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসতেন, কিন্তু তখন কোন কথা বলতেন না বা কোন দু'আ করতেন না। যখন দ্বিতীয় খুতবা শেষ হত তখন হযরত বিলাল (রা.) ইকামত বলতেন। ইকামত শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায শুরু করতেন। খুতবা দেওয়ার সময় নবী (সা.)-এর আওয়াজ খুব বড় হয়ে যেত এবং চক্ষু মুবারক লাল হয়ে যেত। মুসলিম শরীফে আছে, খুতবা দেওয়ার সময় রাসূল্লাহ (সা.)-এর এরূপ অবস্থা হত, যেন তিনি আসন্ন শত্রু-বাহিনী থেকে নিজ লোকদেরকে সতর্ক করছেন।

অনেক সময় খুতবায় বলতেন, بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "আমি প্রেরিত হয়েছি, আর কিয়ামত আমার নিকটবর্তী, যেমন এদু'টি আঙ্গুল" এবলে তিনি মধ্যমা অঙ্গুলি ও শাহাদাত অঙ্গুলি– এ দু'টি মিলিয়ে দেখাতেন। তারপর বলতেন ঃ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ–

অর্থ ঃ "মোটকথা, তোমরা জেনে রাখ যে, সর্বোৎকৃষ্ট বাণী আল্লাহর কুরআন এবং সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ। আর সর্বনিকৃষ্ট বিষয় বিদআত এবং সব বিদআত গুমরাহী। আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার নিজের

চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্খী। যে ব্যক্তি (মৃত্যুকালে) কোন সম্পদ রেখে যায় সে সম্পদ তারই উত্তরাধিকারীদের জন্য, আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ বা ইয়াতীম সন্তান রেখে যায় তার দায়িত্ব আমার উপর।"

কখনও এ খুতবা দিতেন ঃ

يَـا يُّهَا النَّاسُ تُوبُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ
الصَّالِحَةِ وَ صِلُوا الَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ
الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ تُوجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُرْزَقُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوبَةً فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ
شَهْرِيْ هٰذَا فِيْ عَامِيْ هٰذَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ وَّجَدَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا
فَمَنْ تَرَكَهَا فِيْ حَيَاتِيْ أَوْ بَعْدِيْ جُحُوْدًا بِهَا أَوْ اِسْتِخْفَافًا بِهَا
وَلَهُ إِمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِيْ أَمْرِهِ
أَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهُ أَلَا وَلَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَلَا زَكٰوةَ لَهُ أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ أَلَا وَلَا بِرَّ لَهُ
حَتّٰى يَتُوْبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ أَلَا وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا أَلَا وَلَا
يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا أَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَّقْهَرَهُ
سُلْطَانٌ يَّخَافُ سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ (ابن ماجه)

অর্থ ঃ হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্বেই তওবা কর এবং নেক আমলের দিকে ধাবিত হও। তোমরা আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি যিক্‌র করে এবং অপ্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে প্রচুর পরিমাণে সদকা করে তোমাদের ও তোমাদের রবের মধ্যকার সম্পর্ক বজায় রাখ। ফলে তোমরা পুরস্কৃত হবে, প্রশংসনীয় হবে এবং রিয্‌কপ্রাপ্ত হবে। আর তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা আমার এ জায়গায়, এ মাসে, এ বছর জুমুআর নামায তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত ফরয করে দিয়েছেন অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা জুমুআর নামাযের জন্য মসজিদে পৌঁছতে সক্ষম তাদের উপর। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় বা আমার মৃত্যুর পর জুমুআর নামাযকে অস্বীকার করে বা তুচ্ছ জ্ঞান করে তরক করে, অথচ তার একজন শাসনকর্তা রয়েছে, জালিম বা ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ তার বিশৃংখলা দূর করবেন না তার কাজে বরকত দেবেন না এবং জেনে রাখ, তার নামাযও কবুল হবে না, তার রোযাও কবুল হবে না, তার যাকাতও কবুল হবে না, তার হজ্জও কবুল হবে না এবং তার কোন নেক আমল কবুল হবে

না, যে পর্যন্ত না সে তওবা করে। অবশ্য যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করবেন। আরও জেনে রাখ যে, কোন নারী যেন কোন পুরুষের ইমামতি না করে, কোন মূর্খ বেদুইন যেন কোন (ইলম অন্বেষণে) হিজরতকারী (আলিমের) ইমামতি না করে এবং কোন ফাসিক যেন কোন মু'মিন মুত্তাকীর ইমামতি না করে। অবশ্য এমন কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যদি তাকে পরাভূত করে ইমামতি করে যার তরবারি বা লাঠির ভয় করতে হয় তবে সে কথা ভিন্ন। (ইবনে মাজা)

কখনও হাম্দ ও সালাতের পর এ খুতবা দিতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى وَ مَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَ لَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا - (ابوداؤد)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অকল্যাণ ও আমাদের যাবতীয় মন্দ কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না, আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন তাকে কেউ হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্য দীন সহকারে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে কিয়ামতের পূর্বে প্রেরণ করেছেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে সুপথ পেল এবং সৎপথে পরিচালিত হল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে সে নিশ্চয় নিজেরই ক্ষতি করে। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না। (আবূ দাউদ শরীফ)

জনৈক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকাংশ সময় খুতবায় সূরা কাফ পড়তেন। ফলে তিনি যখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এ সূরাটি পড়তেন তখন আমি তাঁর থেকেই শুনে শুনে সূরা কাফ মুখস্থ করে ফেলি।[১]

১. মুসলিম শরীফ

কখনও সূরা ওয়াল আসর পড়তেন, আবার কখনও পড়তেন ঃ

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

অর্থ ঃ জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসী সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীরাই সফল কাম। (হাশর ঃ ২০)

আর কখনও পড়তেন [১]

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আর জাহান্নামবাসীরা চিৎকার করে বলবে, হে (জাহান্নামের অধিকর্তা ফেরেশতা) মালিক। তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিক। সে বলবে, তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। (যুখরুফ ঃ ৭৭)

জুমুআর নামাযের মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যিনি খুতবা দেবেন তিনিই নামায পড়াবেন, এটাই উত্তম। কিন্তু যদি অন্য কেউ পড়ায় তবে তাও জায়েয।

২. মাসআলা ঃ খুতবা শেষ হতেই তৎক্ষণাৎ ইকামত বলে নামায শুরু করা সুন্নত। খুতবা ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন দুনিয়াবী কাজ করা মাকরূহ তাহরীমী। খুতবা ও নামাযের মধ্যে যদি ব্যবধান বেশি হয়ে যায়, তবে খুতবা পুনরায় পড়া আবশ্যক। অবশ্য যদি কোন দীনী কাজের প্রয়োজন হয়, যেমন ঃ কাউকে শরীয়তের কোন মাসআলা বলল বা ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় ওযূ করতে গেল অথবা খুতবার পর জানতে পারল যে, তার গোসলের প্রয়োজন ছিল, সুতরাং সে গোসল করতে গেল তবে এটা মাকরূহ হবে না এবং খুতবাও পুনরায় পড়তে হবে না।

৩. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের নিয়্যত এভাবে করবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

অর্থ ঃ আমি জুমুআর দুই রাকআত ফরয নামায পড়ার নিয়্যত করছি।

৪. মাসআলা ঃ এক জায়গার সকল লোক একত্র হয়ে একই মসজিদে জুমুআর নামায পড়া উত্তম। যদিও এক জায়গায় একাধিক মসজিদেও জুমুআর নামায পড়া জায়েয আছে বটে।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মাসবূক শেষ বৈঠকে ইমামের আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় অথবা সিজদায়ে সাহ্ব করার পর এসে নামাযে শরীক হয়, তবে তার অংশ গ্রহণ শুদ্ধ হবে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি জুমুআর নামায পূর্ণ করবে। তার জোহরের নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।

---

১. বাহরুর রায়েক

৬. **মাসআলা ঃ** কোন কোন লোক জুমুআর পর সতর্কতামূলক জোহরের নামায পড়ে থাকে। যেহেতু এর কারণে সর্বসাধারণের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে কাজেই তাদেরকে একেবারেই নিষেধ করে দেওয়া চাই। অবশ্য যদি কোন আলিম সন্দেহের স্থলে (জুমুআর পর সতর্কতামূলক জোহরের নামায) পড়তে চান, তবে তার পড়ার ব্যাপারে কাউকে জানাবেন না।

ঈদের নামাযের বর্ণনা

১. **মাসআলা ঃ** শাওওয়াল মাসের প্রথম তারিখকে ঈদুল ফিত্‌র এবং যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখকে ঈদুল আযহা বলা হয়। ইসলামে এ দু'টি দিন ঈদ তথা খুশির দিন। এ দু'টি দিনেই শুকরিয়া স্বরূপ দুই রাকআত করে নামায পড়া ওয়াজিব। জুমুআর নামায শুদ্ধ ও ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সে সকল শর্ত ঈদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে খুতবার বিধানে ভিন্নতা রয়েছে। জুমুআর নামাযে খুতবা ফরয ও নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। জুমুআর খুতবা নামাযের পূর্বে পাঠ করতে হয়। কিন্তু দুই ঈদের নামাযে খুতবা শর্ত ও ফরয নয়, বরং সুন্নত এবং ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের পরে পাঠ করতে হয়। অবশ্য দুই ঈদের খুতবা শোনাও জুমুআর খুতবার ন্যায় ওয়াজিব। অর্থাৎ, তখন কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, নামায পড়া সবই হারাম।

ঈদুল ফিত্‌রের দিন ১৩টি কাজ করা সুন্নত। যথা ঃ

১. শরীয়ত সম্মত সাজগোজ করা।

২. গোসল করা।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. যথাসম্ভব উত্তম পোশাক পরিধান করা।

৫. সুগন্ধি লাগানো।

৬. ভোর বেলায় অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা।

৭. ভোরে ভোরে ঈদগাহে গমন করা।

৮. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি দ্রব্য, যেমন ঃ খেজুর বা অন্য কিছু ভক্ষণ করা।

৯. ঈদগাহে গমনের পূর্বে সদকায়ে ফিত্‌র দান করা,

১০. ঈদের নামায ঈদগাহে গিয়ে পড়া, অর্থাৎ, বিনা ওযরে শহরের কোন মসজিদে ঈদের নামায না পড়া।

১১. ঈদগাহে এক রাস্তায় গমন করা ও অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

১২. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা।

১৩. ঈদগাহে যাওয়ার পথে নিম্নস্বরে তাকবীর পড়তে পড়তে যাওয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

২. মাসআলা ঃ ঈদুল ফিত্‌রের নামায পড়ার নিয়ম এই যে, প্রথমে এভাবে নিয়্যত করবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَیِ الْوَاجِبِ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبَةٍ

অর্থাৎ, "আমি ঈদুল ফিত্‌রের দুই রাকআত ওয়াজিব নামায ছয়টি ওয়াজিব তাকবীরসহ পড়ার নিয়্যত করছি।"

এ নিয়্যত করে (তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত তুলে তারপর) হাত বাঁধবে। এরপর "সুবহানাকা আল্লাহুমা......" শেষ পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে। প্রত্যেক বার তাকবীরে তাহরীমার মত উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলবে এবং তাকবীরের পর হাত ছেড়ে দেবে। প্রত্যেক তাকবীরের পর এতটুকু বিলম্ব করবে যাতে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায়। তৃতীয় তাকবীরের পর হাত ছেড়ে না দিয়ে হাত বাঁধবে। তারপর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে এবং যথারীতি রুকূ-সিজদা করবে।

অতঃপর দ্বিতীয় রাআতের জন্য দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা পড়বে। তারপর পূর্বের নিয়মে তিন তাকবীর বলবে। তবে এখানে তৃতীয় তাকবীরের পর হাত বাঁধবে না; বরং হাত ছেড়ে রাখবে এবং আরেকটি তাকবীর বলে রুকূতে যাবে।

৩. মাসআলা ঃ নামাযের পর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে দু'টি খুতবা পাঠ করবে। উভয় খুতবার মাঝখানে এতটুকু সময় বসবে, যতটুকু সময় জুমুআর দুই খুতবার মাঝখানে বসা হয়।

৪. মাসআলা ঃ দুই ঈদের নামাযের পর (অথবা খুতবার পর) দু'আ করা যদিও নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন থেকে প্রমাণিত নয়, কিন্তু সাধারণতঃ অন্যান্য নামাযের পর যেহেতু দু'আ করা সুন্নত, তাই দুই ঈদের নামাযের পরও দু'আ করা সুন্নত হবে (কিয়াস নির্ভর মাসআলা)

৫. মাসআলা ঃ দুই ঈদের খুতবা প্রথমে তাকবীর দিয়ে শুরু করবে। প্রথম খুতবায় ৯বার আল্লাহু আকবার বলবে এবং দ্বিতীয় খুতবায় ৭ বার বলবে।

৬. মাসআলা ঃ ঈদুল আযহার নামাযের নিয়মও ঈদুল ফিতরের নামাযের মতই এবং ঈদুল ফিতরে যে সকল সুন্নত রয়েছে সেগুলো ঈদুল আযহায়ও সুন্নত। পার্থক্য কেবল এটুকু যে,

(ক) ঈদুল আযহার নামাযের নিয়্যত করার সময় পূর্বে উল্লিখিত ঈদুল ফিতরের নিয়্যতের মধ্যে "ঈদুল ফিত্‌র" শব্দের পরিবর্তে "ঈদুল আযহা" শব্দটি বলবে।

(খ) ঈদুল ফিত্‌রে ঈদগাহে গমনের পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নত, কিন্তু ঈদুল আযহায় সুন্নত নয়।

(গ) ঈদুল ফিত্‌রে ঈদগাহে গমন করার সময় পথে নিম্নস্বরে তাকবীর বলা সুন্নত, কিন্তু ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃস্বরে বলা সুন্নত।

(ঘ) ঈদুল ফিত্‌রের নামায (কিছুটা) বিলম্বে পড়া সুন্নত, কিন্তু ঈদুল আযহার নামায তার চেয়ে ভোরে পড়া সুন্নত।

(ঙ) ঈদুল ফিত্‌রে নামাযের পূর্বে সদকায় ফিত্‌র দিতে হয়, কিন্তু ঈদুল আযহায় সদকায়ে ফিত্‌র নেই বরং নামাযের পর সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কুরবানী করা আবশ্যক।

ঈদুল ফিত্‌রের নামাযের জন্যও আযান-ইকামত দিতে হয় না এবং ঈদুল আযহায়ও নয়।

৭. মাসআলা ঃ যেখানে ঈদের নামায পড়া হয়। (অর্থাৎ ঈদগাহ) সেখানে ঈদের দিন নামাযের পূর্বে বা পরে কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ। অবশ্য ঈদের নামাযের পর বাড়িতে এসে নফল নামায পড়া মাকরূহ নয়। কিন্তু নামাযের পূর্বে তাও মাকরূহ।

৮. মাসআলা ঃ মহিলা এবং যারা কোন কারণ বশতঃ ঈদের নামায পড়ে নি তাদের জন্যও ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ।

৯. ঈদুল ফিত্‌রের খুতবায় সদকায়ে ফিত্‌রের বিধি-বিধান এবং ঈদুল আযহার খুতবায় কুরবানী ও তাকবীরে তাশরীকের মাসায়েল বর্ণনা করবে। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব; যদি সে ফরয শহরে জামাআত সহকারে পড়া হয়। তাকবীরে তাশরীক হল এই ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

মহিলা ও মুসাফিরের উপর এ তাকবীর ওয়াজিব নয়। যদি তারা এমন কোন ব্যক্তির মুক্তাদী হয় যার উপর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব, তবে তাদের উপরও তাকবীর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু যদি একাকী নামায পালনকারী ব্যক্তি, মহিলা এবং মুসাফিরও তাকবীর বলে তবে ভাল। কেননা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)- এর মতে, তাদের সবার উপরেই তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব।[১]

---

১. অনেক ফিকাহবিদের মতে, ইমাম আবূ ইউসুফও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমত মুতাবিকই ফতওয়া।

১০. মাসআলা ঃ আরাফার দিবস অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জের ফজর থেকে ১৩ যিলহজ্জের আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাযের পর এ তাকবীর বলা ওয়াজিব।

১১. মাসআলা ঃ এ তাকবীর উচ্চ শব্দে বলা ওয়াজিব। মহিলা অবশ্য নিঃশব্দে বলবে।

১২. নামাযের পরপরই তাকবীর বলতে হবে।

১৩. ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে গেলে মুক্তাদীরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলে উঠবে। এ অপেক্ষা করবে না যে, যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তারা তাকবীর বলবে।

১৪. ঈদুল আযহার নামাযের পরও কোন কোন ফিকাহবিদের মতে তাকবীর বলা ওয়াজিব।

১৫. ফিকাহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত মুতাবিক, একই শহরের একাধিক জায়গায় ঈদের নামায পড়া জায়েয।

১৬. যদি কেউ ঈদের নামায না পায় এবং সকল লোক নামায পড়ে ফেলে তখন একাকী ঈদের নামায পড়তে পারবে না। কেননা, ঈদের নামাযের জন্য জামাআত শর্ত। এমনিভাবে কেউ যদি জামাআতে শরীক হয়ে থাকে এবং কোন কারণে তার নামায নষ্ট হয়ে যায় তবে সেও তার নামাযের কাযা পড়তে পারবে না এবং তার উপর সে নামাযের কাযা ওয়াজিব নয়। অবশ্য আরও কিছু লোক যদি তার সাথে জুটে যায় তবে তাদের উপর ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কোন ওযরের কারণে প্রথম দিন (দুপুরের পূর্বে) ঈদের নামায পড়তে না পারে তবে ঈদুল ফিত্‌রের নামায দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহার নামায ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত পড়তে পারে।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ওযর ছাড়াই ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত ঈদুল আযহার নামায বিলম্ব করে পড়লে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে বটে, তবে মাকরূহ হবে। কিন্তু ঈদুল ফিতরের নামায কোন ওযর ব্যতিরেকে বিলম্ব করে পড়লে নামাযই শুদ্ধ হবে না।

ওযরের উদাহরণ ঃ

(ক) কোন কারণবশত ঃ ইমাম যদি উপস্থিত হতে না পারে।[১]

(খ). অনবরত বৃষ্টি হতে থাকে।

১.ইমাম যদি এরূপ হয়, যাকে বাদ দিয়ে নামায পড়লে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, চাই সে প্রশাসনিক ক্ষমতাধর হোক বা না হোক, তবে তার অনুপস্থিতি ওযর বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এরূপ কোন দ্বন্দ্ব সংঘাতের আশঙ্কা না থাকে তবে উপস্থিত মুসল্লীরা অন্য কাউকে ইমাম বানিয়ে নামায পড়ে নেবে। ইমাম উপস্থিত না হওয়ার কারণে নামায পড়তে বিলম্ব করবে না।

(গ) ওয়াক্ত থাকতে চাঁদের তারিখ সঠিকভাবে সাব্যস্ত না হয়ে থাকে; ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর চাঁদ উঠার খবর পেয়ে থাকে।

(ঘ) মেঘলা দিনে নামায পড়া হল, কিন্তু মেঘ সরে যাওয়ার পর জানা গেল যে, তখন নামাযের ওয়াক্ত ছিল না।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ ঈদের নামাযে এমন সময় এসে শরীক হয় যখন ইমাম তাকবীরগুলো বলে ফেলেছে, তবে এ ক্ষেত্রে সে যদি ইমামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পেয়ে থাকে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ নিয়্যত বেঁধেই তাকবীরগুলো বলে নেবে; যদিও ইমাম কেরাআত শুরু করে ফেলে থাকে। আর সে যদি ইমামকে রুকূতে এসে পায় এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে তাকবীরগুলো বলে ইমামের সাথে রুকূতে শরীক হতে পারবে তবে সে নিয়্যত বেঁধে তাকবীরগুলো বলবে তারপর রুকূতে যাবে, আর যদি রুকূ না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে রুকূতে শরীক হয়ে যাবে এবং রুকূ অবস্থায় তাসবীহর পরিবর্তে তাকবীরগুলো বলবে। কিন্তু রুকূ অবস্থায় তাকবীরগুলো বলার সময় হাত তুলবে না। সবগুলো তাকবীর বলার পূর্বে ইমাম যদি রুকূ থেকে মাথা তুলে ফেলে তবে সেও দাঁড়িয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার যে তাকবীরগুলো থেকে যাবে সেগুলো মাফ।

২০. মাসআলা ঃ কারও যদি ঈদের নামায এক রাকআত ছুটে যায় তবে সে যখন তার ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করতে দাঁড়াবে তখন প্রথমে সে কেরাআত পড়বে। তারপর তাকবীরগুলো বলবে। যদিও নিয়ম মুতাবিক প্রথমে তাকবীরগুলো বলা উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ করলে যেহেতু উভয় রাকআতে তাকবীরগুলো পরপর চলতে থাকে এবং এর পক্ষে কোন সাহাবীর অভিমতও নেই তাই নিয়মের ব্যতিক্রমই বিধান দেওয়া হয়েছে।

ইমাম যদি (দণ্ডায়মান অবস্থায়) তাকবীরগুলো বলতে ভুলে যায় এবং রুকূতে যাওয়ার পর মনে পড়ে, তবে রুকূতেই তাঁর তাকবীরগুলো বলে নেওয়া চাই। তাকবীর বলার জন্য আবার রুকূ থেকে উঠে দাঁড়াবে না। কিন্তু যদি এজন্য রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ায় তবে তাও জায়েয আছে অর্থাৎ, নামায নষ্ট হবে না। তবে যেটাই অবলম্বন করুক, লোকসংখ্যার আধিক্যের কারণে সিজদায়ে সাহ্‌ব করতে হবে না।

কা'বা শরীফের ভেতরে নামায পড়ার বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ যেমনিভাবে কা'বা শরীফের বাইরে দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফের অভিমুখী হয়ে নামায পড়া জায়েয, তেমনি কা'বা শরীফের ভেতরেও নামায পড়া জায়েয। যে দিকে ফিরেই পড়ুক কেবলার প্রতিই রুখ হবে। কেননা, সেখানে সবদিকেই কেবলা। যে দিকেই অভিমুখী হোক সেদিকেই কা'বা। সেখানে যেরূপ নফল নামায পড়া জায়েয, তদ্রূপ ফরয নামায পড়াও জায়েয।

২. মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া হলে তাও শুদ্ধ হবে। কেননা, যে স্থানে কা'বা শরীফ অবস্থিত সেটি জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই কেবলা। কেবলা কেবল কা'বা শরীফের চতুর্দিকের প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং কেউ যদি কোন উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, যেখান থেকে কা'বা শরীফের কোন প্রাচীরের প্রতি অভিমুখিতা থাকে না, তবে তার নামাযও সর্বসম্মত অভিমত মুতাবিক, শুদ্ধ হবে। কিন্তু যেহেতু কা'বা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লে কা'বা শরীফের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এবং এভাবে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধও করেছেন তাই এটা মাকরূহ তাহরীমী।

৩. মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ভেতরে একাকী নামায পড়াও জায়েয এবং জামাআত সহকারে পড়াও জায়েয। সেখানে ইমাম ও মুক্তাদীর একদিকে অভিমুখী হয়ে দাঁড়ানোও শর্ত নয়। কেননা, সেখানে সর্বদিকেই কেবলা রয়েছে। অবশ্য এ শর্ত আছে যে, মুক্তাদী যাতে ইমামের চেয়ে অগ্রসর হয়ে না দাঁড়ায়। যদি মুক্তাদীর মুখ ইমামের মুখের দিকে হয় তবে তাও জায়েয। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুক্তাদীকে ইমামের চেয়ে অগ্রসর বলা যায় না। যদি উভয়ের মুখ একদিকে থাকে এবং মুক্তাদী ইমামের চেয়ে আগে দাঁড়ায় তখন মুক্তাদীকে ইমামের চেয়ে অগ্রসর বলা যাবে। অবশ্য উপরিউক্ত মুখোমুখি অবস্থায় নামায মাকরূহ হবে। কেননা, কোন মানুষের মুখের দিকে ফিরে নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু মাঝখানে কোন কিছুর আড় সৃষ্টি করে দিলে মাকরূহ হবে না।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম যদি কা'বা শরীফের ভেতরে দাঁড়ায় এবং মুক্তাদীরা কা'বা শরীফের বাইরে বেষ্টনী দিয়ে দাঁড়ায় তখনও নামায হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম যদি একা কা'বা শরীফের ভেতরে দাঁড়ায় এবং কোন মুক্তাদী তার সাথে না থাকে তবে নামায মাকরূহ হবে। কারণ, কা'বা শরীফের ভেতরের জমিন বাইরের জমিন থেকে উঁচু। সুতরাং উপরিউক্ত অবস্থায় ইমামের স্থান মুক্তাদীদের থেকে এক মানুষ পরিমাণ উঁচু হবে।(উল্লেখ্য যে, এরূপ হওয়া মাকরূহ)।

৫. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি কা'বা শরীফের ভেতরে দাঁড়ায় এবং ইমাম যদি বাইরে থাকে তখনও নামায শুদ্ধ হবে, যদি মুক্তাদী ইমামের চেয়ে অগ্রসর হয়ে না দাঁড়ায়।

৬. মাসআলা ঃ সবাই যদি বাইরে দাঁড়ায়, একদিকে ইমাম থাকে, আর চতুর্দিকে মুক্তাদীরা বেষ্টনী করে কা'বা শরীফ ঘিরে দাঁড়ায়, যেমনটি সেখানে নামায পড়ার সাধারণ প্রচলন রয়েছে, তবে তাও জায়েয। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল যে, যে দিকে ইমাম দাঁড়ায় সে দিকে কোন মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা কা'বা

শরীফের অধিক নিকটবর্তী না হওয়া চাই। কেননা, এমতাবস্থায় সে ইমামের চেয়ে অগ্রসর হয়ে দণ্ডায়মান বলে গণ্য হবে, যা ইকতেদার পরিপন্থী। অবশ্য ইমামের দাঁড়ানোর দিক ব্যতীত অন্য কোন দিকে মুক্তাদী যদি ইমাম অপেক্ষা কা'বা শরীফের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়, তবে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। যেমন এখানে একটি ছক এঁকে দেখানো হয়েছে।
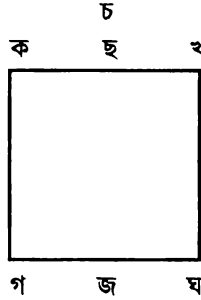
এখানে ক, খ, গ, ঘ হল কা'বা শরীফের চতুর্সীমা। চ হল ইমাম, তিনি কা'বা শরীফ থেকে দুই গজ দূরে দাঁড়িয়েছেন এবং ছ ও জ মুক্তাদী। তারা কা'বা শরীফ থেকে এক এক গজ দূরে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু 'ছ' চ-এর দিকে দাঁড়িয়েছে এবং জ অপর দিকে দাঁড়িয়েছে। এতে ছ-এর নামায হবে না, কিন্তু জ-এর নামায হবে।

তিলাওয়াতের সিজদার বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন ইমামের নিকট সিজদার আয়াত শুনে তারপর তার পেছনে ইকতেদা করে, তবে সে ইমামের সাথে সিজদা করবে। যদি (তার ইকতেদা করার পূর্বে) ইমাম তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করে ফেলে তখন দু'টি সূরত হতে পারে।

(ক) ইমাম যে রাকআতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছে সে রাকআতই যদি সে পেয়ে যায়, তবে তার তিলাওয়াতের সিজদা করতে হবে না। সে রাকআত পাওয়ার কারণে তিলাওয়াতের সিজদাও পেয়েছে বলে গণ্য হবে।

(খ) আর যদি সে সেই রাকআতটি না পায়, তবে নামায শেষ করার পর নামাযের বাইরে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

২. মাসআলা ঃ ইমাম যদি মুক্তাদী থেকে সিজদার আয়াত শুনে, তবে ইমাম ও মুক্তাদী কারও উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে না এবং আরও যে সকল লোক সে নামাযে শরীক রয়েছে তাদের উপরও নয়। অবশ্য এমন কোন লোক যদি শুনে যে সে নামাযে শরীক নয়, চাই এমন হোক যে, নামাযই পড়ছে না, অথবা অন্য কোন নামাযে রত রয়েছে, তবে তার উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে।

৩. মাসআলা ঃ তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে খিলখিলিয়ে হাসার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না, তবে সিজদা বাতিল হয়ে যায়।

৪. মাসআলা ঃ তিলাওয়াতের সিজদায় পুরুষ মহিলার পাশাপাশি হলে তিলাওয়াতের সিজদা নষ্ট হয় না।

৫. মাসআলা ঃ তিলাওয়াতের সিজদা যদি নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তা আদায় করা ওয়াজিব। বিলম্ব করার অনুমতি নেই।

৬. মাসআলা ঃ নামাযের বাইরের তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের ভেতরে এবং নামাযের ভেতরের তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের বাইরে; এমনকি অন্য কোন নামাযের মধ্যেও আদায় করা যায় না। সুতরাং যদি কেউ নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা না করে, তবে এজন্য সে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। এ জন্য তওবা ব্যতীত তার অন্য কোন সমাধান নেই অথবা দয়াবান আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৭. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি পৃথক পৃথক বাহনে চড়ে নামায পড়ছে, আর বাহন চলছে, উভয়ে নামাযের মধ্যে একই আয়াত তিলাওয়াত করল এবং তারা একে অপরের তিলাওয়াত নামাযের মধ্যেই শুনল, তবে এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের উপর একটি করেই সিজ্দা ওয়াজিব হবে এবং তা নামাযের মধ্যেই আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি একই আয়াত উভয়ে পড়ল বটে, তবে তাদের একজনের তিলাওয়াত অপরজন নামাযের বাইরে থেকে শুনল, তবে উভয়ের উপর দু'টি করে সিজদা ওয়াজিব হবে। একটি তিলাওয়াতের কারণে, আর অপরটি শোনার কারণে। তবে যে সিজদাটি তিলাওয়াতের কারণে ওয়াজিব হবে সেটি নামাযেরই মধ্যস্থ গণ্য হবে এবং নামাযের মধ্যেই তা আদায় করতে হবে। আর যে সিজদাটি তিলাওয়াত শোনার কারণে ওয়াজিব হবে সেটি নামাযের বাইরে আদায় করতে হবে।

৮. মাসআলা ঃ যদি সিজদার আয়াত নামাযের মধ্যে পড়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ বা দু'তিন আয়াত পরে রুকূ করা হয় এবং রুকূতে যাওয়ার সময় তিলাওয়াতের সিজদারও নিয়্যত করা হয়, তবে সেই রুকূ দ্বারা তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর রুকূ ও কাওমা করতঃ যদি নামাযের সিজদা করা হয়, তবে তাতেও তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয়ে যাবে এবং তাতে তিলাওয়াতের সিজদার নিয়্যত করাও আবশ্যক নয়।

৯. মাসআলা ঃ জুমুআ, দুই ঈদ ও নিঃশব্দ কেরাআত বিশিষ্ট নামাযসমূহে সিজদার আয়াত পড়বে না। কেননা, এ সকল নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করলে মুক্তাদীদের বিভ্রান্তির আশঙ্কা রয়েছে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ নদীতে ডুবে মারা যায়, তবে যখন তাকে পানি থেকে তোলা হবে তখন তাকে গোসল দেওয়া ফরয। পানিতে নিমজ্জিত হওয়া গোসলের বদলে যথেষ্ট হবে না। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া জীবিতদের উপর ফরয। পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে তাদের দায়িত্ব আদায় হয় নি। অবশ্য পানি থেকে তোলার সময় যদি গোসল দেওয়ার নিয়্যতে তাকে পানিতে নাড়াচাড়া দিয়ে তোলা হয়, তবে তাতে গোসল হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি মৃত ব্যক্তির লাশ বৃষ্টিতে ভিজে অথবা অন্য কোনভাবে পানিতে ভিজে, তবে এতেও গোসল দেওয়ার ফরয আদায় হবে না।

২. মাসআলা ঃ যদি কোথাও কোন মৃত মানুষের শুধু মাথা পাওয়া যায়, তবে সেটিকে গোসল দিতে হবে না। গোসল ছাড়া ওভাবেই দাফন করে ফেলবে। যদি কোন মৃত মানুষের শরীর কোথাও অর্ধেকের বেশি পাওয়া যায় তবে তাকে গোসল দেওয়া আবশ্যক, চাই মাথাসহ পাওয়া যাক বা মাথা ব্যতীত। আর যদি অর্ধেকের কম হয় তবে গোসল দিতে হবে না, চাই মাথাসহ পাওয়া যাক বা মাথা ব্যতীত।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোথাও কোন ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায় এবং কোন আলামতে বুঝা যাচ্ছে না যে, লোকটি মুসলমান ছিল, না কি কাফের, তবে লাশটি যদি দারুল ইসলামে[১] পাওয়া যায় তাহলে তাকে গোসল দিতে হবে এবং তার জানাযার নামাযও পড়তে হবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি মুসলমানদের লাশ ও কাফেরদের লাশ মিশে যায় এবং মুসলমানের ও অমুসলমানের লাশ পৃথক করা না যায়, তবে সবাইকে গোসল দিতে হবে। আর যদি মুসলমান ও অমুসলমানের লাশ চেনা যায়, তবে মুসলমানদের লাশগুলো পৃথক করে কেবল সেগুলোকে গোসল দেবে। কাফেরদের লাশগুলোকে গোসল দেবে না।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলমানের কোন কাফের আত্মীয় মারা যায়, তবে তার লাশ তার সধর্মীদেরকে দিয়ে দেবে। যদি তার কোন সধর্মী না পাওয়া যায় অথবা পাওয়া গেছে, কিন্তু তারা নিতে চায় না তবে অগত্যা সে মুসলমানই তাকে গোসল দিবে, কিন্তু সুন্নত তরীকা অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ, তাকে ওযূ করাবে না,তার মাথা পরিষ্কার করবে না এবং তার শরীরে কাফুর বা অন্য কোন সুগন্ধি লাগাবে না; বরং যেভাবে কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয় তদ্রূপই তাকে ধুবে। এবং কাফেরের লাশ ধুলেও পাক হবে না। যদি কেউ তাকে নিয়ে নামায পড়ে তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না।

---

১. এখানে দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অধ্যুসিত দেশ বা এলাকা।

৬. মাসআলা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাত যদি লড়াইয়ের সময় মারা যায়, তবে তাদের লাশকে গোসল দেবে না।

৭. মাসআলা ঃ মুরতাদ (ইসলাম পরিত্যাগকারী) যদি মারা যায়, তবে তাকেও গোসল দেবে না এবং তার সধর্মীরা যদি তার লাশ চায় তবে তাদেরকেও দেবে না।

৮. মাসআলা ঃ পানি না পাওয়া যাওয়ার কারণে যদি কোন মৃত ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করানো হয় এবং পরে পানি পাওয়া যায়, তবে তাকে আবার গোসল দিবে।

মৃত ব্যক্তির কাফন সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা

১. মাসআলা ঃ যদি মানুষের কোন অঙ্গ বা মাথাবিহীন শরীরের অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তবে তা একখানা কাপড়ের টুকরায় পেঁচিয়ে দাফন করে ফেললে চলবে। অবশ্য যদি মাথাসহ শরীরের অর্ধাংশ বা অর্ধাংশের বেশি পাওয়া যায় এবং তাতে যদি মাথা নাও থাকে তবুও তাকে সুন্নত তরীকা মুতাবিক কাফন দিতে হবে।

২. মাসআলা ঃ কোন মানুষের কবর যদি খোলা পাওয়া যায় অথবা কোন কারণে যদি কোন মানুষের লাশ কবরের বাইরে পড়ে থাকে এবং গায়ে কাফন না থাকে এবং লাশটি না পঁচে থাকে, তবে তাকেও সুন্নত তরীকা মুতাবিক কাফন পরিয়ে দিতে হবে। আর যদি পঁচে যেয়ে থাকে তবে (সুন্নত মুতাবিক কাফনের প্রয়োজন নেই) কেবল এক টুকরো কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে ফেললেই চলবে।

জানাযার নামাযের মাসায়েল

জানাযার নামায মূলতঃ অনুপম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা।

১. মাসআলা ঃ অন্যান্য নামায ওয়াজিব হওয়ার যে সব শর্ত আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি সেগুলো জানাযার নামায ওয়াজিব হওয়ারও শর্ত। তবে জানাযার নামাযে একটি শর্ত বেশি আছে। আর তা এই যে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানা থাকা চাই। যার এ খবর জানা নেই সে অক্ষম। জানাযার নামায তার উপর জরুরী নয়।

২. মাসআলা ঃ জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুধরনের শর্ত রয়েছে। প্রথম প্রকার মুসল্লীর সাথে সম্পর্কিত। আর তা হল এমন শর্তাবলী, যেগুলো অন্যান্য নামাযের শুদ্ধ তার শর্তস্বরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, নিয়্যত করা। অবশ্য ওয়াক্ত হওয়া জানাযার নামাযের জন্য শর্ত নয়। তাছাড়া জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা

থাকলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। ধরুন, জানাযার নামায শুরু হয়ে গেছে এমতাবস্থায় ওযূ করতে গেলে নামায শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে। কিন্তু অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে এ সুযোগ নেই। অন্যান্য নামাযে যদি ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে তবু তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয হবে না।

৩. মাসআলা ঃ আজকাল কোন কোন লোক জুতা পরিহিত অবস্থায় জানাযার নামায পড়ে; তাদের এটা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যে স্থানে তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে স্থানটি ও পায়ের জুতা উভয়টি পাক হতে হবে। আর যদি পা থেকে জুতা খুলে জুতার উপর দাঁড়ায় তবে শুধু জুতা পাক হওয়াই আবশ্যক। অনেকে এর প্রতি লক্ষ্য রাখে না। ফলে (জুতা নাপাক থাকার কারণে) তাদের নামায শুদ্ধ হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার শর্তগুলো মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত

এরূপ শর্ত ৬টি ঃ

১ম শর্ত ঃ মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া। অতএব কাফের ও মুরতাদের জানাযার নামায পড়া শুদ্ধ নয়। মুসলমান যদি ফাসিক বা বিদআতী হয় তবু তার জানাযার নামায পড়া শুদ্ধ। কিন্তু যারা মুসলমান ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা ডাকাতি করে তারা যদি লড়াইয়ের সময় মারা যায়, তবে তাদের জানাযার নামায পড়া যাবে না। আর যদি লড়াইয়ে পরে বা স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায়, তবে তাদের জানাযার নামায পড়া হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের পিতা বা মাতাকে হত্যা করে এবং সে জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তার জানাযার নামাযও পড়া যাবে না। এ ধরনের লোকের জানাযার নামায শাসনস্বরূপ পড়া হয় না। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, বিশুদ্ধ অভিমত মুতাবিক, তার জানাযার নামায পড়া জায়েয।

৪. মাসআলা ঃ যে নাবালেগ ছেলের পিতা বা মাতা মুসলমান সে ছেলেও মুসলমান ধর্তব্য হবে এবং (সে মারা গেলে) তার জানাযার নামায পড়া হবে।

৫. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি বলতে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যে জীবিত জন্ম গ্রহণ করার পর মারা গেছে। আর যদি সন্তান মৃত অবস্থায় জন্মে তবে তার জানাযার নামায পড়া যাবে না।

২য় শর্ত ঃ মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাফন প্রকৃত নাপাকী ও বিধানগত নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। অবশ্য (কাফন পরানোর পর) যদি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কোন প্রকৃত নাপাকী বের হয় এবং এ কারণে মৃত ব্যক্তির শরীর একেবারে নাপাক হয়ে যায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এমতাবস্থায় তার জানাযার নামায পড়া শুদ্ধ হবে।

৬. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তি যদি বিধানগত নাপাকী থেকে পবিত্র না থাকে অর্থাৎ, তাকে গোসল দেওয়া না হয় অথবা গোসল দেওয়া অসম্ভব হলে, বিকল্প হিসাবে তায়াম্মুমও করানো না হয়, তবে তার জানাযার নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র করা সম্ভব না হয়, যেমন ঃ কাউকে গোসল বা তায়াম্মুম ব্যতিরেকে দাফন করে ফেলা হয়েছে এবং কবরে মাটিও দেওয়া হয়ে গেছে তখন তার জানাযার নামায সে অবস্থায় তার কবরের উপর পড়া জায়েয। কোন মৃত ব্যক্তিকে যদি গোসল বা তায়াম্মুম করানো ব্যতিরেকে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তাকে এভাবে দাফন করে ফেলা হয়, দাফনের পর মনে পড়ে যে, তাকে গোসল দেওয়া হয় নি তবে পুনরায় কবরের উপর তার জানাযার নামায পড়তে হবে। কেননা তার পূর্বের নামায শুদ্ধ হয় নি। এখন যেহেতু গোসল দেওয়া সম্ভব নয় তাই এখন নামায শুদ্ধ হবে।

৭. মাসআলা ঃ কোন মুসলমানকে যদি জানাযার নামায না পড়ে দাফন করে ফেলা হয়, তবে তার লাশ যে পর্যন্ত না ফাটে সে পর্যন্ত তার কবরের উপর তার জানাযার নামায পড়তে হবে। যখন ধারণা হয় যে, লাশ ফেটে গেছে তখন আর (কবরের উপরেও) জানাযার নামায পড়া যাবে না। লাশ ফাটার সময় সীমা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এর নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেউ এজন্য তিন দিন, কেউ দশ দিন, আবার কেউ এক মাস সময় ধার্য করেছেন।

৮. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে যদি কোন পাক চৌকি বা খাটলিতে রাখা হয়,, তবে যেখানে সে চৌকি বা খাটলি রাখা হয়েছে সে জায়গাটি পাক হওয়া শর্ত নয়। যদি চৌকি বা খাটলিও নাপাক হয় অথবা মৃত ব্যক্তির লাশকে কোন চৌকি বা খাটলি ব্যতিরেকে নাপাক মাটিতে রাখা হয়, তবে এক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, লাশ রাখার জায়গাটি পাক হওয়া শর্ত। সুতরাং এমতাবস্থায় তার জানাযার নামায শুদ্ধ হবে না। আবার কারও মতে, লাশ রাখার জায়গা পাক হওয়া শর্ত নয়। কাজেই এভাবে জানাযার নামায পড়া হলে নামায শুদ্ধ হবে।

৩য় শর্ত ঃ মৃত ব্যক্তির সতর ঢাকা থাকা। সুতরাং মৃত ব্যক্তির শরীর যদি সম্পূর্ণ বিবসন অবস্থায় থাকে, তবে তার জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়।

৪র্থ শর্ত ঃ লাশ নামাযীদের সামনে থাকা। অতএব লাশ যদি নামাযীদের পেছনে থাকে, তবে জানাযার নামায শুদ্ধ হবে না।

৫ম শর্ত ঃ লাশ যে চৌকি বা খাটলির উপর রাখা হয়েছে, সেটি মাটিতে থাকা। লোকেরা লাশ যদি নিজেদের হাতের উপর তুলে রাখে অথবা কোন গাড়ি বা জন্তুর উপর রাখা থাকে এবং সে অবস্থায় তার জানাযার নামায পড়া হয়, তবে নামায শুদ্ধ হবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ জানাযার নামাযের স্থলে লাশ বিদ্যমান থাকা। অতএব, যদি লাশ নামাযীদের নিকটে বিদ্যমান না থাকে, তবে নামায শুদ্ধ হবে না।

৯. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে দু'টি ফরয। এক চারবার আল্লাহু আকবার বলা। জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর অন্য নামাযের চারটি রাকআতের মত।[১] দুই. কিয়াম অর্থাৎ, দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া, যেমন ঃ অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব নামাযে দাঁড়ানো ফরয। সুতরাং কোন ওযর ব্যতিরেকে এটা তরক করা জায়েয হবে না। ওযরের বর্ণনা ইতঃপুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে রুকূ, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদি নেই।

১১. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে তিনটি বিষয় সুন্নত ঃ (১) প্রথম তাকবীরের পর সানা পড়া, (২) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পড়া, (৩) তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা।

জানাযার নামাযে জামাআত শর্ত নয়। অতঃএব, যদি মাত্র একজন লোক জানাযার নামায পড়ে তবু জানাযার নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা, বালেগ হোক বা নাবালেগ।

১২. মাসআলা ঃ কিন্তু জানাযার নামাযে জামাআতের প্রয়োজন বেশি। কেননা, জানাযার নামায মূলতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ। কিছু লোক একত্র হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলে আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়া ও দু'আ কবূল হওয়ার ব্যাপারে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।

১৩. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের সুন্নতসম্মত ও পছন্দনীয় তরীকা হল এই যে, লাশকে সামনে রেখে ইমাম তার বক্ষ বরাবর দাঁড়াবে এবং সবাই এ নিয়্যত করবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَدُعَاءً لِلْمَيِّتِ

(অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আস্বরূপ জানাযার নামায পড়ার নিয়্যত করছি।)

এ নিয়্যত করতঃ তাকবীরে তাহরীমার মত করে উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলবে এবং একবার "আল্লাহু আকবার" বলে উভয় হাত নামাযের মত করে বাঁধবে। তারপর পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

---

১. অর্থাৎ অন্য নামাযের রাকআত যেমনটি পূর্ণ করা আবশ্যক, তেমনি জানাযার নামাযের তাকবীরগুলো পূর্ণ করা আবশ্যক। জানাযার নামাযের রুকন দু'টি তাকবীর ও কিয়াম।

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা দ্বারা শুরু করছি, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মাহাত্ম্য সমুন্নত, আপনার প্রশংসা মহান। আপনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই।)

এরপর দ্বিতীয়বার "আল্লাহ আকবার" বলবে কিন্তু এবার হাত তুলবে না। তারপর দরূদ শরীফ পড়বে। নিম্নের এ দরূদ শরীফটি পড়া উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা.) ও মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন অপনি ইবরাহীম (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসতি ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা.) ও মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার পরিজেনের প্রতি বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।)

এরপর তৃতীয়বার "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং এবারও হাত তুলবে না। এ তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে। মৃত ব্যক্তি যদি বালেগ হয়, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা, তবে নিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا- اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সকলের গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে আপনি জীবিত রাখেন, ইসলামের অনুসারীরূপে জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্যে যাকে আপনি মৃত্যু দান করেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন।)

কোন হাদীসে নিম্নের দু'আটিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَ وَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرْدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ـ

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন তার প্রতি দয়া করুন, তাকে শান্তি দান করুন, তার অপরাধসমূহ মোচন করে দিন, তার সাদর আতিথ্য করুন, তার প্রবেশস্থল (কবর) প্রশস্ত করে দিন, তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি-শিলা দ্বারা বিধৌত করুন (অর্থাৎ, তাকে তার গুনাহ-খাতা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিন।) এবং তাকে তার সকল গুনাহ-খাতা থেকে এভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার দুনিয়ার আবাস গৃহের বদলে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতম আবাসগৃহ, তার দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উৎকৃষ্টতম পরিবার এবং তার দুনিয়ার জীবন-সঙ্গিনীর তুলনায় উৎকৃষ্টতমা জীবন-সঙ্গিনী দান করুন, তাকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।)

(উপরিউক্ত দু'টি দু'আর যে কোন একটি পড়লেই চলবে।) কিন্তু যদি উভয় দু'আই পড়া হয়, তাও ভাল। আল্লামা শামী এ দু'টি দু'আকে একত্র করে লিখেছেন। এ দু'টি দু'আ ব্যতীত আরও অন্যান্য দু'আ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সে সকল দু'আ আমাদের ফিকাহবিদগণও উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে যে দু'আ ইচ্ছা পড়তে পারে।

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগ ছেলে হয় তবে এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا ـ

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তাকে আমাদের অগ্রিম সওগাতরূপে গ্রহণ করুন, তাকে আমাদের জন্য উত্তম প্রতিদানে পরিণত করুন, আমাদের পরকালের সম্বল করুন, তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী করুন এবং এমন করুন যার সুপারিশ গৃহীত হয়।)

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগা মেয়ে হয় তখনও এ দু'আই পড়বে। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, যেখানে যেখানে اِجْعَلْهُ রয়েছে, সেখানে اِجْعَلْهَا পড়বে এবং

شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا -এর স্থলে شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً বলবে। এ দু'আটি পড়া শেষ করে চতুর্থবার "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং এবারও হাত তুলবে না। এ তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলবে, যেমনটি নামাযে সালাম ফেরানো হয়। জানাযার নামাযে আত্তাহিয়্যাতু বা কুরআন পাঠ ইত্যাদি নেই।

১৪. মাসআলা ঃ জানাযার নামায ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য একই রূপ, কেবল এটুকু পার্থক্য যে, ইমাম সালাম ও তাকবীরগুলো উঁচু আওয়াজে বলবে এবং মুক্তাদী নিচু আওয়াজে বলবে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়, যেমন ঃ সানা, দরূদ ও দু'আ, মুক্তাদীও নিঃশব্দে পড়বে এবং ইমামও নিঃশব্দে পড়বে।

১৫. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে উপস্থিত লোকজনকে ন্যূনতম তিন সারিতে বিভক্ত করে দেওয়া মুসতাহাব। এমন কি, যদি কেবল সাতজন মানুষ হয়, তবে তাদের একজনকে ইমাম বানাবে, তারপর প্রথম সারিতে তিনজন দাঁড়াবে, দ্বিতীয় সারিতে দু'জন দাঁড়াবে এবং তৃতীয় সারিতে একজন দাঁড়াবে।

১৬. মাসআলা ঃ যে সকল কারণে অন্যান্য নামায নষ্ট হয়ে যায় সে সকল কারণে জানাযার নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। কেবল এটুকু পার্থক্য আছে যে, জানাযার নামাযে খিলখিলিয়ে হাসলেও ওযূ নষ্ট হয় না এবং মহিলার বরাবরে দাঁড়ানোর কারণেও জানাযার নামায নষ্ট হয় না।

১৭. মাসআলা ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা জুমুআ বা দুই ঈদের নামাযের জন্য নির্মিত মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী, চাই লাশ মসজিদের ভেতরে থাকুক বা মসজিদের বাইরে; যদি নামাযীরা মসজিদের ভেতরে থাকে। অবশ্য যে মসজিদ শুধু জানাযার নামাযের জন্য নির্মাণ করা হয় সেখানে মাকরূহ নয়।

১৮. মাসআলা ঃ জামাআত বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে জানাযার নামায পড়তে বিলম্ব করা মাকরূহ।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ওযর না থাকলে জানাযার নামায বসে বসে বা সওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় পড়া জায়েয নয়।

২০. মাসআলা ঃ যদি এক সময় একাধিক জানাযা একত্র হয়, তবে প্রত্যেকের জানাযার নামায পৃথক পৃথক পড়া উত্তম। যদি সকলের জানাযার নামায একত্রে একবার হয় তবে তাও জায়েয। যদি সকলের জানাযার নামায একত্রে পড়ার ইচ্ছা হয়, তবে সবগুলো লাশকে সারি করে রাখবে। সারি করে রাখার সব চেয়ে উত্তম পদ্ধতি হল এই যে, একটি লাশের পরে আরেকটি লাশ এভাবে রাখবে, যাতে সবার পা এক দিকে থাকে এবং সবার মাথা অপর দিকে। এ পদ্ধতিটি উত্তম হওয়ার কারণ এই যে, এতে ইমাম একসাথে সবার বক্ষ বরাবর দাঁড়াতে সক্ষম হবে। আর এভাবে বক্ষ বরাবর দাড়ানো সুন্নত।

২২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি জানাযার নামাযে এমন সময় পৌঁছে যখন নামাযের কিছু তাকবীর হয়ে যায় তবে যে তাকবীরগুলো হয়ে গেল সেগুলোর হিসাবে সে মাসবূক ধর্তব্য হবে। এ ক্ষেত্রে সে এসেই অন্যান্য নামাযের মত তাকবীরে তাহরীমা বলে তৎক্ষণাৎ জানাযার নামাযে শরীক হয়ে যাবে না, বরং সে ইমামের পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করবে। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তখন সেও তাকবীর বলে নামাযে শরীক হবে। এ তাকবীরটি তার জন্য তাকবীরের তাহরীমা হিসাবে ধর্তব্য হবে। এরপর ইমাম যখন সালাম ফিরিয়ে ফেলবে, তখন সে তার ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো আদায় করে নেবে। এ তাকবীরগুলো বলার সময় তার কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই।

আর যদি কেউ এমন সময় এসে পৌঁছে যখন ইমাম ৪র্থ তাকবীরও বলে ফেলেছে, তখন সে উক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রে মাসবূক ধর্তব্য হবে না। সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ তাকবীর বলে ইমামের সালামের পূর্বে নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং নামায শেষ হওয়ার পর তার ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো আদায় করে নেবে।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ প্রথম তাকবীর বা অন্য কোন তাকবীরের সময় উপস্থিত থেকে থাকে, কিন্তু অলসতা বা অন্য কোন কারণে নামাযে শরীক হয় নি, তবে সে তৎক্ষণাৎ তাকবীর বলে নামাযে শরীক হয়ে যাবে। ইমামের পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করা তার জন্য উচিত নয় এবং সে যে তাকবীরটির সময় উপস্থিত ছিল, (কিন্তু শরীক হয় নি) সে তাকবীরটি, ইমামের পরবর্তী তাকবীর বলার পূর্বেই আদায করে নেওয়া তার উপর অপরিহার্য; যদিও এতে ইমামের সাহচর্য তার লাভ হয় বটে।

২৪. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের মাসবূক যখন তার ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো আদায় করবে তখন যদি তার এ আশঙ্কা হয় যে, দু'আগুলো পড়তে গেলে বিলম্ব হয়ে যাবে এবং লাশ সন্মুখ থেকে তুলে নেওয়া হবে তবে দু'আ পড়বে না।

২৫. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে যদি কোন ব্যক্তি লাহেক হয়ে যায় তবে তার বিধানও অন্যান্য নামাযের লাহেকের মতই।

২৬. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে ইমামতির অধিকার সর্বপ্রথমে দেশের মুসলিম প্রধানের; যদিও তাক্ওয়া ও পরহেযগারীতে তার চেয়ে ভাল লোক সেখানে বিদ্যমান থাকে। দেশের মুসলিম রাষ্টপ্রধান যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে তবে তার প্রতিনিধি। অর্থাৎ যিনি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে শহরের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত রয়েছেন তিনি ইমামতির জন্য অধিকার প্রাপ্ত; যদিও তাকওয়া ও পরহেযগারীতে তার চেয়ে উত্তম লোক সেখানে বিদ্যমান থাকে। তিনিও যদি না থাকেন তবে শহরের প্রধান বিচারক, আর তিনি না থাকলে তাঁর

সহকারী ইমামতি করবেন। উপরিউক্ত লোকদের কারও উপস্থিতিতে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে ইমাম বানানো জায়েয নয়। তাদেরকেই ইমাম বানানো ওয়াজিব। যদি তাদের কেউ সেখানে বিদ্যমান না থাকে, তবে সে মহল্লার ইমাম ইমামতির জন্য অধিকারপ্রাপ্ত, যদি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি না থাকে। আর যদি থাকে তবে সেই আত্মীয়দের থেকে যারা মৃত ব্যক্তির অভিভাবক কেউ ইমামতির জন্য অধিকারপ্রাপ্ত হবে, অথবা তাদের যাকে তারা অনুমতি দেয়। মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি এমন কেউ জানাযার নামায পড়িয়ে ফেলে, যার ইমামতি করার অধিকার নেই তবে সে অভিভাবক ইচ্ছা করলে পুনরায় নামায পড়তে পারবে। এমনকি, যদি মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফেলা হয় তবে সে কবরের উপরেও জানাযার নামায পড়তে পারে, যতদিন পর্যন্ত লাশ ফেটে যাওয়ার ধারণা না হয়।

২৭. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরকে যদি এমন কোন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়িয়ে ফেলে, যার ইমামতি করার অধিকার রয়েছে তবে মৃত ব্যক্তির অভিভাবক পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে না তদ্রূপ দেশের মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান বা তার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় মৃত ব্যক্তির অভিভাবক যদি জানাযার নামায পড়িয়ে ফেলে তবে সেই রাষ্ট্র-প্রধান বা তার কোন প্রতিনিধি পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে না। বরং সঠিক অভিমত মুতাবিক, যদি ব্যক্তির অভিভাবক দেশের মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতেই নামায পড়ে নেয় তবু সেই রাষ্ট্র-প্রধান বা তার প্রতিনিধি পুনরায় জানাযার নামায পড়ার ইখতিয়ার পাবে না। যদিও এমতাবস্থায় দেশের মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধানকে ইমাম না বানানোর কারণে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকরা ওয়াজিব তরক করার গুনাহগার হবে। সারকথা এই যে, একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়। তবে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে, এক্ষেত্রে ইমামতির অধিকার রাখে না, এমন কোন লোক জানাযার নামায পড়িয়ে ফেললে তখন মৃত ব্যক্তির অভিভাবক পুনরায় পড়তে পারবে।

দাফনের মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কিফায়া, যেরূপ তাকে গোসল দেওয়া ও তার জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া।

২. মাসআলা ঃ জানাযার নামায শেষ হওয়া মাত্রই তাকে দাফন করার জন্য কবরস্থানে নিয়ে যাবে।

৩. মৃতজন যদি কোন দুধের শিশু বা তার চেয়ে কিছু বড় হয়, তবে তাকে লোকেরা হাতে করে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ, একজন তাকে তার দু'হাতে তুলে নেবে। তারপর তার থেকে অন্যজন নেবে। এভাবে পরিবর্তন করতে করতে নিয়ে যাবে।

আর মৃত ব্যক্তি যদি বয়স্ক হয়, তবে তাকে কোন চৌকি বা খাটলিতে রেখে নিয়ে যাবে। এক একজন করে চার জন খাটলির চার পায়া ধরবে। লাশের খাটলি হাত দ্বারা তুলে কাঁধের উপর রাখবে। অন্যান্য মালপত্রের মত লাশকে (সরাসরি) কাঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। এমনিভাবে কোন ওযর ব্যতিরেকে বাহন জন্তু বা গাড়ি ইত্যাদিতে করে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। ওযর থাকলে, যেমনঃ করবস্থান যদি অনেক দূর হয়, তবে জায়েয হবে– মাকরূহ হবে না।

৪. লাশের খাটলি বহন করার মুসতাহাব তরীকা এই যে, প্রথমে এক ব্যক্তি খাটলির সামনের ডান পার্শ্বের পায়া নিজ কাঁধে নিয়ে কমপক্ষে দশ কদম হাঁটবে, তারপর খাটলির পায়ের দিকের ডান পায়া কাঁধে নিয়ে কমপক্ষে দশ কদম হাঁটবে। এরপর সামনের বাম পায়া বাম কাঁধে নিয়ে দশ কদম, তারপর পায়ের দিকের বাম পায়া বাম কাঁধে নিয়ে কমপক্ষে দশ কদম হাঁটবে। যাতে চার পায়া মিলিয়ে মোট চল্লিশ কদম হয়।[১]

৫. মাসআলা ঃ জানাযা কিছুটা দ্রুত গতিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া সুন্নত। তবে এত দ্রুত চলবে না, যাতে লাশ নড়তে থাকে।

৬. মাসআলা ঃ জানাযার সাথে যারা যায়, জানাযা কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে তাদের বসা মাকরূহ। অবশ্য প্রয়োজন বশতঃ বসলে কোন অসুবিধা নেই।

৭. মাসআলা ঃ যারা জানাযার সাথে যায় নি বরং এমনিতে কোথাও বসে আছে, জানাযা দেখে তাদের দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৮. মাসআলা ঃ যারা জানাযার সাথে যায়,তাদের জানাযার পেছনে পেছনে হাঁটা মুসতাহাব। যদিও জানাযার আগে যাওয়াও জায়েয আছে বটে। অবশ্য সবাই যদি জানাযার আগে চলে যায় তবে তা মাকরূহ। এমনিভাবে জানাযার আগে কোন বাহনে আরোহণ করে যাওয়াও মাকরূহ।

৯. মাসআলা ঃ জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুসতাহাব। যদি কোন বাহনে আরোহী হয়, তবে জানাযার পেছনে পেছনে যাবে।

১০. মাসআলা ঃ যারা জানাযার সাথে যাবে, তাদের উঁচু আওয়াজে কোন দু'আ বা যিক্‌র করা মাকরূহ। কবরের গভীরতা কম পক্ষে মৃত ব্যক্তির অর্ধেক হওয়া চাই। তবে লাশের সম্পূর্ণ কদের চেয়ে বেশি গভীর হওয়া উচিত নয় এবং কবর দৈর্ঘ্যে লাশের কদের সমান হতে হবে। বগলী কবর সিন্দুকী কবরের চেয়ে উত্তম। অবশ্য মাটি যদি বেশি নরম হয়, যার কারণে বগলী কবর খনন করলে কবর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তবে বগলী কবর খনন করবে না।

১১. মাসআলা ঃ এও জায়েয আছে যে, যদি বগলী কবর করতে না পারে তবে লাশকে কোন সিন্দুকে ভরে দাফন করতে পারে। চাই সিন্দুক গাছের হোক বা পাথরের হোক, তবে উত্তম হল, সিন্দুকের ভেতরে মাটি বিছিয়ে দেওয়া।

---

১. অর্থাৎ, খাটলি বহনকারী চারজনের প্রত্যেকের যাতে চল্লিশ কদম করে হয়।

১২. মাসআলা ঃ কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে লাশকে কেবলার দিক থেকে কবরে নামাবে। লাশ কবরে নামাবার পদ্ধতি হবে এই যে, লাশটি কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রাখবে। যারা নামাবে তারা (কবরে নেমে) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে লাশটিকে হাতে তুলে কবরে রাখবে।

১৩. মাসআলা ঃ যারা লাশ কবরে নামাবে তাদের সংখ্যা জোড় বা বেজোড় হওয়া সুন্নত নয়। নবী (সা.)-কে তাঁর কবর শরীফে চারজন নামিয়েছিলেন।

১৪. মাসআলা ঃ কবরে রাখার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলা মুসতাহাব।

১৫. মাসআলা ঃ লাশ কবরে রেখে ডান কাতে কেবলামুখী করে দেওয়া সুন্নত।

১৬. মাসআলা ঃ কবরে রাখার পর, কাফন খুলে যাওয়ার আশঙ্কায় কাফনে যে গিটগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো খুলে দেবে।

১৭. মাসআলা ঃ তারপর কাঁচা ইট বা বাঁশ দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করে দেবে। পাকা ইট বা কাঠের রদ্দা দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করা মাকরূহ। অবশ্য মাটি যদি বেশি নরম হয়, যার কারণে কবর বসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে পাকা ইট বা কাঠের রদ্দা দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করা বা লাশ সিন্দুকে রেখে দাফন করাও জায়েয।

১৮. মাসআলা ঃ মহিলার লাশকে কবরে রাখার সময় পর্দা সহকারে রাখা মুসতাহাব। আর যদি কাফন খুলে যেয়ে লাশের শরীর দেখা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে পর্দা করা ওয়াজিব।

১৯. মাসআলা ঃ পুরুষকে দাফন করার সময় কবরের উপর পর্দা করবে না। অবশ্য যদি কোন ওযর থাকে, যেমন ঃ বৃষ্টি হচ্ছে বা বরফ পড়ছে বা রৌদ্র প্রখর থাকে, তবে পর্দা টানানো জায়েয।

২০. মাসআলা ঃ কবর খনন করার পর কবর থেকে যে মাটিগুলো বের হয়, সবগুলো মাটি মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর সেই কবরে দিয়ে দেবে। তা ছাড়া অতিরিক্ত মাটি দিয়ে কবর এক বিঘতের চেয়ে বেশি উঁচু করা মাকরূহ। আর যদি উঁচু এক বিঘতের চেয়ে বেশি না হয়; বরং কম হয় তবে মাকরূহ নয়।

২১. মাসআলা ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় মাথার দিক থেকে শুরু করা মুসতাহাব। প্রত্যেকে দুই হাতে মাটি নিয়ে কবরে দেবে। প্রথম মুঠি দেওয়ার সময় বলবে ঃ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয় মুঠি দেওয়ার সময় বলবে ঃ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং তৃতীয় মুঠি দেওয়ার সময় বলবে ঃ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

২২. মাসআলা ঃ দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের পার্শ্বে দাঁড়ানো এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা বা কুরআন পাকের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে তার ছওয়াব পৌঁছে দেওয়া মুসতাহাব।

২৩. মাসআলা ঃ মাটি দেওয়ার পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া মাকরূহ।

২৪. মাসআলা ঃ কোন মৃত ব্যক্তিকে, চাই সে ছোট শিশু হোক বা বয়স্ক ব্যক্তি, ঘরের ভেতরে দাফন করা মাকরূহ। কেননা, এটা আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য বিশেষ বিধান।

২৫. মাসআলা ঃ কবরের উপরের অংশ চতুষ্কোণ করা মাকরূহ। উটের পিঠের মত কিছুটা উঁচু করে বানানো মুসতাহাব। তার উচ্চতা এক বিঘত বা তার চেয়ে একটু বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২৬. মাসআলা ঃ কবরকে এক বিঘতের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু করা মাকরূহ তাহরীমী। কবরে চুনকাম করা বা লেপা মাকরূহ।

২৭. মাসআলা ঃ দাফন করার পর কবরের উপর সৌন্দর্যের জন্য গুম্বজ বা পাকা ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা হারাম এবং কবরকে মজবুত করার নিয়্যতে করা মাকরূহ। মৃত ব্যক্তির কবরের উপর স্মারক স্বরূপ কিছু লিখে রাখার প্রয়োজন হলে তবে লিখে রাখা জায়েয।[১] নতুবা জায়েয নয়। কিন্তু এ যুগে যেহেতু সর্বসাধারণ লোকজন তাদের আকীদা ও আমল অত্যন্ত খারাব করে ফেলেছে এবং এরূপ ক্ষতির বিবেচনায় মুবাহ বিষয়ও না জায়েয হয়ে যায়, তাই এ সব কাজ সম্পূর্ণরূপে না জায়েয হবে। লোকেরা এ ব্যাপারে যে সকল প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে থাকে সবই প্রবৃত্তির ছলনা মাত্র, যা তারা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করে।

শহীদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

শহীদ যদিও বাহ্যত ঃ মৃতই, কিন্তু অন্য সাধারণ মৃতদের সকল বিধি-বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া শহীদের মর্যাদাও অন্যান্য মৃতের তুলনায় অনেক বেশি। এ কারণে শহীদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পৃথকভাবে বর্ণনা করা সমীচীন মনে হল। শহীদদের অনেক প্রকারভেদ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলিম এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে শহীদদের সকল প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে শহীদ সংক্রান্ত যে সকল বিধি-বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা শুধু এমন শহীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কতিপয় শর্ত পাওয়া যায় ঃ

---

১. কবরের উপর কিছু লেখার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

১ম শর্ত ঃ মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিম ব্যক্তি শহীদ হতে পারে না।

২য় শর্ত ঃ শরীয়তের বিধান আরোপিত হয় এমন ব্যক্তি অর্থাৎ, সজ্ঞান ও বালেগ হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি উন্মাদ বা মাতাল অবস্থায় বা বালেগ হওয়ার পূর্বে নিহত হয়, তার জন্য শহীদের এ সকল বিধি-বিধান প্রযোজ্য নয়, যেগুলো আমরা সামনে আলোচনা করব।

৩য় শর্ত ঃ বড় হাদাছ (অর্থাৎ গোসলের প্রয়োজন) থেকে পাক হওয়া। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি জানাবাতের অবস্থায় বা কোন মহিলা যদি হায়েয-নেফাস অবস্থায় শহীদ হয়, তবে তার জন্যও এখানে বর্ণিত শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৪র্থ শর্ত ঃ কোন অপরাধ ব্যতিরেকে নিহত হওয়া। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নিহত না হয়; বরং শরীয়ত মুতাবিক কোন নিরপরাধ অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়, অথবা হত্যাই করা হয় নি; বরং এমনিতেই মৃত্যু হয়েছে। তবে তার জন্য শহীদের এ সকল বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৫ম শর্ত ঃ যদি কেউ কোন মুসলমান বা যিম্মীর হাতে নিহত হয়, তবে তার কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা নিহত হওয়াও শর্ত। অতএব, কোন মুসলমান বা যিম্মীর হাতে যদি কেউ কোন ধারবিহীন অস্ত্র দ্বারা নিহত হয়, যেমন ঃ কোন পাথর ইত্যাদির আঘাতে মারা যায়, তবে তার জন্য শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু লোহা যে ধরনেরই হোক, ধারাল অস্ত্রের শামিল, যদিও তাতে ধার না থাকে। আর যদি কেউ কোন অমুসলিম দেশের কাফের বা রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাতের হাতে নিহত হয় অথবা তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তার জন্য ধারাল অস্ত্র দ্বারা নিহত হওয়া শর্ত নয়। অতএব, যদি তারা কোন পাথর ইত্যাদিও নিক্ষেপ করে এবং তাতে কোন মুসলমান মারা যায়, তবে তার জন্য শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। এমন কি তাদের নিজ হাতে মারাও শর্ত নয়; বরং তারা যদি হত্যার কার্যকারণ হয় অর্থাৎ, তাদের থেকে এমন কার্যকলাপ প্রকাশ পায়, যার কারণে কোন মুসলমান নিহত হয় তবু তার জন্য শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ঃ

১. যার সাথে যুদ্ধ করার শরীয়তের বিধান রয়েছে, এমন কোন কাফের যদি তার বাহন জন্তু দ্বারা কোন মুসলমানকে নিষ্পেষিত করে এবং সে কাফির তার বাহন জন্তুর পিঠে আরোহী থাকে।

২. কোন মুসলমান কোন জন্তুর পিঠে আরোহী ছিল এবং সে জন্তুটিকে এমন কোন কাফের তাড়া করল, যার সাথে যুদ্ধ বৈধ ফলে সে মুসলমান উক্ত জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে মারা গেল।

৩. যার সাথে যুদ্ধ করা শরীয়ত সম্মত, এমন কোন কাফের যদি কোন মুসলমানের বাড়িতে বা জাহাজে অগ্নি সংযোগ করে, ফলে মুসলমান আগুনে পুড়ে মারা যায়।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ হত্যার সাজাস্বরূপ হত্যাকারীর উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রথমে আর্থিক বিনিময় ধার্য না হওয়া; বরং কিসাস ওয়াজিব হওয়া চাই। অতএব যদি সেই হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর আর্থিক বিনিময় ধার্য হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও সেই নিহত ব্যক্তির উপর শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না, যদিও সে জুলুমের শিকার হয়ে মারা যায় বটে।

উদাহরণ ঃ

১. কাউকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে জুলুম করে কিন্তু হত্যাকারী ও নিহতদের ওয়ারিসদের মধ্যে কিছু মালের বিনিময়ে সন্ধি হয়ে গেল, তবে এক্ষেত্রে যেহেতু প্রথমে কিসাস ওয়াজিব হয়েছিল এবং প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নি; বরং সন্ধির কারণে ওয়াজিব হয়েছিল, কাজেই এক্ষেত্রে শহীদের বিধি-বিধান আরোপিত হবে।

২. কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা হত্যা করল বটে, তবে ভুলবশতঃ, যেমন ঃ কোন জন্তু বা কোন লক্ষস্থলে আঘাত করছে, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন মুসলমানের গায়ে পড়ে সে মারা গেল।

৩. যুদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও কাউকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল এবং তার হত্যাকারী কে? এ সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না।

এ সকল ক্ষেত্রে যেহেতু হত্যার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, কিসাস ওয়াজিব হয় না, তাই এখানে নিহত ব্যক্তির উপর শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না। বিনিময় নির্ধারণের ব্যাপারে "প্রথম অবস্থা"র শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, যদি প্রথমে কিসাস ধার্য হয়, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে কিসাস মাফ হয়ে তার পরিবর্তে মাল ওয়াজিব হয়, তবে সে ক্ষেত্রে শহীদের বিধি-বিধান আরোপিত হবে।

২. কোন পিতা নিজের ছেলেকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে ফেলল, এমতাবস্থায় প্রথমে কিসাসই ওয়াজিব হয়েছিল, প্রথমে মাল ওয়াজিব হয়নি, কিন্তু পিতার সম্মান ও মর্যাদার কারণে কিসাস মাফ হয়ে তার পরিবর্তে মাল ওয়াজিব হল। সুতরাং এখানেও শহীদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

৭ম শর্ত ঃ আহত হওয়ার পর কোন আরামদায়ক বা জীবনোপভোগমূলক কাজ, যেমন ঃ খাওয়া, পান করা, চিকিৎসা করা, বেচা-কেনা ইত্যাদি তার কাছ থেকে প্রকাশ না পাওয়া চাই এবং এক ওয়াক্ত নামাযের সমপরিমাণ সময় হুঁশ ও

জ্ঞান অবস্থায় তার জীবন অতিবাহিত না হওয়া চাই এবং হুঁশ থাকা অবস্থায় তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তুলে আনা না চাই। অবশ্য যদি জীব-জন্তুর পদ তলে দলিত-মথিত হওয়ার আশঙ্কায় তুলে আনা হলে তাতে কোন আপত্তি নেই। অতএব, আহত হওয়ার পর কেউ যদি কথাবার্তা বেশি বলে, তবে সেও শহীদের বিধি-বিধানের শামিল হবে না। কেননা, কথাবার্তা বেশি বলা জীবিতদেরই স্বাভাবিক অবস্থা। এমনিভাবে কেউ যদি কোন ওসিয়ত করে এবং সে ওসিয়ত যদি কোন দুনিয়াবী বিষয়ে হয়ে থাকে, তবে সেও শহীদের বিধান থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে। আর যদি ওসিয়ত কোন দীনী বিষয়ে হয়, তবে সে শহীদের বিধানের বহির্ভূত হবে না।

যদি কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয় এবং তার থেকে এ সকল বিষয় প্রকাশ পায় তবে সে শহীদের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। আর যদি তার থেকে এ সব বিষয় প্রকাশ না পায়, তবে সে শহীদের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু এ ব্যক্তি যদি যুদ্ধ চলাকালে মারা যায় অথচ যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নি, তবে উপরিউক্ত জীবনোপকরণগুলো উপভোগ করার পরও সে শহীদ।

১. মাসআলা ঃ যে শহীদের মধ্যে উপরিউক্ত সকল শর্ত পাওয়া যায় তার ব্যাপারে একটি বিধান এই যে, তাকে গোসল দেবে না এবং তার শরীর থেকে রক্ত পরিষ্কার করবে না। এভাবে রক্তাক্ত শরীর সহকারেই তাকে দাফন করে ফেলবে। দ্বিতীয় বিধান হল এই যে, যে সকল পোশাক তার পরিধানে ছিল সেগুলো তার শরীর থেকে খুলবে না। অবশ্য তার গায়ের কাপড়গুলো যদি সুন্নতসম্মত কাফনের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে কাফনের সুন্নত সম্মত সংখ্যা পূরণের জন্য আরও কাপড় যোগ করে দেবে। এমনিভাবে তার গায়ের কাপড় যদি সুন্নতসম্মত কাফনের চেয়ে বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত কাপড় খুলে ফেলবে।

তার গায়ে যদি এমন কোন পোশাক থাকে যা কাফন হওয়ার উপযোগী নয়, যেমন ঃ চামড়ার পোশাক ইত্যাদি, তবে তা খুলে ফেলবে। অবশ্য যদি চামড়ার পোশাক ছাড়া অন্য কোন কাপড় তার শরীরে না থাকে, তবে তাও খুলবে না। টুপি, জুতা, অস্ত্র ইত্যাদি সর্বাবস্থায় খুলে ফেলবে। বাকি সকল বিধি-বিধান অন্যান্য মৃতদের জন্য যেরূপ রয়েছে, শহীদের জন্যও তদ্রূপই। যেমন ঃ জানাযার নামায ইত্যাদির বিধান শহীদের ক্ষেত্রেও আরোপিত হবে।

যদি কোন শহীদের মধ্যে উপরিউক্ত শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন শর্ত না পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসলও দিতে হবে এবং অন্যান্য মৃতদের মত নতুন কাফনও পরাতে হবে।

জানাযা সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা

১. মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিবলামুখী করে রাখতে মনে না থাকে এবং মাটি দেওয়া ও দাফন সম্পন্ন করার পর স্মরণ হয়, তবে তাকে কিবলামুখী করার জন্য পুনারায় তার কবর খোলা জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন বাঁশ বা তক্তা রাখা হয় এবং তখনও মাটি দেওয়া হয় নি তবে সেই বাঁশ বা তক্তা সরিয়ে তাকে কিবলামুখী করে দেবে।

২. মাসআলা ঃ জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া মাকরূহ তাহরীমী।

৩. মাসআলা ঃ ক্রন্দনকারিণী নারী ও মৃত ব্যক্তির গুণকীর্তনকারিণী নারীদের জানাযার সাথে যাওয়া নিষিদ্ধ।

৪. মাসআলা ঃ লাশ কবরে রাখার সময় আযান দেওয়া বিদআত।

৫. মাসআলা ঃ ইমাম যদি জানাযার নামাযে চার তাকবীরের বেশি বলে তবে হানাফী মুক্তাদীগণ চার তাকবীরের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে ইমামের অনুসরণ করবে না; বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে। অবশ্য যদি চার তাকবীরের অতিরিক্ত তাকবীর ইমাম থেকে না শুনে, বরং মুকাব্বির (তাকবীর দাতা)-এর থেকে শুনে তবে মুক্তাদীরা তার তাকবীরের অনুসরণ করে তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক তাকবীরকে তাকবীরে তাহরীমা মনে করবে। এ ধারণা করবে যে, এর পূর্বে যে চারটি তাকবীর বলা হয়েছে সেগুলো মুকাব্বির হয়ত ভুলবশতঃ বলেছে। ইমাম হয়ত এখনি তাকবীরে তাহরীমা বলেছে।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ নৌযানে মারা যায় এবং সেখান থেকে স্থল এলাকা এত দূরে অবস্থিত যে, সেখানে পৌছে দাফন করতে গেলে লাশে পঁচন ধরে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে এমতাবস্থায় লাশটিকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে এবং জানাযার নামায পড়ে সমুদ্রে ছেড়ে দেবে। আর সমুদ্রের কিনারা যদি এত বেশি দূরবর্তী না হয় এবং সত্ত্বর কিনারায় পৌছার আশা থাকে, তবে লাশ রেখে দেবে এবং কিনারায় পৌছে মাটিতে দাফন করবে।

৭. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে পড়ার জন্য যে সকল দু'আ বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কোন দু'আ যদি কারও মুখস্থ না থাকে, তবে তার কেবল اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ বললেই চলবে। আর যদি তাও না পারে এবং শুধু চারটি তাকবীর বলেই যথেষ্ট করে তবু নামায হয়ে যাবে। কেননা, দু'আ ফরয নয়; বরং সুন্নত। এমনিভাবে দরূদ শরীফও ফরয নয়।

৮. মাসআলা ঃ কবরে মাটি দেওয়ার পর আবার কবর খুলে লাশ বের করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি না তোলার কারণে কোন মানুষের হক নষ্ট হয়, তবে কবর থেকে লাশ বের করা জায়েয।

উদাহরণ ঃ ১. যে জমিনে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে সেটা অন্য কারও মালিকানাভুক্ত এবং জমিনের মালিক মৃত ব্যক্তিকে সেখানে দাফন করাতে সন্তুষ্ট নয়। ২. অথবা কারও মূল্যবান কোন জিনিস কবরে থেকে যায়।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা মারা যায় এবং তার পেটে সন্তান জীবিত থাকে, তবে তার পেট কেটে সন্তান বের করে নেবে। এমনিভাবে কেউ যদি কারও মাল (অর্থাৎ, টাকা বা স্বর্ণ-রূপা) গিলে মারা যায় এবং মালের মালিক তা দাবি করে, তবে তার পেট কেটে সেই মাল বের করে নেবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি পরিত্যাক্ত সম্পদ রেখে মারা যায়, তবে তার সেই পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে তার গিলে খাওয়া মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবে এবং তার পেট কাটবে না।

১০. মাসআলা ঃ লাশ দাফন করার পূর্বে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাশ নিয়ে যাওয়া ভাল নয়, যদি দ্বিতীয় জায়গাটি এক-দু'মাইলের চেয়ে বেশি দূরবর্তী না হয়। আর যদি তার চেয়ে অধিক দূরবর্তী হয়, তবে সেখানে স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। লাশ দাফন করার পর কবর খুলে লাশ অন্যত্র নিয়ে যাওয়া (নিকটে হোক বা দূরে) কোনরূপেই জায়েয নয়।

১১. মাসআলা ঃ পদ্যে হোক বা গদ্যে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, যদি তাতে কোন রকম অতিরঞ্জন না থাকে বা মিথ্যা প্রশংসা না থাকে তবে তা জায়েয।

১২. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং ধৈর্য ধারণ করতে বলা, ধৈর্যের মাহাত্ম্য ও ছওয়াবের কথা শুনিয়ে তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের জন্য ও মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা জায়েয। এটাকে (আরবীতে) তা'যিয়াত বলে। তিন দিন পর তা'যিয়াত করা মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু তা'যিয়াতকারী বা তার আত্মীয়-স্বজন যদি সফরে থেকে থাকে এবং সফর থেকে তিন দিন পর আসে, তবে সে ক্ষেত্রে তিন দিনের পরও তা'যিয়াত করা মাকরূহ হবে না। যে একবার তা'যিয়াত করেছে তার পুনরায় তা'যিয়াত করা মাকরূহ।

১৩. মাসআলা ঃ নিজের জন্য কাফন তৈরি করে রাখা মাকরূহ নয়, তবে (নির্দিষ্ট জায়গায়) কবর প্রস্তুত করে রাখা মাকরূহ।

১৪. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর কালি ছাড়া শুধু আঙ্গুলের সাহায্যে কোন দু'আ, যেমন ঃ আহাদনামা, ইত্যাদি লিখে দেওয়া বা বক্ষের উপর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এবং কপালের উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لিখে দেওয়া জায়েয আছে। তবে কোন সহীহ হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। কাজেই এটাকে সুন্নত বা মুসতাহাব ধারণা করা উচিত নয়।

১৫. মাসআলা ঃ কবরের উপর কোন তাজা ডাল রেখে দেওয়া মুসতাহাব। মৃত ব্যক্তির কবরের উপর যদি কোন গাছপালা জন্মে তবে তা কেটে (বা উপড়ে) ফেলা মাকরূহ।

১৬. মাসআলা ঃ এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা উচিত নয়, তবে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ এরূপ করা জায়েয। যদি এরূপ করতে হয় তবে মৃতরা সবাই পুরুষ হলে যিনি তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম তাকে সবার সামনে (অর্থাৎ কিবলার দিকে) রাখবে। তারপর অন্য সবাইকে মর্যাদার ক্রমানুসারে রাখবে। আর যদি মৃতদের কিছু লোক পুরুষ ও কিছু লোক মহিলা হয়, তবে পুরুষদের লাশ সামনে রাখবে, তারপর মহিলাদেরকে রাখবে।

১৭. মাসআলা ঃ কবর যিয়ারত করা অর্থাৎ,পরিদর্শন করা পুরুষদের জন্য মুসতাহাব। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কবর যিয়ারত করা উত্তম এবং সে দিন জুমাবার হওয়া ভাল। বুযুর্গানে দীনের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাও জায়েয; যদি কোন আকীদা বা আমল শরীয়তের খেলাফ না হয়; যেমনটি আজ কাল ওরসের সময় হয়ে থাকে।

মসজিদের বিধান

এখানে মসজিদের ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এতদসংক্রান্ত আলোচনা ওয়াক্ফ অধ্যায়ে বিবৃত করা সমীচীন মনে করি। এখানে আমি কেবল নামায বা নামাযের স্থানের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখ করছি।

১. মাসআলা ঃ (মুসল্লীদের নামায পড়ার জন্য আসতে বাধা হয় এভাবে) মসজিদের দরজা বন্ধ করা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য নামাযের সময় ব্যতিরেকে অন্য সময় মাল-আসবাবের হেফাজতের জন্য দরজা বন্ধ করা জায়েয।

২. মাসআলা ঃ মসজিদের ছাদের উপর পায়খানা-পেশাব করা বা স্ত্রী সহবাস করা এমনই নিষিদ্ধ, যেমনি মসজিদের ভেতরে এসব কাজ করা নিষিদ্ধ।

৩. মাসআলা ঃ যে ঘরে নামাযের জায়গা নির্ধারিত রয়েছে সেই ঘরটি সম্পূর্ণরূপে মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে না।[১] এমনিভাবে, যে জায়গাটি দুই ঈদ বা জানাযার নামাযের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেটাও মসজিদরূপে গণ্য হবে না।

---

১. বরং কেবল যে জায়গাটুকু নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সে অংশটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। যদিও সেই নামাযের জায়গায় মসজিদের সকল বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৪. মাসআলা ঃ মসজিদের দরজা ও প্রাচীরে যদি কেউ নিজস্ব পয়সা দিয়ে কারুকার্য করে তবে তাতে কোন আপত্তি নেই।[১] তবে মিহরাবের ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে কারুকার্য করা মাকরূহ। মসজিদের (সম্পদ বা চাঁদা করা) তহবিল থেকে যদি এরূপ কারুকার্য করা হয় তবে তা না জায়েয।

৫. মাসআলা ঃ মসজিদের দরজা বা দেওয়ালে কুরআন শরীফের আয়াত বা সূরা লেখা ভাল নয় (মাকরূহ)।

৬. মাসআলা ঃ মসজিদের ভেতরে বা মসজিদের দেওয়ালে থুথু ফেলা বা নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যদি থুথু ফেলার বা নাক পরিষ্কার করার একান্ত প্রয়োজন হয় তবে নিজের কাপড় বা রুমাল দ্বারা পরিষ্কার করে ফেলবে।

৭. মাসআলা ঃ মসজিদের ভেতরে ওযূ বা কুল্লির পানি ফেলা মাকরূহ তাহরীমী।

৮. মাসআলা ঃ গোসল ফরয হওয়া লোকের এবং হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করা গুনাহ।

৯. মাসআলা ঃ মসজিদের ভেতরে বেচা-কেনা করা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য ই'তেকাফ পালনকারীর জন্য প্রয়োজনবশতঃ মসজিদের ভেতরে বেচা-কেনা করা জায়েয। তবে বিক্রয়ের পণ্য মসজিদের ভেতরে রাখা উচিত নয়।[২] প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেচা-কেনা ই'তেকাফ অবস্থায়ও জায়েয নয়।

১০. মাসআলা ঃ কারও পায়ে যদি মাটি-কাদা লাগে, তবে তা মসজিদের দেওয়ালে বা খুঁটিতে মোছা মাকরূহ।

১১. মাসআলা ঃ মসজিদের ভেতরে গাছ লাগানো মাকরূহ। কেননা, এটা আহলে কিতাব (পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারীগণ)-এর প্রথা। অবশ্য যদি তাতে মসজিদের কোন উপকার হয় তবে জায়েয। যেমন ঃ মসজিদের মাটি সেঁতসেতে হওয়ার কারণে মসজিদের দেওয়াল ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি তাতে গাছ লাগানো হয়, তবে সে গাছ মাটির আর্দ্রতা টেনে নেবে।

---

১. তবে এরূপ কারুকার্য করবে না, যদ্বারা নামাযরতদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে এবং নামায রত ব্যক্তির মন কারুকার্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যার ফলে যথাযথভাবে নামায আদায় করতে পারে না। যদি এমনটি করে, যেমন বর্তমানে লোকেরা করে থাকে তবে তারা গুনাহগার হবে।

২. অর্থাৎ, বিক্রয়ের পণ্য মসজিদে রাখবে না। আর যদি কেবল বিক্রয়লব্ধ টাকা মসজিদের ভেতরে নিয়ে যায় তবে তাতে কোন আপত্তি নেই।

১২. মাসআলা ঃ মসজিদের উপর দিয়ে গমনাগমনের পথ করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে কখনও কখনও মসজিদের উপর দিয়ে বের হয়ে যাওয়া জায়েয।

১৩. মাসআলা ঃ মসজিদে বসে কোন পেশাজীবীর পেশা পরিচালনা করা জায়েয নয়। কেননা, মসজিদ দীনের কাজের জন্য, বিশেষ করে নামাযের জন্য নির্মাণ করা হয়। সুতরাং মসজিদে দুনিয়াবী কাজ না হওয়া চাই। এমন কি, যে ব্যক্তি কুরআন বা কিতাব বেতন নিয়ে পড়ান সেও পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত। তারও মসজিদের বাইরে বসে পড়ান উচিত। অবশ্য যদি কেউ মসজিদের হিফাজতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করে এবং তার সাথে তার নিজের কাজটিও করে, তবে তাতে কোন আপত্তি নেই। যেমন ঃ কোন কাতিব (অনুলিপি প্রস্তুত কারক) বা দর্জি যদি মসজিদের ভেতরে পাহারা দেওয়ার জন্য বসে এবং সাথে নিজের কিতাবাত বা সিলাইয়ের কাজও করে, তবে তা জায়েয হবে।

[বেহেশতী যেওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট সমাপ্ত]

বেহেশতী যেওয়ার তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট

রোযার বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ এক শহরের অধিবাসীরা যদি নতুন চাঁদ দেখে তবে তা শহরবাসীদের নিকটেও প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। উভয় শহরের মধ্যকার ব্যবধান যত বেশিই হোক না কেন। এমন কি যদি পশ্চিমের শেষ সীমায় চাঁদ দেখা যায় এবং সে সংবাদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পূর্বের শেষ সীমায় পৌঁছে, তবে সেই পূর্ব অঞ্চলে অবস্থানকারীদের উপর সেদিন রোযা রাখা আবশ্যক হবে।

২. মাসআলা ঃ যদি দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় এবং সে হিসেব অনুযায়ী লোকেরা রোযা রাখে, কিন্তু ত্রিশ রোযা পূর্ণ হওয়ার পর ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা গেল না, চাই উদয়াচল পরিষ্কার থাকুক বা না থাকুক; তবে একত্রিশতম দিনে রোযা রাখবে না। সে দিনটি শাওয়ালের পহেলা তারিখ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. মাসআলা ঃ যদি ত্রিশ তারিখে দিনের বেলায় চাঁদ দেখা যায়, তবে সে চাঁদটি তার পরবর্তী রাতের চাঁদ হিসেবে গণ্য হবে। পূর্ববর্তী রাতের চাঁদ হিসেবে ধর্তব্য হবে না এবং সেদিনটিকে পরবর্তী মাসের পহেলা তারিখ হিসেবে ধরা হবে না। চাই সে চাঁদটি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে দেখা যাক বা পরে দেখা যাক।

৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি রমযান বা ঈদের চাঁদ দেখতে পায় অতঃপর শরীয়তের বিধান মুতাবিক কোন কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে এ দু'দিনের রোযা রাখা তার উপর ফরয।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রোযার কথা স্মরণে না থাকায় পানাহার করে ফেলে বা স্ত্রী সহবাস করে, তারপর তার রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে এ ধারণা করে পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে নেয়, তবে এমতাবস্থায় তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, কেবল কাযা ওয়াজিব হবে। আর যদি এমন হয় যে, সে মাসআলাটি জানে, তারপরও ভুলে পানাহার করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করে ফেলে, তবে যদি স্ত্রী সহবাস করে ভঙ্গ করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। আর যদি পানাহার করে ভঙ্গ করে, তবে এ ক্ষেত্রেও কেবল কাযাই ওয়াজিব হবে।

৬. মাসআলা ঃ কারও অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হল বা স্বপ্নদোষ হল অথবা কোন মহিলার প্রতি কেবল তাকানোর কারণে বীর্যপাত হয়ে গেল এবং মাসআলা জানা না থাকার কারণে সে ধারণা করল যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং

সে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু পানাহার করল, তবে এতে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে রোযার কেবল কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে– কাফ্ফারা নয়। আর যদি তার মাসআলা জানা থাকে যে, উপরিউক্ত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না, কিন্তু তারপরও ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করে তবে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।

৭. মাসআলা ঃ পুরুষ যদি তার বিশেষ অঙ্গের ছিদ্রপথে কোন কিছু ভেতরে প্রবিষ্ট করে, তবে যেহেতু তা পেটের ভেতরে পৌঁছে না তাই এ কারণে তার রোযা ভঙ্গ হবে না।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মৃত মহিলার সাথে অথবা এরূপ কম বয়সী কোন নাবালেগা মেয়ের সাথে সঙ্গম করে, যার সাথে সঙ্গম করার কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না অথবা কোন পশুর সাথে সঙ্গম করে অথবা কাউকে জড়িয়ে ধরে বা চুমু খায় অথবা হস্তমৈথুন করে এবং এ সকল কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৯. মাসআলা ঃ কোন রোযাদার মহিলার সাথে যদি জোরপূর্বক বা ঘুমন্ত অবস্থায় বা অজ্ঞান অবস্থায় সঙ্গম করা হয়, তবে সে মহিলার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং মহিলার উপর সে রোযার শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। আর পুরুষও যদি রোযাদার হয়, তবে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব।

১০. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে রোযা ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলী পাওয়া যায় সে যদি রমযান মাসে সুবহে সাদিকের পূর্বে রোযা রাখার নিয়্যত করে, তারপর রোযার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ দিয়ে পেটের ভেতরে এমন কোন বস্তু প্রবিষ্ট করে, যা ওষুধ বা আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ, এরূপ বস্তু, যার ব্যবহারে কোন প্রকার শারীরিক উপকার হয় অথবা স্বাদ অনুভূত হয় এবং যা ব্যবহারে সুস্থ স্বভাবের লোক ঘৃণা পোষণ করে না তা যদি অতি সামান্য, এমনকি, তিল পরিমাণও হয় অথবা সঙ্গম করে বা করায় অথবা সমকামিতায় লিপ্ত হয়, সঙ্গমের ক্ষেত্রে তার বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগ মহিলার যোনিতে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট, বীর্যপাত হওয়া শর্ত নয়, তবে এ সকল ক্ষেত্রে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। অবশ্য সঙ্গমের ক্ষেত্রে এ শর্ত আছে যে, কোন সঙ্গমের উপযুক্ত মহিলার সাথে সঙ্গম হতে হবে; অতি কম বয়সী বালিকার সাথে নয়, যার মধ্যে সঙ্গমের কোনও উপযুক্ততা নেই।

১১. মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথায় তেল বা চোখে সুরমা লাগায় অথবা পুরুষ তার মলদ্বারে কোন শুষ্ক জিনিস প্রবিষ্ট করে এবং তার এক মাথা বাইরে থাকে অথবা কোন আর্দ্র বস্তু প্রবিষ্ট করে এবং তা ডুশের জায়গা পর্যন্ত না পৌঁছে, তবে যেহেতু এ সকল জিনিস পেটের ভেতরে পৌঁছে না তাই রোযা নষ্ট হবে না এবং কাযা বা কাফ্ফারা কোনটি ওয়াজিব হবে না। আর যদি পুরুষ তার

মলদ্বারে কোন শুকনো জিনিস যেমন তুলা বা কাপড় ইত্যাদি প্রবিষ্ট করে এবং তা পুরোপুরি ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় অথবা কোন আর্দ্র বস্তু প্রবিষ্ট করে এবং তা ডুশের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কেবল কাযা ওয়াজিব হবে।

১২. মাসআলা ঃ যারা হুঁকা পানে অভ্যস্ত অথবা যারা (স্বাস্থ্যগত) কোন উপকারের জন্য হুঁকা পান করে এরূপ কোন লোক যদি রোযার মধ্যে হুঁকা পান করে, তবে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

১৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা রোযা অবস্থায় যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা কোন পাগলের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তবু তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

১৪. মাসআলা ঃ সঙ্গমের ক্ষেত্রে উভয়ের সজ্ঞান হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং দু'জনের একজন যদি বেহুঁশ হয় এবং অপরজন সজ্ঞান হয়, তবে সজ্ঞান ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

১৫. মাসআলা ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলে অর্থাৎ, স্বপ্ন দোষ হলে যদি কেউ গোসল না করে রোযা রাখে, তবে তার রোযা নষ্ট হবে না। এমনিভাবে কোন মহিলা বা তার বিশেষ অঙ্গ দেখার কারণে অথবা কেবল মনে মনে কিছু কল্পনা করার কারণে যদি বীর্য স্খলিত হয়, তবু রোযা নষ্ট হয় না।

১৬. মাসআলা ঃ পুরুষ যদি তার বিশেষ অঙ্গের ছিদ্র পথে কোন জিনিস, যেমনঃ তেল বা পানি দেয়, চাই পিচকারী দ্বারা দিক বা এমনিতেই দিক, অথবা যদি তাতে কাঠি ইত্যাদি প্রবিষ্ট করে, তবে যদি এসব জিনিস মূত্রাশয় পর্যন্ত পৌঁছেও যায় তবু এতে রোযা নষ্ট হয় না।

১৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি রোযার কথা স্মরণে না থাকায় অথবা রাতের কিছু অংশ বাকি থাকায় সঙ্গমে লিপ্ত হল বা কিছু পানাহার করতে শুরু করল, অতঃপর যখনই রোযার কথা স্মরণ হল অথবা যখনই সুবহে সাদিক হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ সে স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে গেল বা পানাহার অবস্থায় মুখ থেকে লুকমা ফেলে দিল, এবং সঙ্গমের ক্ষেত্রে যদি স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর রেতঃপাতও হয়, তবু রোযা নষ্ট হবে না এবং এরূপ রেতঃপাত স্বপ্নদোষের পর্যায়ভুক্ত হবে।

১৮. মাসআলা ঃ মিসওয়াক করার কারণে যদি তা মধ্যাহ্নের পরও করা হয়, চাই কাঁচা গাছ দ্বারা করা হোক বা শুষ্ক গাছ দ্বারা, তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

১৯. মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খাওয়া এবং তাকে জড়িয়ে ধরা মাকরূহ, যদি রেতঃপাত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে অথবা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে ফেলে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর যদি এরূপ ভয় ও আশঙ্কা না থাকে, তবে মাকরূহ নয়।

২০. মাসআলা ঃ স্ত্রী লোকের ঠোঁট মুখে নেওয়া এবং কোন রকম আবরণ ব্যতিরেকে স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের সাথে নিজের বিশেষ অঙ্গ (সঙ্গম ব্যতিরেকে) লাগানো সর্বাবস্থায় মাকরূহ। চাই রেতঃপাত বা সঙ্গমের আশঙ্কা থাকুক বা না থাকুক।

২১. মাসআলা ঃ কোন মুকীম যদি রোযার নিয়্যত করার পর মুসাফির হয় এবং কিছু দূর যাওয়ার পর ভুলে রেখে যাওয়া কোন বস্তু নেওয়ার জন্য নিজ বাড়িতে ফিরে আসে এবং বাড়িতে পৌঁছে রোযা ভঙ্গ করে ফেলে, তবে সেই রোযার কাফ্‌ফারা দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা, তখন সে মুসাফির ছিল না, যদিও সে বাড়িতে অবস্থান করার নিয়্যতে যায় নি এবং সেখানে অবস্থানও করে নি।

২২. মাসআলা ঃ সঙ্গম ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি রোযার কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় এবং সে কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বে যদি আরেকটি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়, তবে উভয় কাফ্‌ফারা আদায়ের জন্য একটি মাত্র কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হবে; যদিও দুই কাফ্‌ফারা দুই রমযানে ওয়াজিব হয়ে থাকে। অবশ্য সঙ্গমের কারণে যতগুলো রোযা ভঙ্গ হয়েছে সেগুলো যদি একই রমযান মাসের রোযা হয়, তবে একটি কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হবে। আর সেই রোযাগুলো যদি দুই রমযানের রোযা হয়, তবে প্রত্যেক রমযানের কাফ্‌ফারা পৃথক পৃথক আদায় করতে হবে; যদিও পূর্বের কাফ্‌ফারা আদায় না করে থাকে।

এ'তেকাফের মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ এ'তেকাফের জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক। (১) নামাযের জামাআত হয় এরূপ কোন মসজিদে অবস্থান করা। (২) এ'তেকাফের নিয়্যতে অবস্থান করা। সুতরাং এ'তেকাফের নিয়্যত ও ইরাদা ব্যতিরেকে অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলা হয় না। যেহেতু নিয়্যত শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়্যতকারী ব্যক্তি মুসলমান ও সজ্ঞান হওয়া শর্ত, কাজেই এ দু'টি শর্তও নিয়্যতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (৩) হায়েয-নেফাস ও গোসলের প্রয়োজন থেকে পাক হওয়া।

২. মাসআলা ঃ মসজিদে হারামে এ'তেকাফ করা সর্বোত্তম। তারপর মসজিদে নববীতে, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসে, তারপর জামে মসজিদে, যেখানে জামাআতে নামায পাড়ার ব্যবস্থা থাকে। জামে মসজিদে যদি জামাআতে নামায পড়ার ব্যবস্থা না থাকে তবে মহল্লার মসজিদে, তারপর এমন মসজিদে, যেখানে জামাআত বেশি হয়।

৩. মাসআলা ঃ এ'তেকাফ তিন প্রকার ঃ (১) ওয়াজিব, (২) সুন্নতে মুয়াক্কাদা, (৩) মুসতাহাব। ওয়াজিব হল মানতের এ'তেকাফ। চাই সে মানত শর্তহীন হোক, যেমনঃ কেউ কোন শর্ত ব্যতিরেকে এমনিতেই এ'তেকাফের মানত করল, অথবা কোন শর্তযুক্ত মানত, যেমনঃ কেউ বলল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায়, তবে আমি এ'তেকাফ করব। রমযানের শেষ দশদিন এ'তেকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। নবী (সাঃ) নিয়মিত এ এ'তেকাফ পালন করেছেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেউ কেউ আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। রমযানের শেষ দশ দিন ব্যতীত অন্য কোন সময় এ'তেকাফ করা মুসতাহাব। চাই তা রমযানের প্রথম দশ দিন হোক বা দ্বিতীয় দশ দিন বা অন্য কোন মাস হোক।

৪. মাসআলা ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত। যখন কেউ এরূপ এ'তেকাফ করবে, তখন রোযা রাখাও তার জন্য আবশ্যক হবে। এমন কি, যদি কেউ রোযা রাখবে না বলে নিয়্যত করে, তবে তারও রোযা রাখতে হবে। সুতরাং যদি কেউ কেবল রাত্রে এ'তেকাফ করার নিয়্যত করে, তবে তা অনর্থক সাব্যস্ত হবে। কেননা, রাত রোযার ক্ষেত্র নয়। অবশ্য যদি কেউ রাত দিন উভয় সময় এ'তেকাফ করার নিয়্যত করে অথবা কেবল কয়েক দিন এ'তেকাফ করার নিয়্যত করে, তবে রাতও প্রসঙ্গতঃ তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং রাত্রেও এ'তেকাফ করতে হবে। আর যদি কেবল এক দিনই এ'তেকাফ করার মানত করে, তবে তাতে রাত প্রসঙ্গতঃও অন্তর্ভুক্ত হবে না। রোযা শুধু এ'তেকাফের উদ্দেশ্যে রাখা জরুরী নয়। চাই যে উদ্দেশ্যেই রাখা হোক, তা এ'তেকাফের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমনঃ কেউ রমযান মাসে এ'তেকাফ করার মানত করল, তখন রমযানের রোযা তার জন্য যথেষ্ট হবে। অবশ্য এ'তেকাফের রোযা ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক। এ জন্য নফল রোযা যথেষ্ট হবে না। যেমনঃ কেউ নফল রোযা রাখল এবং সেদিন এ'তেকাফ করার মানত করল, তবে এরূপ মানত করা সঠিক হবে না। যদি কেউ সম্পূর্ণ রমযান মাস এ'তেকাফ করার মানত করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে রমযান মাসে তা পালন করতে পারল না, তবে সে যদি রামযানের পরিবর্তে অন্য কোন মাসে তার এ'তেকাফ পালন করে নেয়, তবে এতে তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এ জন্য ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে হবে এবং সেই রোযা পালন অবস্থায় এ'তেকাফ করতে হবে।

৫. মাসআলা ঃ সুন্নত এ'তেকাফে তো রোযা থাকেই, এ জন্য রোযা শর্ত করার প্রয়োজন নেই।

৬. মাসআলা ঃ মুসতাহাব এ'তেকাফে সতর্কতামূলক বিধান হল এই যে, রোযা রাখা শর্ত। অবশ্য নির্ভরযোগ্য অভিমত মুতাবিক শর্ত নয় [১]।

৭. মাসআলা ঃ ওয়াজিব এ'তেফাক ন্যূনতম একদিন হতে পারে, আর সর্বোচ্চ সীমা নিয়্যত অনুযায়ী হবে। সুন্নত এ'তেকাফের পরিমাণ দশদিন। কেননা, সুন্নত এ'তেকাফ রমযানের শেষ দশ দিনে করতে হয়। মুসতাহাব এ'তেকাফের জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। এক মিনিট বা তার চেয়ে কমও হতে পারে।

৮. মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় দু' ধরনের কাজ করা হারাম। এরূপ হারাম কাজে লিপ্ত হলে ওয়াজিব ও সুন্নত এ'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার কাযা আদায় করতে হবে।[২] আর মুসতাহাব এ'তেকাফ হলে তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, মুসতাহাব এ'তেকাফের জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। সুতরাং তার কাযাও করতে হবে না।

প্রথম প্রকার ঃ এ'তেকাফের জায়গা থেকে বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া। প্রয়োজন বলতে এখানে মানবীয় প্রয়োজন ও শরয়ী প্রয়োজন উভয়টি শামিল রয়েছে। মানবীয় প্রয়োজন, যেমনঃ পায়খানা, পেশাব, জানাবাতের গোসল। খাবার আনার মত কেউ না থাকলে খাবার খেতে যাওয়াও মানবীয় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। শরয়ী প্রয়োজন, যেমনঃ জুমুআর নামায।

৯. মাসআলা ঃ যে প্রয়োজনে এ'তেকাফের মসজিদ থেকে বাইরে যাবে সে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর সেখানে অবস্থান করবে না এবং যথা সম্ভব মসজিদের অপেক্ষাকৃত নিকটতম স্থানে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করবে। যেমনঃ পায়খানার জন্য বাইরে গেলে, যদি তার নিজের বাড়ি দূরের হয় এবং তার কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি নিকটে থাকে, তবে সেখানে প্রয়োজন সেরে নেবে। অবশ্য কারও স্বভাব যদি নিজের বাড়িতে প্রয়োজন সারতে অভ্যস্ত হয় এবং অন্যত্র গেলে সে প্রয়োজন যথাযথভাবে পূর্ণ হবার নয়, তবে নিজের বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজন সারাও জায়েয। যদি জুমুআর নামাযের জন্য অন্য কোন মসজিদে যায় এবং নামাযের পর সেখানেই অবস্থান করে এবং সেখানেই এ'তেকাফ পূর্ণ করে, তবে তাও জায়েয। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ।

---

১. এক অভিমত মুতাবিক, মুসতাহাব এ'তেকাফের পরিমাণ একদিন। দ্বিতীয় অভিমত মতে, এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। অবশ্য মুসতাহাব এ'তেকাফের মধ্যেও রোযা রাখা ভাল।

২. অর্থাৎ, যতদিনের এ'তেকাফ ছুটে গেছে তার কাযা করতে হবে। ওয়াজিব এ'তেকাফের কাযা করা ওয়াজিব এবং সুন্নত এ'তেকাফের কাযা করা সুন্নত। রমযানের এ'তেকাফের কাযার জন্য আরেক রমযান মাস হওয়া জরুরী নয়, অবশ্য রোযা থাকা জরুরী।

১০. মাসআলা ঃ ভুলক্রমেও নিজের এ'তেকাফের মসজিদের বাইরে এক মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় অবস্থান করা জায়েয নয়।

১১. মাসআলা ঃ যে সকল ওযর প্রায়শঃ সংঘটিত হয় না, তদ্রূপ কোন ওযরের কারণে নিজের এ'তেকাফের স্থান ছেড়ে যাওয়া এ'তেকাফের পরিপন্থী। যেমনঃ কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, বা কোন ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর চেষ্টা করা, বা আগুন নিভাতে যাওয়া, অথবা মসজিদ ধসে পড়ার ভয়ে মসজিদের বাইরে যাওয়া। যদিও এসব অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান থেকে বাইরে যাওয়া গুনাহ নয়; বরং প্রাণ বাঁচানোর জন্য জরুরী, তবু এ'তেকাফ বহাল থাকবে না। যদি কোন শরয়ী বা মানবীয় প্রয়োজনে বাইরে যেয়ে থাকে এবং এরই মাঝে, অর্থাৎ, সেই প্রয়োজন পূর্ণ করার পূর্বে বা পরে কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, অথবা জানাযার নামাযে শরীক হয়, তবে তাতে কোন আপত্তি নেই।

১২. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের জন্য (অন্য কোন মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন হলে) এমন সময় যাবে, যাতে সেখানে পৌঁছে তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও জুমুআর সুন্নত পড়তে পারে এবং নামাযের পরেও সেখানে সুন্নত পড়ার জন্য অবস্থান করা জায়েয। এ পরিমাণ সময়ের অনুমানের ভার তারই অভিমতের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। যদি কারও অনুমান ভুল হয়ে যায় অর্থাৎ, তার চেয়ে কিছু আগে পৌঁছে যায়, তবে তাতে কোন আপত্তি নেই।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কাউকে জোরপূর্বক এ'তেকাফের স্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবু তার এ'তেকাফ বহাল থাকবে না। যেমনঃ তার কোন অপরাধে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেফতারির পরওয়ানা জারি হয় এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অথবা কেউ তাকে ঋণের দায়ে এ'তেকাফের স্থান থেকে বাইরে নিয়ে যায়।

১৪. মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি কোন শরয়ী বা মানবীয় প্রয়োজনে এ'তেকাফের স্থান থেকে বাইরে যায়, এবং পথে কোন দাতা তাকে আটক করে অথবা সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে এ'তেকাফের স্থান পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে যায় তবু এ'তেকাফ বহাল থাকবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ এমন কার্যকলাপ, যা এ'তেকাফ অবস্থায় করা না জায়েয, যেমনঃ সঙ্গম ইত্যাদি করা। ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থাৎ, এ'তেকাফের কথা মনে না থাকার কারণে করা হোক, মসজিদের ভেতরে করা হোক বা মসজিদের বাইরে করা হোক; সর্বাবস্থায় এ'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। সঙ্গমের আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ, যেমনঃ চুমু দেওয়া, আলিঙ্গন করা এ'তেকাফ অবস্থায় না জায়েয। কিন্তু এতে বীর্যপাত না হলে এ'তেকাফ নষ্ট হয় না। অবশ্য এ সকল কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তবে এ'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু কল্পনা বা চিন্তার কারণে বীর্যপাত হলে তাতে এ'তেকাফ নষ্ট হবে না।

১৫. মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে কোন দুনিয়াবী কাজে ব্যাপৃত হওয়া মাকরূহ তাহরীমী, যেমনঃ বিনা প্রয়োজনে বেচা-কেনা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন কাজ করা। আবশ্য যে কাজ করা একান্ত জরুরী, যেমনঃ ঘরে খাবার নেই এবং সে ব্যতীত এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও নেই, যে খাবার ক্রয় করে আনবে। এমতাবস্থায় বেচা-কেনা করা তার জন্য জায়েয। কিন্তু পণ্যদ্রব্য মসজিদে আনলে মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হওয়ার বা মসজিদের জায়গা আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে কোন অবস্থাতেই পণ্যদ্রব্য মসজিদে আনা জায়েয নয়। হাঁ, যদি মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হওয়ার বা মসজিদের জায়গা আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে কারও কারও মতে জায়েয।

১৬. মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় একেবারে চুপ করে বসে থাকাও মাররূহ তাহরীমী। অবশ্য মন্দ কথা মুখ থেকে বের করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, গীবত করবে না; বরং কুরআন পাক তিলাওয়াত, কোন দীনী ইলম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া বা অন্য কোন ইবাদতে সময় অতিবাহিত করবে। সারকথা এই যে, চুপ করে বসে থাকা কোন ইবাদত নয়।

যাকাতের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যাকাতের সব ধরনের পণ্যে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত।

২. মাসআলা ঃ যে সকল পশুর যাকাত দেওয়া ফরয সে সকল পশুর এক প্রকারকে সায়েমা বলে। সায়েমা এমন পশুকে বলা হয়, যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো পাওয়া যায়। (১) বছরের অধিকাংশ সময় নিজে নিজে চরে আহার করে এবং এ সময় আস্তাবলে বা গোয়ালঘরে রেখে তার আহার দেওয়া হয় না। আর যদি অর্ধ বছর নিজে নিজে চরে আহার করে এবং বাকি অর্ধ বছর আস্তাবলে বা গোয়াল ঘরে রেখে তার আহার দেওয়া হয়, তবে এরূপ পশুকে সায়েমা বলা হয় না। এমনিভাবে বাড়িতে যদি ঘাসের ব্যবস্থা করতে হয়, চাই তা সমূল্যে হোক বা বিনা মূল্যে, তবে সে পশুকেও সায়েমা বলা হয় না। (২) দুধ পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা প্রজনন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা মোটা-তাজা করার উদ্দেশ্যে পালন করা না হয়; বরং গোশ্‌ত খাওয়া বা সওয়ারী হিসেবে ব্যবহার করা উদ্দেশ্য হলে তাকে সায়েমা বলা হবে না।

সায়েমা পশুর যাকাতের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ সায়েমা পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে শর্ত হল, সেই পশু উট-উটনী বা বলদ-গাভী বা মহিষ-মহিষী বা ছাগল-ছাগী অথবা ভেড়া-দুম্বা হতে হবে। বন্য পশু যেমন হরিণ ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয হয় না। অবশ্য যদি তা

ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে রাখে, তবে তার উপর ব্যবসার মাল হিসেবে যাকাত ফরয হবে। যে পশু কোন গৃহ পালিত জন্তু ও বন্য জন্তুর যৌথ মিলনে জন্ম লাভ করে, তবে তার মা যদি গৃহপালিত হয় তবে সেই পশুকেও গৃহপালিত গণ্য করা হবে। আর যদি মা বন্য জন্তু হয়, তবে তাকেও বন্য জন্তু ধরা হবে। যেমনঃ ছাগী ও হরিণের মিলনে কোন নতুন প্রজাতির জন্তু জন্ম নিলে সেটি ছাগী হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং বন্য গরু ও গৃহ পালিত গাভীর মিলনে কোন পশুর জন্ম হলে সেটি গাভীর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. মাসআলা ঃ যে সায়েমা পশুকে বছরের মাঝে ব্যবসার নিয়্যতে বিক্রি করে দেওয়া হয় সে সায়েমা পশুর সে বছরের যাকাত দিতে হবে না এবং যখন থেকে পশুর মালিক ব্যবসার নিয়্যত করেছে তখন থেকে তার ব্যবসায়িক বছর শুরু হবে।

৩. মাসআলা ঃ পশুর বাছুরের ক্ষেত্রে বিধান হল এই যে, যদি কেবল বাছুরই হয় তবে তাতে যাকাত ফরয হয় না। অবশ্য যদি বাছুরের সাথে বড় পশুও থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে বাছুরেরও যাকাত ফরয হবে এবং যাকাত প্রদানের সময় বড় পশু দিতে হবে। আর বছর পূর্ণ হওয়ার পর (যাকাত প্রদানের পূর্বে) বড় পশু মরে গেলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

৪. মাসআলা ঃ ওয়াক্‌ফকৃত পশুর যাকাত ফরয নয়।

৫. মাসআলা ঃ ঘোড়া যদি সায়েমা হয় এবং তাতে মদ্দা-মাদী উভয় প্রকার মিশ্রিত থাকে, তবে তাতে যাকাত ফরয হয়। যাকাত প্রতি ঘোড়ায় এক দীনার[১] অর্থাৎ, পৌনে তিন তোলা রূপা দান করবে। অথবা সবগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে সে মূল্যের চল্লিশভাগের একভাগ প্রদান করবে।

৬. মাসআলা ঃ গাধা ও খচ্চর যদি ব্যবসার জন্য রাখা না হয়, তবে তাতে যাকাত ফরয হয় না।

উটের নিসাব

স্মর্তব্য যে, পাঁচটি উটে যাকাত হয়। এর কম হলে যাকাত ফরয হয় না। পাঁচটি উটে একটি বকরী, দশটিতে দু'টি পনেরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি বকরী যাকাত দেওয়া ফরয। চাই উট হোক বা উটনী, তবে বয়সে এক বছরের কম না হতে হবে। উপরিউক্ত সংখ্যাগুলো ব্যতীত এর মধ্যবর্তী যে কোন

---

১. এখানে বেহেশতী গাওহারের কোন কোন সংস্করণে দীনারের ব্যাখ্যায় পৌনে তিন রূপী বলা হয়েছে। এটা বৃটিশ শাসনামলের হিসাব মুতাবিক দেওয়া হয়েছে। সেটা এখনকার টাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তখনকার যুগে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল এ জন্য পৌনে তিন রূপী বলা হয়েছে।

সংখ্যক উটের জন্য কিছুই দিতে হবে না। তারপর পঁচিশটি উটে এমন একটি উটনী দিতে হবে, যার বয়সের দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছে। ছাব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটের জন্য কিছু দিতে হবে না। তারপর ছত্রিশটি উটে এমন একটি উটনী দিতে হবে, যার বয়সের তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে। সাঁইত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত উটের জন্য কিছু দিতে হবে না। তারপর ছেচল্লিশটি উটে এমন একটি উটনী দিতে হবে, যার বয়সের চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে। সাতচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটের জন্য কিছু দিতে হবে না। তারপর একষট্টি উটে এমন একটি উটনী দিতে হবে, যার বয়সের পঞ্চম বছর শুরু হয়েছে। বাষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটে কিছু দিতে হবে না। তারপর ছিয়াত্তর উটে এমন দু'টি উটনী দিতে হবে, যার বয়সের তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে। সাতাত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত উটের জন্য কিছু দিতে হবে না। তারপর একানব্বই উটে এমন দু'টি উটনী দিতে হবে, যার বয়সের চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে। বিরানব্বই থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত উটের জন্য কিছু দিতে হবে না। তারপর একশ' বিশের চেয়ে বেশি হলে তখন পুনরায় নতুন হিসাবে শুরু হবে। অর্থাৎ, চারটি বেশি হলে কিছু দিতে হবে না, কিন্তু সে বৃদ্ধির সংখ্যা পাঁচ পর্যন্ত পৌঁছুলে অর্থাৎ, একশ' পঁচিশ হয়ে গেলে তবে একটি বকরী ও দু'টি এমন উটনী দিতে হবে, যার বয়স চতুর্থ বছরে উপনীত হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি করে বকরী বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে একশ' চুয়াল্লিশ পর্যন্ত চলবে। একশ' পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেলে একটি দু বছর বয়সে উপনীত উটনী এবং দু'টি তৃতীয় বছরে উপনীত উটনী দিতে হবে। এভাবে একশ' ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত চলবে। একশ' পঞ্চাশ হয়ে গেলে চতুর্থ বছরে উপনীত তিনটি উটনী ফরয হবে। এর চেয়ে বেশি হলে পুনরায় নতুন হিসাব শুরু হবে। অর্থাৎ, পাঁচ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত প্রতি পাঁচটি উটে একটি করে বকরী দিতে হবে এবং এর সাথে দিতে হবে তিনটি চতুর্থ বছরে উপনীত উটনী। তারপর পাঁচিশটিতে একটি দ্বিতীয় বছরে উপনীত উটনী এবং ছত্রিশটিতে একটি তৃতীয় বছরে উপনীত উটনী দিতে হবে। তারপর একশ' ছিয়ানব্বই হয়ে গেলে চারটি তৃতীয় বছরে উপনীত উটনী দিতে হবে। এটা দু'শ পর্যন্ত চলবে। তারপর এর চেয়ে বেশি হলে তবে তাতে এভাবে হিসাব চলতে থাকবে, যেমনটি দেড়শ'র পরে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. মাসআলা ঃ উটের যাকাতে উট দিলে তবে মাদী উটনী দিতে হবে। অবশ্য যদি মদ্দা উট মূল্যের দিক থেকে মাদী উটনীর সমমূল্যের হয়, তবে তাও জায়েয।

গরু ও মহিষের নিসাব

গরু ও মহিষ উভয় জাতির পশু এক প্রকারভুক্ত। উভয়ের নিসাবও এক। যদি উভয় জাতির পশু একত্রে হিসাব করলে নিসাব পূর্ণ হয়, তবে উভয় জাতির পশু একত্রে হিসাব করবে। যেমনঃ বিশটি গরু ও দশটি মহিষ থাকলে উভয় প্রকারকে একত্রে হিসাব করে ত্রিশের নিসাব পূর্ণ করবে। কিন্তু যাকাত দেওয়ার সময় যে পশু সংখ্যায় বেশি তার থেকে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ, সংখ্যায় গরু বেশি হলে যাকাতে গরু দেবে, আর মহিষ বেশি হলে মহিষ দেবে। উভয় প্রকারের পশু যদি সংখ্যায় সমান হয়, তবে উৎকৃষ্ট প্রকার থেকে কম মূল্যমানের পশু বা নিম্ন প্রকারের পশু থেকে বেশি দামের পশু যাকাত দিবে। সুতরাং ত্রিশটি গরু-মহিষের যাকাত হিসেবে এক বছর বয়সের একটি গরু বা মহিষের বাছুর, মদ্দা হোক বা মাদী হোক দিতে হবে। ত্রিশটির কম হলে কিছু দিতে হয় না। ত্রিশ থেকে ঊনচল্লিশ পর্যন্তও কিছু দিতে হবে না। চল্লিশটি গরু-মহিষের মধ্য থেকে পূর্ণ দু'বছর বয়সের একটি বাছুর, মদ্দা হোক বা মাদী হোক দিতে হবে। একচল্লিশ থেকে ঊনষাট পর্যন্ত সংখ্যার জন্য কিছু দিতে হবে না। ষাটটি পূর্ণ হলে এক বছর বয়সের দু'টি বাছুর দিতে হবে। ষাটের বেশি হলে প্রতি ত্রিশটিতে একটি এক বছরের বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি দু'বছরের বাছুর দিতে হবে। যেমনঃ সত্তরটি পূর্ণ হলে তখন একটি এক বছরের বাছুর ও একটি দু'বছরের বাছুর দেবে। কেননা, সত্তরের মধ্যে একটি ত্রিশের নিসাব ও একটি চল্লিশের নিসাব আছে। যখন আশিটি পূর্ণ হবে, তখন দু'টি দু'বছরের বাছুর দেবে। কেননা, আশিটির মধ্যে দু'টি চল্লিশের নিসাব আছে। নব্বইটি হলে এক এক বছরের তিনটি বাছুর দেবে। কেননা, নব্বইয়ের মধ্যে তিনটি ত্রিশের নিসাব রয়েছে। একশ'টি পূর্ণ হলে দু'টি এক বছরের বাছুর ও একটি দু'বছরের বাছুর দেবে। কেননা, একশ'র মধ্যে ত্রিশের নিসাব দু'টি ও চল্লিশের নিসাব একটি রয়েছে। অবশ্য যখন দু'রকমের নিসাবের হিসেবে ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয়, তখন ইখতিয়ার আছে। যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পারে। যেমনঃ একশ' বিশের মধ্যে এক হিসেবে চারটি ত্রিশের নিসাব, আবার ভিন্ন হিসেবে তিনটি চল্লিশের নিসাব রয়েছে। অতএব এখানে ইচ্ছা করলে, ত্রিশের নিসাব গ্রহণ করে চারটি এক বছরের বাছুর দিতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে চল্লিশের নিসাব গ্রহণ করে তিনটি দু'বছরের বাছুরও দিতে পারে।

ছাগল-ভেড়ার নিসাব

যাকাতের ক্ষেত্রে ছাগল ও ভেড়া একই প্রকারভুক্ত। ভেড়া চাই দুমদার ভেড়া হোক, যাকে দুম্বা বলা হয়, অথবা সাধারণ ভেড়া হোক। যদি (ছাগল-ভেড়া) উভয় প্রকার পশুর নিসাব পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণ হয়, তবে উভয় প্রকারের যাকাত একত্রে [১] (একই প্রকার হিসেবে) দেবে এবং উভয় প্রকারের সম্মিলিত সমষ্টি একটি নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি প্রত্যেক প্রকারের নিসাব পৃথকভাবে পূর্ণ না হয়, কিন্তু উভয় প্রকারের সম্মিলিত হিসেবে নিসাব পূর্ণ হয়, তবে সে ক্ষেতেও উভয় প্রকারের সম্মিলিত হিসাব করবে। যে প্রকারের পশু সংখ্যায় বেশি হয় সে প্রকার থেকে যাকাত প্রদান করবে। আর উভয় প্রকার সংখ্যায় সমান হলে তখন ইখতিয়ার আছে (অর্থাৎ, যে প্রকার থেকে ইচ্ছা হয় যাকাত প্রদান করবে।) চল্লিশটি ছাগল বা ভেড়ার কম হলে কিছু দিতে হবে না। চল্লিশটি ছাগল বা ভেড়ায় একটি ছাগল বা ভেড়া দিতে হবে। চল্লিশের পর একশ' বিশ পর্যন্ত বর্ধিত সংখ্যার জন্য কিছু দিতে হবে না। এরপর একশ' একুশটি হলে দু'টি ভেড়া বা দু'টি ছাগল দেবে। একশ' বাইশ থেকে দু'শ' পর্যন্ত বর্ধিত সংখ্যার জন্য কিছু দিতে হবে না। এরপর দু'শ একটি হলে তিনটি ভেড়া বা ছাগল দেবে। (দু'শ' দুই থেকে) তিনশ' নিরানব্বই পর্যন্ত বর্ধিত সংখ্যার জন্য কিছু দিতে হবে না। এরপর চারশ' হলে চারটি ছাগল বা চারটি ভেড়া দেবে। চারশ'য়ের পর বর্ধিত সংখ্যায় প্রতি শ'য়ে একটি করে ছাগল (বা ভেড়া) যাকাত দিতে হবে। একশ'য়ের কম বৃদ্ধি পেলে তজ্জন্য কিছু দিতে হবে না।

১. মাসআলা ঃ ছাগল-ভেড়ার যাকাতের ক্ষেত্রে মদ্দা বা মাদীর কোন ভেদাভেদ নেই। অবশ্য এক বছরের কম বয়সী বাছুর না হওয়া চাই; চাই ভেড়া হোক বা ছাগল।

যাকাত সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়েল

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বৈধ সম্পদ ও অবৈধ সম্পদকে একত্র করে ফেলে, তবে তার সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে। [২]

---

১. এ বিষয়ে অনেক তাহকীক ও গবেষণার পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছাগল-ভেড়ার ক্ষেত্রেও উভয় জাতের পশুকে একই প্রকারভুক্ত গণ্য করে যাকাত দেবে। এক প্রকারের পশুতে যে যাকাত ওয়াজিব হয় উভয় প্রকারেও তাই ওয়াজিব হবে। যেমনঃ চল্লিশটি ছাগল ও চল্লিশটি ভেড়া হলে তখন তা আশিটি ছাগল বা আশিটি ভেড়ার মতই ধর্তব্য হবে এবং এ আশিটির যাকাত হিসেবে একটি ছাগল বা একটি ভেড়া দেওয়া ওয়াজিব হবে। অবশ্য ছাগল দিলে কম মূল্যের দেবে এবং ভেড়া দিলে বেশি দামের ভেড়া দেবে। সারকথা, চল্লিশটি ছাগল ও চল্লিশটি ভেড়াকে দু'টি নিসাব ধরা হবে না এবং যাকাতে দু'টি পশু ওয়াজিব হবে না। 'আল-মুগতানাম ফী যাকাতিল গানাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২. সম্পদের একাংশ অবৈধ হলে তজ্জন্য সম্পদের যাকাত রহিত হয় না। অবশ্য অন্য কোন কারণ যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্তরায় হয় সেকথা ভিন্ন।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর মারা যায়, তবে তার সম্পদের যাকাত গ্রহণ করা যাবে না। যদি মৃত ব্যক্তি (মৃত্যুর পূর্বে যাকাত প্রদানের জন্য) ওসিয়ত করে যায়, তবে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে যাকাত গ্রহণ করা যাবে। (আর যদি তার অনেক বছরের অনাদায়ী যাকাতের সর্বমোট অংক তার সমুদয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে যায়) তবে যাকাত স্বরূপ তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করা হবে, যদিও তা তার সম্পূর্ণ যাকাতের জন্য যথেষ্ট নয়। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা যদি সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি দিতে রাজি হয়, তবে তারা স্বেচ্ছায় যতটুকু দেয় ততটুকু নেওয়া যাবে।

৩. মাসআলা ঃ যদি ঋণদাতা এক বছর পর তার ঋণ থেকে ঋণগ্রহীতাকে অব্যাহতি দেয়, তবে ঋণদাতার সেই এক বছরের যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য ঋণগ্রহীতা যদি ধনী হয়, তবে তাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া স্বেচ্ছায় নিজ সম্পদ ধ্বংস করা বলে ধর্তব্য হবে। এমতাবস্থায় ঋণদাতা ব্যক্তির সেই সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কেননা, সম্পদ স্বেচ্ছায় ধ্বংস করার কারণে যাকাত মাফ হয় না।

৪. মাসআলা ঃ ফরয ও ওয়াজিব সদকা ব্যতীত (নফল) সদকা দেওয়া মুসতাহাব তখনই, যখন নিজ ও নিজ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে। নচেৎ মাকরূহ। এমনিভাবে নিজের সমুদয় সম্পদ সদকা করে দেওয়াও মাকরূহ। অবশ্য যদি কারও মানসিকভাবে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও ধৈর্যের গুণ সুদৃঢ় থাকে এবং পরিবার-পরিজনও কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা নেই তবে এরূপ নফল সদকা করা মাকরূহ নয়; বরং উত্তম।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন নাবালেগা মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে মেয়েটি যদি সম্পদের মালিক হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে তার সদকায়ে ফিত্র দেওয়া ওয়াজিব। আর মেয়েটি যদি সম্পদের মালিক না হয়, তবে দেখতে হবে যে মেয়েটি স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জনের উপযোগী কি-না। যদি সে স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জনের উপযোগী হয়, তবে তার সদকায়ে ফিত্র তার পিতা বা স্বামী কারও উপর ওয়াজিব নয়। এবং তার নিজের উপরও ওয়াজিব নয়। আর সে যদি স্বামীর সেবা ও মনোর নের উপযোগী না হয়, তবে তার সদকায়ে ফিত্র দেওয়া তার পিতার উপর ওয়াজিব। মেয়েটিকে যদি স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া না হয়, তবে সে স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জনের উপযোগী হলেও তার সদকায়ে ফিত্র দেওয়া তার পিতার উপর ওয়াজিব।

[বেহেশতী যেওয়ার তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট সমাপ্ত]

চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্ট নেই।

বেহেশ্‌তী যেওয়ার পঞ্চম খণ্ডের

পরিশিষ্ট

চুল সংক্রান্ত বিধি-বিধান

১. মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ মাথায় কানের লতি বা তার চেয়ে কিছুটা নিচ পর্যন্ত দীর্ঘ চুল রাখা সুন্নত। আর মাথা মুণ্ডন করলে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করা সুন্নত। মাথার চুল কাটাও জায়েয, তবে কাটলে সবগুলো চুল (সমানভাবে) কাটতে হবে। মাথার সামনের ভাগের চুল কিছুটা বড় রাখা, যা বর্তমান যুগে ফ্যাশন হিসেবে প্রচলিত রয়েছে তা জায়েয নেই। এমনিভাবে কিছু অংশ মুণ্ডন করা এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া জায়েয নয়। এতে বুঝা গেল যে, বর্তমানে যেভাবে হিপ্পিকাট চুল রাখা বা আধুনিক ফ্যাশনে চুল কাটা বা মাথাকে গোলাকার দেখবার জন্য সামনের দিকের চুল লম্বা রাখার প্রচলন রয়েছে তা জায়েয নয়।

২. মাসআলা ঃ চুল অনেক বড় রেখে মহিলাদের মত করে খোঁপা বাঁধা (পুরুষদের জন্য) জায়েয নয়।

৩. মাসআলা ঃ মহিলাদের মাথা মুণ্ডন করা, চুল কাটা হারাম। হাদীসে এ সম্পর্কে অভিসম্পাত করা হয়েছে।

৪. মাসআলা ঃ ঠোঁটের চামড়ার সাথে মিশিয়ে সমান করে মোচ কাটা সুন্নত। মোচ মুণ্ডন করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বিদআত বলেন, আবার কেউ জায়েযও বলেন। তবে মুণ্ডন না করাই হল সতর্কতা।

৫. মাসআলা ঃ মোচ লম্বা না রেখে মোচের দুই পার্শ্ব লম্বা করা জায়েয।

৬. মাসআলা ঃ দাড়ি মুণ্ডন করা ও কর্তন করা হারাম। অবশ্য এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলা জায়েয। এমনিভাবে দাড়িকে গোলাকার ও সমান করার জন্য সবদিক থেকে কিছু কিছু কাটাও জায়েয।[১]

৭. মাসআলা ঃ গণ্ড দেশের উপর উদগত চুলসমূহ ছেঁটে ফেলে দাড়ি সমান করা জায়েয। এমনিভাবে ভ্রূযুগল সমান করার জন্য তার কিছুটা অংশ কেটে ফেলাও জায়েয।

৮. মাসআলা ঃ গলার চুল মুণ্ডন না করা চাই। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এতে কোন অসুবিধা নেই।

৯. মাসআলা ঃ নিচের ঠোঁটের নিম দাড়ির দু'পাশের পশম মুণ্ডন করাকে ফিকাহবিদগণ বিদআত বলেছেন। সুতরাং এরূপ না করা চাই। এমনিভাবে ঘাড়ের পশম ছাঁটাকেও ফিকাহবিদগণ মাকরূহ বলেছেন।

---

১. এক মুষ্ঠি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করে বা কেটে এক মুষ্ঠির চেয়ে ছোট করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. মাসআলা ঃ সৌন্দর্য রক্ষার্থে সাদা চুল বাছাই করে ফেলে দেওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য শত্রুর মনে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে মুজাহিদের সাদা চুল বেছে ফেলা উত্তম।

১১. মাসআলা ঃ নাকের পশম উপড়ে ফেলা উচিত নয়; বরং তা কাঁচি দ্বারা কাটা চাই।

১২. মাসআলা ঃ বুক ও পিঠের পশম কাট-ছাঁট করা জায়েয, তবে তা নিয়ম বহির্ভূত ও অনুত্তম কাজ।

১৩. মাসআলা ঃ পুরুষদের নাভির নিচের পাশ ক্ষুর ইত্যাদি দ্বারা মুণ্ডন করার সময় নাভির নিচ থেকে মুণ্ডন শুরু করবে। মুণ্ডনের পরিবর্তে হরিতাল ইত্যাদি বা অন্য কোন লোমনাশক পদার্থ দ্বারাও তা পরিষ্কার করা জায়েয। মহিলাদের জন্য এর সুন্নত মুতাবিক পদ্ধতি হল ক্ষুর ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে নখ বা চিমটি দ্বারা উপড়ে ফেলা।

১৪. মাসআলা ঃ বগলের পশম চিমটি ইত্যাদি দ্বারা উপড়ে ফেলা উত্তম। তবে ক্ষুর ইত্যাদি দ্বারা মুণ্ডন করাও জায়েয।

১৫. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত পশমসমূহ ব্যতিরেকে শরীরের আরও বিভিন্ন স্থানের পশমসমূহ মুণ্ডন করা ও রাখা উভয়টি জায়েয। (কিয়াস নির্ভর মাসআলা)

১৬. মাসআলা ঃ পায়ের নখ কাটাও সুন্নত। অবশ্য মুজাহিদের জন্য দারুল হরবে নখ ও মোচ না কাটা মুসতাহাব।

১৭. মাসআলা ঃ হাতের নখ এভাবে কাটা উত্তমঃ ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে কণিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাটবে। তারপর বাম হাতের কণিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম হাতের নখগুলো কেটে তারপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কেটে সমাপ্ত করবে। পায়ের নখ কাটার সময় ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সমাপ্ত করবে। এরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নখ কাটা উত্তম। তবে এর ব্যতিক্রম করাও জায়েয।

১৮. মাসআলা ঃ কাটা নখ ও চুল মাটিতে পুঁতে ফেলা চাই। যদি মাটিতে না পোঁতা হয়, তবে কোন সংরক্ষিত স্থানে ফেলে দেওয়াও জায়েয। তবে নাপাক ও আবর্জনাময় স্থানে ফেলবে না। এতে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৯. মাসআলা ঃ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ[১]। এতে শ্বেতরোগ হয়ে থাকে।

---

১. দাঁত দ্বারা নখ কাটা চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে মাকরূহ তথা অপছন্দনীয় সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকা ভাল।

২০. মাসআলা ঃ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় চুল, নখ কাটা এবং নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা মাকরূহ।

২১. মাসআলা ঃ সপ্তাহে একবার নাভির নিচের পশম ও বগলের পশম পরিষ্কার করা এবং মোচ, নখ ইত্যাদি কাটা, গোসল করে ও ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হওয়া উত্তম। তবে সবচেয়ে উত্তম হল জুমুআর দিন এভাবে পাক-সাফ হওয়া। অর্থাৎ, জুমুআর নামাযের পূর্বে এভাবে পাক-সাফ হয়ে জুমুআর নামাযে যাওয়া। প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না হলে অন্ততঃ পনের দিনে একবার করবে। এসব পরিষ্কার করার সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করার অবকাশ নেই। যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং উপরিউক্ত বিষয়াদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করে, তবে গুনাহগার হবে।

শুফ্‌'আর বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ শফী যখন জমি বেচা-কেনার সংবাদ জানল তখনই যদি সে মুখে না বলে যে, "আমি শুফ্‌'আর দাবি করি" তবে তার শুফ্‌'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর তার পক্ষে শুফ্‌'আর দাবি উত্থাপন করা জায়েয হবে না। এমনকি জমি বেচা-কেনার সংবাদ যদি শফীর নিকট চিঠির মাধ্যমে পৌঁছে এবং চিঠির শুরুতে এ সংবাদ লেখা থাকে যে, অমুক জমি বিক্রি হয়েছে, কিন্তু সে তখন মুখে শুফ্‌'আ নেওয়ার দাবি না করে সম্পূর্ণ চিঠি পড়ে সমাপ্ত করে এবং চিঠি শেষ করার পর বলে যে, আমি শুফ্‌'আ নেব তবে (তার শুফ্‌আর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না,) তার দাবি বাতিল হয়ে যাবে।

২. মাসআলা ঃ শফী যদি (ক্রেতা বা বিক্রেতাকে) বলে যে, আমাকে এত টাকা দাও, তবে আমি আমার শুফ্‌'আর দাবি ছেড়ে দেব, তবে যেহেতু সে তার অধিকার ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছে তাই তার শুফ্‌'আর দাবি রহিত হয়ে যাবে এবং এরূপ টাকা দেওয়া যেহেতু ঘুষের নামান্তর, তাই এ টাকা নেওয়া-দেওয়াও হারাম।

৩. মাসআলা ঃ যদি বিচারক শুফ্‌'আর ফয়সালা করার পূর্বেই শফী মারা যায়, তবে শফীর ওয়ারিসরা শুফ্‌'আর অধিকার পাবে না। কিন্তু যদি ক্রেতা মারা যায় তবে শুফ্‌'আ বহাল থাকবে।

৪. মাসআলা ঃ শফীর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, এত টাকায় জমি বিক্রি হয়েছে, তখন সে শুফ্‌'আর দাবি প্রত্যাহার করল, অতঃপর জানতে পারল যে, আরও কম মূল্যে জমি বিক্রি হয়েছে, এমতাবস্থায় সে পুনরায় শুফ্‌'আর দাবি করতে পারবে। এমনিভাবে, প্রথমে সে শুনেছিল যে, ক্রেতা অমুক ব্যক্তি, কিন্তু পরে জানতে পারল যে, ক্রেতা অন্যব্যক্তি অথবা প্রথমে শুনেছিল যে, জমি অর্ধেক

বিক্রি হয়েছে, তারপর জানতে পারল যে, সম্পূর্ণটিই বিক্রি হয়েছে, তবে এসব ক্ষেত্রে প্রথমে শুফ্'আর দাবি প্রত্যাহার করে থাকলেও তার শুফ্'আর দাবি বাতিল হবে না।

জমি ও ফলবাগানের বর্গাচাষের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার খালি জমি কাউকে অর্পণ করে বলল, তুমি এ জমিটি চাষ কর। যে ফসল উৎপন্ন হবে তা আমরা এত এত হারে বন্টন করে নেব। এটাকে মুযারাআত (বর্গাচাষ) বলে। এরূপ করা জায়েয।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বাগান লাগাল এবং অপর এক ব্যক্তিকে সে বলল, তুমি এ বাগানে পানি দাও এবং পরিচর্যা কর, এতে যে ফসল উৎপন্ন হবে তা এক-দুই বছর পর্যন্ত বা দশ-বারো বছর পর্যন্ত আধাআধি হারে বা তেভাগা হিসেবে বন্টন করে নেওয়া হবে। এটাকে মুসাকাত (বাগানের বর্গা চাষ) বলে এবং এটাও জায়েয।

৩. মাসআলা ঃ বর্গাচাষের চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন ঃ ১. জমি চাষের উপযোগী হওয়া, ২. জমির মালিক ও চাষী সজ্ঞান ও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, ৩. চাষের সময়কাল বর্ণনা করা, ৪. বীজ জমির মালিক দেবে, না কি চাষী দেবে তা নির্ধারণ করা, ৫. গম না কি যব, কোন প্রকার ফসলের চাষ করবে তা নির্ধারণ করা, ৭. জমি পুরোপুরি উন্মুক্ত করে চাষীর নিকট সমর্পণ করা, ৮. জমির উৎপন্ন ফসলে জমির মালিক ও চাষী উভয়ে শরীক থাকা, ৯. জমি ও বীজ এক ব্যক্তির এবং গরু ও শ্রম ইত্যাদি অপর ব্যক্তির হওয়া অথবা একজনের কেবল জমি এবং অন্যান্য সবকিছু অপর ব্যক্তির হওয়া।

৪. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত শর্তাবলীর কোন একটি অনুপস্থিত হলে বর্গাচাষের চুক্তি অশুদ্ধ হবে।

৫. মাসআলা ঃ বর্গাচাষের চুক্তি অশুদ্ধ হলে উৎপন্ন সমস্ত ফসলের মালিক হবে বীজদাতা। অপর ব্যক্তি জমির মালিক হলে সে প্রচলিত নিয়মে জমির লগ্নি স্বরূপ বিনিময় পাবে। আর সে যদি চাষী হয়, তবে সেও প্রচলিত নিয়ম মুতাবিক তার শ্রমের বিনিময় পাবে। তবে এ শ্রমের বিনিময় বা জমির লগ্নিস্বরূপ বিনিময় তাদের উভয়ের পূর্ব নির্ধারিত অংশের চেয়ে বেশি দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, যদি উৎপন্ন ফসলের আধাআধি হারে চুক্তি হয়ে থাকে, তবে উপরিউক্ত বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশি দেওয়া যাবে না।

৬. মাসআলা ঃ বর্গাচাষের চুক্তি হওয়ার পর যদি দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ চুক্তি মুতাবিক কাজ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে চুক্তি মুতাবিক কাজ

করতে বাধ্য করা যাবে, কিন্তু যদি বীজদাতা বীজ দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

৭. মাসআলা ঃ যে দুই পক্ষ বর্গাচাষের চুক্তি করেছে তাদের কোন এক পক্ষ মারা গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৮. মাসআলা ঃ যদি বর্গাচাষের চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অথচ তখনও জমির ফসল না পেকে থাকে তবে চাষী জমির মালিককে ফসল পাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত দিনগুলোর জন্য প্রচলিত নিয়ম মুতাবিক জমির লগ্নিস্বরূপ বিনিময় পরিশোধ করতে হবে।

৯. মাসআলা ঃ কোন কোন এলাকায় এ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বর্গাচাষের জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তা তো চুক্তি মুতাবিক বন্টন করে নেয়, কিন্তু চুক্তির বাইরে যে সকল শস্য, যেমন ঃ বজরা ইত্যাদি উৎপন্ন হয় তা বন্টন করে না। বরং বিঘা হিসেবে চাষীর নিকট থেকে জমির লগ্নিস্বরূপ বিনিময় আদায় করে। এটা তো বাহ্যতঃ বর্গাচাষের চুক্তির খেলাফ হওয়ার কারণে নাজায়েয বলে মনে হয়, কিন্তু যদি এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, এরূপ শস্য আগে থেকে বর্গাচুক্তির বাইরে ছিল এবং প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পূর্ববর্তী চুক্তির এ বিশ্লেষণ করা হয় যে, উভয়পক্ষের এরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা অমুক ফসলের জন্য জমিতে বর্গাচাষের চুক্তি করে এবং অমুক ফসলের জন্য জমি লগ্নিস্বরূপ দিয়ে থাকে তবে এভাবে জায়েয হতে পারে, কিন্তু এতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা আবশ্যক।

১০. মাসআলা ঃ কোন কোন জমির মালিক চুক্তি মুতাবিক নিজের প্রাপ্য অংশ ছাড়াও কৃষকের অংশ থেকে চাকর-বাকর ও দুষ্ট লোকদের বখরা আদায় করে থাকে। সুতরাং যদি সুনির্দিষ্টভাবে এটা ধার্য করে নেয় যে, আমি এসব বখরার জন্য দু মণ বা চার মণ নেব, তবে এটা না জায়েয। কিন্তু যদি এভাবে ধার্য করে যে, মণ প্রতি এক সের (উদাহরণতঃ) নেব তবে তা জায়েয হবে।

১১. মাসআলা ঃ কোন কোন লোক সুস্পষ্টভাবে ফয়সালা করে না যে, কি ফসল লাগানো হবে; কিন্তু পরে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও জগড়া-ঝাটি হয়, এরূপ করা জায়েয নয়। হয় সুনির্দিষ্টভাবে ফসলের নাম উল্লেখ করে বলবে অথবা মুক্ত অনুমতি দিয়ে দেবে যে, কৃষকের যা ইচ্ছা বপন করবে।

১২. মাসআলা ঃ কোথাও এরূপ প্রচলন আছে যে, কৃষক জমিতে ফসলের বীজ বপন করে অন্য লোককে জমি সোপর্দ করে দেয় এবং তার সাথে এভাবে

চুক্তি হয় যে, তুমি এতে শ্রম দাও এবং পরিচর্যা কর। এতে যে ফসল উৎপন্ন হবে তার এক তৃতীয়াংশ তুমি (অর্থাৎ, শ্রমদাতা) পাবে। বস্তুতঃ এটাও বর্গাচুক্তি। যেখানে মূল জমির মালিক কৃষককে এরূপ করতে বাধা দেয় না সেখানে এরূপ করা জায়েয, নতুবা জায়েয নয়।

১৩. মাসআলা ঃ উপরিউক্ত মাসআলা (১২নং মাসআলা)-টিতেও পূর্ববর্তী মাসআলার (৯নং মাসআলার) অনুরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। কোন কোন ফসল তো শ্রমিকদেরকে বন্টন করে দেওয়া হয়, আবার কোন কোন ফসলে বিঘা হিসেবে কিছু নগদ টাকা দেয়। সুতরাং এ মাসআলায়ও বাহ্যতঃ নাজায়েয হওয়ার সন্দেহ রয়েছে এবং পূর্বানুরূপ এখানেও সেই জায়েয হওয়ার ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। (কিয়াস নির্ভর মাসআলা)

১৪. মাসআলা ঃ ইজারা বা বর্গাচুক্তির ভিত্তিতে বারো বছর বা তার চেয়ে কম-বেশি সময় কারও জমি ভোগ করে (দখলসূত্রে) সে জমির উত্তরাধিকারিত্ব দাবি করার যে বর্তমান প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে অন্যায়, হারাম, জুলুম ও পরসম্পদ আত্মসাতের নামান্তর। মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে কখনও এরূপ জমি ভোগ দখল করা জায়েয নয়। যদি কেউ এরূপ কাজ করে, তবে তার উৎপন্ন ফসল হবে অবৈধ ও তা খাওয়া হবে হারাম।

১৫. মাসআলা ঃ বাগানের বর্গাচাষের যাবতীয় বিধি-বিধান জমি বর্গাচাষের অনুরূপ।

১৬. মাসআলা ঃ বাগানের গাছে ফল আসার পর যদি তা পরিচর্যার জন্য কাউকে দেওয়া হয় এবং ফল এ পর্যায়ের হয় যে, গাছে পানি দিলে ও পরিচর্যা করলে ফল বৃদ্ধি পায়, তবে এরূপ বর্গা দেওয়া জায়েয। আর যদি ফলের বৃদ্ধি পাওয়ার মাত্রা শেষ হয়ে যায়, তবে এরূপ বাগান বর্গা দেওয়া জায়েয নয়। যেমন জমিতে ফসল পরিপুষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জমির বর্গাচুক্তি জায়েয হয় না।

১৭. মাসআলা ঃ বাগানের বর্গাচুক্তি কোন কারণে অশুদ্ধ হলে তখন গাছের মালিক গাছের সমস্ত ফলের মালিক হবে। আর পরিচর্যাকারী নিয়ম মুতাবিক তার পারিশ্রমিক পাবে, যেমনটি জমি বর্গার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

নেশাযুক্ত দ্রব্যের বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ তরল প্রবহমান নেশাযুক্ত দ্রব্য চাই তা মদ হোক বা তাড়ি বা অন্য কিছু, যা বেশি পান করলে নেশা হয় তার এক ফোঁটাও হারাম, যদিও এ পরিমাণ স্বল্পমাত্রার কারণে তার দ্বারা নেশা সৃষ্টি হয় না। এমনিভাবে এরূপ নেশাযুক্ত দ্রব্য ওষুধে ব্যবহার করা চাই তা পানীয় ওষুধে হোক বা কোন মালিশ

জাতীয় ওষুধে হোক, সর্বক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। চাই সে নেশাযুক্ত দ্রব্য তার প্রকৃত অবস্থার উপর থাকুক বা কোনরূপ তদবীরের কারণে তা অন্য আকার ধারণ করুক, সর্বাবস্থায় তা নিষিদ্ধ। এ থেকে সে সব বিদেশী ফর্মুলায় প্রস্তুত ওষুধসমূহের অবস্থাও জানা গেল, যেগুলোতে প্রায়শঃ এরূপ নেশাজাতীয় দ্রব্যাদি মিশ্রণ করা হয়।

২. **মাসআলা ঃ** যে সব বস্তু নেশাযুক্ত, তবে তরল নয়; বরং প্রকৃতভাবে জমাট বস্তু, যেমনঃ তামাক, জায়ফল, আফিম ইত্যাদি, এ সব বস্তুর বিধান এই যে, যতটুকু সেবন করলে তাৎক্ষণিকভাবে নেশা সৃষ্টি করে বা শরীরের অধিক ক্ষতি সাধন করে তবে তা হারাম। আর যে পরিমাণ সেবন করলে নেশা সৃষ্টি করে না বা তার কারণে শরীরের কোন ক্ষতিও হয় না ততটুকু সেবন করা জায়েয। আর যদি তা মালিশের ওষুধাদিতে ব্যবহার করা হয়, তবে তাতে কোনও আপত্তি নেই।

অংশীদারিত্বের বর্ণনা

অংশীদারিত্ব দু'প্রকার ঃ

১. কোন বস্তু বা সম্পদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব ঃ যেমন ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে একাধিক উত্তরাধিকারীর অংশীদার হল, অথবা দু'জন যৌথভাবে অর্থ যোগান দিয়ে কোন জিনিস ক্রয় করল অথবা কোন ব্যক্তি দু'জনকে যৌথভাবে কোন জিনিস দান করল। এরূপ বস্তুর বিধান হল এই যে, এক অংশীদারের অনুমতি ব্যতিরেকে অপর অংশীদারের সে বস্তুতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়।

২. কোন কাজ-কারবারের চুক্তিতে অংশীদারিত্ব ঃ যেমন ঃ দুই ব্যক্তি পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হল যে, আমরা দু'জনে যৌথভাবে ব্যবসা করব। এরূপ অংশীদারিত্বের প্রকারভেদ ও বিধি-বিধান নিম্নরূপ ঃ

১. **মাসআলা ঃ** যৌথ কাজ-কারবারের চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্বের এক প্রকারকে (ফিকাহশাস্ত্রের পরিভাষায়) "শিরকতে 'ইনান" বলা হয়। অর্থাৎ, ন্যূনতম দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কিছু টাকার যোগান দিয়ে পরস্পরে একমত হল যে, তারা এ টাকায় কাপড় বা শস্য বা অন্য কিছু ক্রয় করে তদ্দারা ব্যবসা করবে। এরূপ চুক্তিতে শর্ত হল যে, উভয়ের মূলধন নগদ অর্থ হতে হবে। চাই সে নগদ অর্থ টাকা হোক বা স্বর্ণমুদ্রা বা পয়সা। সুতরাং যদি উভয় ব্যক্তি নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কোন আসবাব একত্র করে যৌথভাবে ব্যবসা করতে চায় অথবা একজনের মূলধন নগদ অর্থ ও অপরজনের মূলধন নগদ অর্থ ভিন্ন অন্য কিছু হয়, তবে এরূপ অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হবে না।

২. মাসআলা ঃ শিরকতে 'ইনানের ক্ষেত্রে মূলধনে কোন অংশীদারের অর্থ পরিমাণে বেশি এবং কারও কম হওয়াও জায়েয। লভ্যাংশে অংশীদারিত্ব অংশীদারদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। অর্থাৎ, যদি অংশীদারিত্বের নীতি এভাবে ধার্য হয় যে, মূলধন কারও কম ও কারও বেশি হলেও লভ্যাংশ সমান সমান বণ্টিত হবে অথবা মূলধনের অংশীদারিত্ব সমান হলেও লভ্যাংশ তেভাগা হারে বণ্টিত হবে, তবে তাও জায়েয।

৩. মাসআলা ঃ শিরকতে 'ইনানের মধ্যে প্রত্যেক অংশীদার যৌথমালিকানাভুক্ত সম্পদে যে কোন ধরনের ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করতে পারে, তবে শর্ত হল যে, সে কাজ চুক্তির খেলাফ না হতে হবে। কিন্তু এক অংশীদারের ঋণ অপর অংশীদারের নিকট চাওয়া যাবে না।

৪. মাসআলা ঃ এরূপ যৌথ কাজ-কারবারের চুক্তির স্থির হওয়ার পর কোন জিনিস ক্রয় করা হয় নি, অথচ ইত্যবসরে যৌথ অংশীদারিত্বভুক্ত সমস্ত মূলধনের অর্থ বা একজনের মূলধনের অর্থ বিনষ্ট হয়ে গেল, তবে এক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর তাদের একজনও যদি কিছু ক্রয় করে ফেলে এবং তারপর অপরের অর্থ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে অংশীদারিত্ব বাতিল হবে না। ক্রয়কৃত মাল উভয়ের বলে গণ্য হবে এবং মূলধনে অপর অংশীদারের যতটুকু অংশ রয়েছে সে অনুপাতে অপর অংশীদার থেকে ক্রয়কৃত মালের মূল্য নিয়ে নেবে। যেমন ঃ এক ব্যক্তির দশ টাকা ও অপর ব্যক্তির পাঁচ টাকা ছিল। দশ টাকার অংশীদার ব্যক্তি মাল ক্রয় করেছিল এবং পাঁচ টাকার অংশীদারের টাকা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পাঁচ টাকার অংশীদার ক্রয়কৃত মালে এক তৃতীয়াংশের মালিক। কাজেই দশ টাকার অংশীদার তার দশটাকার এক তৃতীয়াংশ নগদ অর্থ অর্থাৎ তিন টাকা পাঁচ আনা চার পয়সা অপর অংশীদার থেকে নিয়ে নেবে এবং পরবর্তীতে এ মাল অংশীদারিত্বভুক্ত মালস্বরূপ বিক্রিত হবে।

৫. মাসআলা ঃ এরূপ অংশীদারিত্বে উভয় ব্যক্তির মাল একত্র করা আবশ্যক নয়। কেবল মৌখিক প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে এরূপ অংশদারিত্ব সংঘটিত হয়।

৬. মাসআলা ঃ লভ্যাংশ হারাহারি হিসেবে ধার্য হওয়া চাই। অর্থাৎ, আধাআধি বা তেভাগা হারে হওয়া চাই। কিন্তু যদি এভাবে ধার্য হয় যে, এক ব্যক্তি লভ্যাংশ থেকে একশ' টাকা পাবে এবং অপর ব্যক্তি অবশিষ্ট টাকা পাবে, তবে এরূপ চুক্তি জায়েয হবে না।

৭. **মাসআলা ঃ** কাজ-কারবারের চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্বের এক প্রকারকে (ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায়) "শিরকতে সানায়ে" বলা হয় এবং এটাকে শিরকতে তাকাব্বুলও বলে। যেমনঃ দু'জন দর্জি বা দু'জন রংকারী এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, যার নিকট যে কাজ আসবে সে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাতে সে যে পারিশ্রমিক পাবে তা তারা উভয় আধাআধি বা তেভাগা বা চৌভাগা বা অন্য কোন আনুপাতিক হারে বন্টন করে নেবে। এরূপ চুক্তি করাও জায়েয।

৮. **মাসআলা ঃ** এরূপ চুক্তির ফলে (দুই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির) একজন যে কাজের ফরমায়েশ গ্রহণ করবে তা উভয়ের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। যেমনঃ এক অংশীদার একটি কাপড় সেলাইয়ের ফরমায়েশ গ্রহণ করল, তখন ফরমায়েশদাতা ব্যক্তি যেমন তার সেলাইকৃত কাপড় ফরমায়েশকৃত ব্যক্তির কাছে চাইতে পারে, তেমনি অপর অংশীদারের কাছেও চাইতে পারে। এমনিভাবে কাপড় সেলাইকারী যেমন তার পারিশ্রমিক চাইতে পারে, তেমনি অপর অংশীদারও সে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে। এমনিভাবে মূল সেলাইকারীকে পারিশ্রমিক দিয়ে দিলে মালিক যেরূপ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় তদ্রূপ অপর অংশীদারকে দিয়ে দিলেও সে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে।

৯. **মাসআলা ঃ** কাজ-কারবারে চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্বের এক প্রকারকে (ফিকাহশাস্ত্রের পরিভাষায়) "শিরকতে উজুহ" বলা হয়। অর্থাৎ, যারা এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাদের কোন মূলধন বা কারিগরী যোগ্যতা বা পেশা নেই। তারা পরস্পরে কেবল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তারা দোকানদারদের থেকে বাকিতে মাল নিয়ে বিক্রি করবে। এরূপ অংশীদারিত্বে ও এক অংশীদার অপর অংশীদারদের প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হবে। এরূপ অংশীদারিত্বে যে হারে অংশীদারিত্ব হবে সে হারে লভ্যাংশের অধিকারী হবে। অর্থাৎ, কেনা জিনিসকে যদি যৌথভাবে আধাআধি মালিকানাভুক্ত স্থির করা হয়, তবে লভ্যাংশও আধাআধি বন্টিত হবে। আর যদি ক্রয়কৃত মালকে তেভাগা হিসেবে যৌথ মালিকানাভুক্ত ধরা হয়, তবে লভ্যাংশও তেভাগা হারে বন্টিত হবে।

পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্ট সমাপ্ত। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দশম খণ্ডের কোন পরিশিষ্ট নেই। (নবম খণ্ডের পরিশিষ্ট আছে বটে, কিন্তু আমরা বিশেষ বিবেচনায় তা বাদ দিয়েছি। —অনুবাদক)

....

বেহেশতী গাওহার-এর পরিশিষ্ট

বেহেশতী জাওহার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَجْمَعِيْنَ -

মৃত্যু ও মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং কবর যিয়ারতের বর্ণনা

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ কর। কেননা, মৃত্যুর স্মরণ গুনাহসমূহকে বিদূরিত করে এবং নিকৃষ্ট দুনিয়া ও অনুদ্দেশ্য–অযথা কাজের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, মানুষ যখন মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করবে তখন দুনিয়ার প্রতি তার মন বসবে না এবং সে স্বভাবগতভাবে দুনিয়ার আসবাবের প্রতি ঘৃণাবোধ করবে। সে দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাবে এবং পরকালের ও পরকালের নেয়ামতাদির প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ এবং তথাকার যন্ত্রণাময় শাস্তির ভয় হবে। ফলে নেক আমলের ক্ষেত্রে তার উন্নতি হবে এবং সে গুনাহ-খাতা থেকে বেঁচে থাকবে। সমস্ত নেক কাজের মূল হল দুনিয়া বিমুখতা। যে পর্যন্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্যের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ হবে না সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার প্রতি পুরোপুরি অভিনিবেশ সম্ভব নয়। একথা বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য দুনিয়ার যে সকল জরুরী ও আবশ্যক বিষয়াদি অপরিহার্য সেগুলো কাম্য এবং দীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এরূপ দুনিয়াবী বিষয়াদি এ নিন্দাবাদের বহির্ভূত। এখানে যে দুনিয়াবী বিষয়াদির প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে তদ্বারা এমন বিষয়াদি উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা'আলার স্মরণের ব্যাপারে উদাসীন করে দেয়, তা যে পর্যায়েরই হোক না কেন। যে পর্যায়ের উদাসীনতা সৃষ্টি করে তার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনও সে পর্যায়েরই। সুতরাং এতে বুঝা গেল যে, মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, মৃত্যু-চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকা এবং এ বিপদসঙ্কুল মহাঅভিযাত্রার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা প্রত্যেক সজ্ঞান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

২. অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দৈনিক বিশবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধনাঢ্যতার অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ কর, তবে মৃত্যুর স্মরণ ধনাঢ্যতার অহমবোধ বিদূরিত

করে দেবে। অর্থাৎ, ধনী ব্যক্তি যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে তখন তার কাছে তার ধনাঢ্যতার কোন গুরুত্ববোধ থাকবে না, যদ্বারা মানুষের ঔদাসিন্য সৃষ্টি হয়। কেননা, সে বুঝতে পারবে যে, অনতিবিলম্বে এসব ধন-সম্পদ আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এসব সম্পদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার দ্বারা আমার কোন উপকার হবে না; বরং ক্ষতির কারণ হবে। কেননা, প্রিয়তমের বিরহ দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাঁ, এরূপ কাজ করা চাই, যা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে কাজে আসবে। অতএব এরূপ মনোভাবের কারণে সম্পদের মন্দ প্রভাব তার উপর পড়বে না। আর যদি তোমরা মৃত্যুকে অভাব ও দারিদ্র্যের অবস্থায় স্মরণ কর, তবে মৃত্যুর স্মরণ তোমাদেরকে তোমাদের (সাধারণ) জীবন যাপনের উপর সন্তুষ্ট করে দেবে। (কানযুল উম্মাল) অর্থাৎ, তোমাদের যে যৎসামান্য জীবিকা রয়েছে তাতেই তোমরা পরিতুষ্ট হয়ে যাবে এইজন্য যে, দুনিয়ার এ সামান্য কয় দিনের জীবন, সুতরাং দুঃখবোধ করে কি লাভ! অনতি বিলম্বে আল্লাহ তা'আলা এর উত্তম বিনিময় দান করবেন।

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রতিদিন জমি সত্তরবার করে ডেকে বলে, হে আদম সন্তান! যা ইচ্ছা কর এবং যা পছন্দ কর, খেয়ে নাও। আল্লাহর কসম, অতঃপর অবশ্যই আমি তোমাদের গোশ্‌ত ও চামড়া খাব। (কানযুল উম্মাল, ৮খ., পৃ. ৭৫) যদি কারও এ প্রশ্ন হয় যে, আমরা তো জমির আওয়াজ শুনি না, সুতরাং এতে আমাদের কি ফায়েদা? তার উত্তর এই যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণী থেকে যখন এটা জানা গেল যে, জমি এভাবে ডেকে থাকে তখন জমির আওয়াজে যেরূপ অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হত তদ্রূপ এখনও হওয়া চাই। কোন বিষয়ের অবগতির জন্য এটা কি একান্তই আবশ্যক যে, কেবল তার ধ্বনির মাধ্যমেই অবগতি হতে হবে? বরং উদ্দেশ্য হল, তার সম্পর্কে অবগতি হওয়া, চাই যে কোন পন্থায় হোক। যেমনঃ কোন ব্যক্তি শত্রুবাহিনীকে আসতে দেখে যেভাবে ভীত হয় এবং তাদেরকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করে, তেমনিভাবে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সূত্রে সংবাদ শুনেও ভীত হয়। কেননা, উভয় অবস্থায় শত্রুবাহিনীর আগমন সম্পর্কে তার অবগতি হয়েছে। যার ফলে সে ভীত হয়েছে এবং তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে বড় বা তাঁর সমমানের সত্যবাদী কোন সংবাদদাতা হতে পারে না। অতএব অন্য লোকদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী তো অগ্রগণ্যভাবে বিশ্বাস্য হওয়া চাই। কেননা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। হাদীসে আছে ঃ

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَبِالْيَقِيْنِ غِنًا

অর্থঃ "উপদেশদাতা হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট এবং স্বাবলম্বিতার জন্য জীবিকার প্রতি অবিচল আস্থাই যথেষ্ট।" (কানযুল উম্মাল) অর্থাৎ, মৃত্যুর উপদেশই যথেষ্ট। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তার দুনিয়া বিমুখতার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এবং যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থা রাখবে যে, প্রতিটি জীবকে এ পরিমাণ জীবিকা দেওয়া হয়, যা তার জন্য শ্রেয় তখন সে হবে যথেষ্ট অনপেক্ষ। এরূপ ব্যক্তি কখনও বিচলিত হয় না; বরং সম্পদের কারণে যে অনপেক্ষতা লাভ হয় তার চেয়ে এটা অনেক শ্রেয়। কেননা, এটা হারিয়ে যায় না। পক্ষান্তরে সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে। যে সম্পদ আজ আছে সেটা কালও থাকবে কি-না তা কেবা বলতে পারে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা তো চিরস্থায়ী। যাকে যতটুকু রিয্‌ক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে সে ততটুকু রিয্‌ক অবশ্যই পাবে। একথাটুকু ভাল করে বুঝে নেওয়া চাই।

৪. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে কাছে পেতে চান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় না এবং দুনিয়ার সম্পদ, মর্যাদা ও যাবতীয় বিষয়-আসয় থেকে পৃথক হতে চায় না আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। বলা বাহুল্য যে, মৃত্যু ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। অতএব মৃত্যু যেহেতু প্রকৃত প্রিয়জন (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা)-এর সাথে সাক্ষাতের একমাত্র উপায়, তাই মৃত্যু মু'মিনের নিকট কাম্য হওয়া চাই এবং এ জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা চাই, যাতে মৃত্যু অপছন্দনীয় মনে না হয়। অর্থাৎ, নেক আমল করবে, যাতে বেহেশতের আগ্রহে মৃত্যু তার কাছে প্রিয় মনে হয় এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, যাতে মৃত্যু অপছন্দনীয় মনে না হয়। কেননা, কঠোর আযাবের ভয়ে মৃত্যুর প্রতি গুনাহগারদের ভীষণ ভয় থাকে। কারণ, মৃত্যুর পরে শাস্তি হয়ে থাকে। অবশ্য নেককারদেরও আযাবের ভয় হয় এবং জান্নাতেরও আশা থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নেককারদের আযাবের ভয় থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর প্রতি তাদের পলায়নপর মনোভাব থাকে না এবং এ জন্য তারা বিচলিত হয় না, তাদের ভয়ের তুলনায় আশা-ভরসা প্রবল হয়ে যায়। এমনিভাবে এও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কাফের ও ফাসেকের মধ্যে আশা-ভরসার লেশ দেখা যায় না। এ কারণে মৃতু-কল্পনায় তারা অত্যন্ত ভীত হয়।

৫. হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি মৃত মানুষকে গোসল করায়, অতঃপর তার মন্দ বিষয়াদি, (যেমনঃ কারও চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়) গোপন রাখে (এ সম্পর্কিত সকল বিধি-বিধান বেহেশতী যেওয়ার ২য় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।) আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ-খাতা ঢেকে দেবেন। অর্থাৎ, সে পরকালে গুনাহর কারণে লাঞ্ছিত হবে না। আর যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকালে সুন্দুস নামক এক প্রকার চিকন রেশমের কাপড় পরাবেন। কোন কোন মূর্খ লোক মৃতের কাজ করতে ভয় পায় এবং এটাকে অশুভ মনে করে। এরূপ মনে করা নিতান্তই অযথা। তাদের কি মরতে হবে না? কাজেই সুচারুরূপে মৃতের সেবা করে বিশেষ ছওয়াব লাভ করবে এবং নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে এবং ভেবে দেখবে যে, আমি যেরূপ অপরের কাজ থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করি তদ্রূপ আমার মৃত্যুর পর যদি অন্যেরাও আমার থেকে দূরে সরে থাকে তখন আমার লাশের কি অবস্থা হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিদান দেওয়ার জন্য এ ধরনের লোকের হাতে সোপর্দ করতে পারেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয়, তাকে কাফন পরায় এবং তাকে হানূত (সুগন্ধি) লাগায় (হানূতের পরিবর্তে কর্ফুরও লাগানো যেতে পারে), তার লাশের খাটলি কাঁধে বহন করে, তার জানাযার নামায পড়ে এবং তার যেসব মন্দ বিষয়াদি দৃষ্টি গোচর হয় তা প্রকাশ না করে সে তার গুনাহ-খাতা থেকে এরূপ নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেরূপ সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল। (অর্থাৎ, তার সগীরা গুণাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আলিমগণ এরূপই অভিমত পোষণ করেছেন।)

৬. হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয়, অতঃপর তার দোষণীয় বিষয়াদি গোপন রাখে, তবে তার (সগীরা গুনাহসমূহ থেকে) চল্লিশটি বড় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে সুন্দুস ও ইসতাবরাক নামক রেশমী কাপড় পরাবেন। আর যে ব্যক্তি মৃতের জন্য কবর খনন করে এবং তাতে তাকে দাফন করে তাকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ অব্যাহত ছওয়াব দান করবেন, যেরূপ সেই মৃত ব্যক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত রাখার জন্য কোন ঘর ব্যবহার করতে দিলে ছওয়াব হয়।

উল্লেখ্য যে, মৃতের খেদমতের যে ফযীলত ও ছওয়াবের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো কেবল তখনই লাভ হবে, যখন শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে করা হয়। লোক দেখানো বা বিনিময় অর্জন ইত্যাদি উদ্দেশ্য না হয়। বিনিময় গ্রহণ করলে ছওয়াব হবে না। যদিও বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয আছে বটে, এবং কোন গুনাহ নেই, কিন্তু বিনিময় জায়েয হওয়া এক কথা, ছওয়াব পাওয়া ভিন্ন কথা। বিনিময় নিয়ে যে সব দীনী কাজ করা হয়, তন্মধ্যে কোন কোনটি তো এরূপ যে, তজ্জন্য বিনিময় গ্রহণ করা হারাম এবং বিনিময় গ্রহণ করার কারণে তার ছওয়াবও হয় না। আবার কোন কোন দীনী কাজ এরূপ আছে যার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয এবং বিনিময়ে অর্জিত সে মালও হালাল, কিন্তু তাতে ছওয়াব হয় না। খুব ভালভাবে যাচাই করে এর উপর আমল করা চাই। এটি বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়। তবে এসব বিষয় সম্পর্কে একটি কল্যাণকর ও জরুরী কথা আরয করছি, যাতে বিবেক সম্পন্নদের অবগতি হয়। কথাটি হল এই যে, যে সব দীনী কাজ করে বিনিময় নেওয়া জায়েয, সেগুলো বিনিময় নিয়ে করার কারণে কোন ছওয়াব লাভ হয় না। তবে কিছু কিছু শর্ত সাপেক্ষে ছওয়াব লাভও হয়। খুব মনোযোগ সহকারে শুনুন। কোন দরিদ্র ব্যক্তি, যার দীনী কাজ করে বিনিময় গ্রহণ ব্যতীত জীবন যাপন ও তার উপর অপরিহার্য ব্যয় নির্বাহের অন্য কোন উপায় নেই, সে কোন দীনী কাজ করে এ পরিমাণ বিনিময় গ্রহণ করতে পারে, যদ্বারা তার জরুরী প্রয়োজনাদির ব্যয় নির্বাহ হয়। অবশ্য তার এ মনোভাব থাকতে হবে যে, জীবিকা নির্বাহ করার মত অন্য কোন উপায় থাকলে কখনও এ বিনিময় গ্রহণ করতাম না এবং বিনিময় ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতাম, অথবা আল্লাহ তা'আলা যদি জীবিকা নির্বাহের মত অন্য কোন উপায় এখনও সৃষ্টি করে দেন তবে আমি এ বিনিময় গ্রহণ করব না; বরং বিনিময় ব্যতিরেকে কাজ করব, তবে এরূপ ব্যক্তি দীনী খেদমতের ছওয়াব পাবে। কেননা, তার নিয়্যত হল দীন প্রচার করা, কিন্তু জীবিকার তাকিদে বিনিময় গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু জীবিকা অন্বেষণও অপরিহার্য এবং জীবিকা অর্জন করাও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনেরই নামান্তর তাই এ নিয়্যত অর্থাৎ, জীবিকা অর্জনের ছওয়াবও পাবে এবং নিয়্যত ভাল হওয়ার কারণে উভয় ছওয়াব পাবে। তবে এর জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আমল করতে হবে। অযথা ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কে জরুরী মনে করে তজ্জন্য বাহানা করা সেই অন্তর্যামীর নিকট চলবে না। তিনি সকলের মনের ইচ্ছা ও বাসনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ বিষয়টি ফাতাওয়ায়ে শামী ইত্যাদি গ্রন্থাবলী থেকে অত্যন্ত তাহকীক সহকারে

লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, যার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শর্তাবলী পাওয়া যায়, অতঃপর সে নেক কাজের বিনিময় গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে যদি সে সব নিয়্যতও পাওয়া যায়, যার কারণে ছওয়াব লাভ হয় তখনও সে ছওয়াব পাবে বটে, কিন্তু এতে তাওয়াক্কুলের ফযীলত পাওয়া যাবে না। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি লক্ষণীয়। সকল মুসলমান বিশেষ করে আলিমদের এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য ও সতর্কতার প্রয়োজন যে, মহান সৃষ্টিকর্তার দীনের খেদমত করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন না করা এবং একান্ত ঠেকা ব্যতিরেকে দুনিয়ার অতি সামান্য সাময়িক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আল্লাহ তা'আলার সাথে কি এ ধরনের অসৌজন্যের প্রকাশ নয়? আমাদের উদ্দেশ্য হল (ভালোর প্রতি) উৎসাহ প্রদান করা ও ভ্রান্তি বিদূরিত করা। বৈধ বিষয়াদির মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টির অধিকার আমাদের নেই। তবে এটুকু অবশ্যই বলব যে, ছওয়াব আমাদের সকলের প্রয়োজন। সুতরাং যার ইচ্ছা (ছওয়াবের সংখ্যা) হ্রাস করুক, আর যার ইচ্ছা বৃদ্ধি করুক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন এবং তিনি সম্যক অবগত ও সবিশেষ দ্রষ্টা হিসেবে যথেষ্ট।

৭. হাদীসে আছে যে, যে মু'মিন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে তার প্রথম পুরস্কার এই যে, তার (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৮. হাদীস ঃ যে মুসলমানের জানাযার নামাযে মুসলমানগণ তিনটি সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে নামায় আদায় করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় (অর্থাৎ, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।)

৯. হাদীস ঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করে না এরূপ চল্লিশজন মুসলমান যদি কোন মুসলমানের জানাযার নামায পড়ে, তবে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ (অর্থাৎ, দু'আ) গ্রহণ করে নেওয়া হবে (অর্থাৎ, জানাযার নামায, যা মূলতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ স্বরূপ, তা কবুল করে নেওয়া হবে এবং সে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।)

১০. হাদীস ঃ কোন মুসলমানের জানাযার নামাযে একদল লোক সমবেত হয়ে নামায পড়লে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ (অর্থাৎ, দু'আ) গ্রহণ করে নেওয়া হবে।

১১. হাদীস ঃ (ন্যূনতম) একশজন মুসলমান যদি কোন মৃত মুসলমানের জানাযার নামায পড়ে, তবে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ তথা দু'আ কবুল করে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত হয়ে যাবে।)

১২. হাদীস ঃ যে ব্যক্তি জানাযার খাটলির চারটি পায়া কাঁধে নেয় তার (সগীরা গুনাহসমূহ থেকে) চল্লিশটি বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)

১৩. হাদীস ঃ জানাযার সাথে গমনকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে জানাযার সাথে গমনকালে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করে এবং জানাযা মাটিতে রাখার পূর্বে বসে না। আর যে ব্যক্তি মুষ্ঠিভরে তিন বার কবরে মাটি দেয় সে প্রচুর পরিমাণে ছওয়াব লাভ করে।

১৪. হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন কর। কেননা, মৃত ব্যক্তি তার মন্দ প্রতিবেশীদের কারণে কষ্ট পায়। (অর্থাৎ, ফাসেক ও কাফেরদের কবরের মাঝে দাফন করার কারণে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। কষ্টের কারণ এই যে, কাফের ও ফাসেকের উপর যখন আযাব হয় তখন তারা কান্নাকাটি ও চিৎকার করে। যার ফলে তার কষ্ট হয়। যেমন মন্দ প্রতিবেশীর কারণে জীবিত ব্যক্তির কষ্ট হয়।)

১৫. হাদীস ঃ এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, জানাযার সাথে গমনকালে অধিক পরিমাণে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়। জানাযার সাথে গমনকালে যিক্‌র করলে নীরবে যিক্‌র করবে। কেননা, ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছে যে, জানাযার সাথে গমনকালে উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌র করা মাকরূহ।

১৬. হাদীস ঃ ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এক বিশেষ কারণে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সে কারণ এখন আর নেই। জেনে রাখ, এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কেননা, কবর যিয়ারত মনকে নরম করে। মন নরম হলে নেক আমল করার সুযোগ হয়। আর তোমরা কবরের নিকট শরীয়ত পরিপন্থী কথা বলবে না।

১৭. হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবর যিয়ারত করা সুন্নত, বিশেষ করে জুমুআর দিন। এক হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতি জুমুআর দিন পিতা-মাতার বা (শুধু) পিতার বা (শুধু) মাতার কবর যিয়ারত করে তার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দেওয়া হবে এবং সে

পিতা-মাতার অনুগত সন্তান হিসেবে তার (আমলনামায়) লিখে দেওয়া হবে। (হাদীসটি ইমাম বায়হাকী মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন।)

তবে কবরের তওয়াফ করা, কবরে চুমু দেওয়া নিষিদ্ধ। চাই তা কোন নবীর কবর হোক বা কোন ওলীর বা অন্য কারও। কবরের নিকট যেয়ে প্রথমে এভাবে সালাম করবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ -

তিরমিযী ও তাবারানী শরীফে কবরস্থ মৃতদেরকে সালাম দেওয়ার জন্য উপরিউক্ত শব্দাবলী বর্ণিত হয়েছে। সালাম দেওয়ার পর কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে এবং মৃত (কবরস্থ) ব্যক্তির দিকে মুখ করে যতটুকু সম্ভব কুরআন মজীদ পড়বে।

১৮. হাদীস ঃ যে ব্যক্তি কবরস্থানে গমন করে ১১ বার সূরা ইখলাস পড়ে মৃতদের রূহের উপর ছওয়াব পৌঁছে দেয় তাকেও মৃতদের সমপরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হবে।

১৯. হাদীস ঃ অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গমন করে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাসুর পড়ে কবরস্থ মৃতদের রূহে পৌঁছায়, তার জন্য মৃতরা সুপারিশ করবে।

২০. হাদীস ঃ আরেক হাদীসে আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা মৃতদের আযাব শিথিল করে দেন এবং পাঠকারীকে মৃতদের সংখ্যা হিসেবে ছওয়াব দেওয়া হবে।

উপরিউক্ত তিনটি হাদীস সনদ সহকারে মূল আরবীতে নিম্নে লিখে দেওয়া হয়েছে।

২১. হাদীস ঃ যখন কোন ব্যক্তি এমন কারও কবরের পাশ দিয়ে যায়, যাকে সে জীবদ্দশায় চিনত, অতঃপর সে কবরস্থ মৃতকে সালাম দেয় তখন সে মৃত ব্যক্তি তাকে চিনে ফেলে এবং সে সালামের জওয়াব দেয় (যদিও সালামদানকারী সে উত্তর শুনতে পায় না বটে।)

(١) أَخْرَجَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِيْ فَضَائِلِ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا : مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ

أَحَدٌ" أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ ـ

অর্থ : সূরা ইখলাসের ফাযায়েল সম্পর্কে আবূ মুহাম্মদ সমরকন্দী হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে গমন কালে ১১ বার "কুল হুয়াল্লাহ" পড়ে কবরস্থ মৃতদের রূহে ছওয়াব পৌঁছে দেয়, তবে সে কবরে দাফনকৃত মৃতদের সংখ্যার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে।

(٢) أَخْرَجَ أَبُوالْقَاسِمِ سَعْدُبْنُ عَلِيِّ الزَّنْجَانِيُّ فِيْ فَوَائِدِهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا : مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَانُوْا شُفَعَاءُ لَهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

অর্থ : আবুল কাসিম সা'দ ইবনে আলী যানজানী তাঁর রচিত "আল-ফাওয়ায়িদ" নামক গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাসুর পড়ে বলে হে আল্লাহ! আমি আপনার কালাম থেকে যা কিছু পড়েছি তার ছওয়াব কবরবাসী মু'মিন নর-নারীকে দান করলাম, তার জন্য সে কবরবাসীরা আল্লাহ তা'আলার কাছে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।

(٣) أَخْرَجَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ صَاحِبُ الْخَلَّالِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُوْرَةَ يٰسٓ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ ـ

هٰذِهِ اَحَادِيْثُ اَوْرَدَهَا الْإِمَامُ السُّيُوْطِيُّ فِيْ شَرْحِ الصُّدُوْرِ بِشَرْحِ أَحْوَالِ الْمَوْتٰى وَالْقُبُوْرِ صـ ١٢٣ مَطْبُوْعَةَ مِصْرَ، قَالَ الْمُعَلِّقُ عَلٰى

رِسَالَةِ بِهِشْتِي گَوْهَر : اَلْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ يَدُلَّانِ ظَاهِرًا عَلٰى اَنَّ الثَّوَابَ الْحَاصِلَ مِنَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ يَصِلُ اِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَا يَتَجَزّٰى تَأَمَّلْ -

অর্থ ঃ আব্দুল আযীয সাহিবুল খাল্লাল নিজ সনদে হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি কবরস্থানে গমন করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তখন তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীর আযাব শিথিল করে দেন এবং উক্ত সূরা পাঠকারী সেই কবরস্থ লোকদের সংখ্যার হিসেবে ছওয়াব লাভ করবে।

এ হাদীসগুলো ইমাম সুয়ূতী তাঁর شَرْحُ الصُّدُوْرِ بِشَرْحِ أَحْوَالِ الْمَوْتٰى وَالْقُبُوْرِ গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। মিসরীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বেহেশতী গাওহার-এর টীকাকার বলেন, প্রথম ও তৃতীয় হাদীসটি বাহ্যতঃ এ কথাই বুঝায় যে, ছওয়াব জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের প্রতি কোন রকম বন্টন ব্যতিরেকে সমানভাবে পৌঁছে। বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

কবরস্থ মৃতদের সমান ছওয়াব পাওয়ার অর্থ এই যে, ছওয়াব বখশীশকারী একটি নেক কাজ করেছে। তার বদলে সে সেই কবরস্থানে দাফনকৃত মৃতদের সংখ্যার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যখন দাফনকৃত সকল মৃতকে নিজ রহমতে কোন বন্টন ব্যতিরেকে পূর্ণ ছওয়াব দান কররেন, তখন পাঠকারীও তদ্রূপ ছওয়াব পাবে। যেন সে প্রত্যেক মৃতকে পৃথক পৃথকভাবে সূরা পাঠ করে ছওয়াব বখশিশ করেছে।

কতিপয় মাসআলা[১]

১. প্রশ্ন ঃ নামাযের জামাআতে ইমাম কেরাআত শুরু করার পর যদি কোন ব্যক্তি এসে জামাআতে শরীক হয়, তখন তার ছানা (অর্থাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা) পড়তে হবে কি-না। যদি পড়তে হয় তবে কখন, নিয়্যত বাঁধার সাথে সাথেই, না পরে?

উত্তর ঃ না পড়া চাই।

২. প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি রুকূ'তে এসে ইমামের সাথে শরীক হল, এমতাবস্থায় সে সেই রাকআতটি পেল বটে, কিন্তু তার ছানা পড়া ছুটে গেল। এখন সে কি

১. প্রশ্ন আকারে এ সাতটি মাসআলা হযরত থানবী (রহ) কর্তৃক সংযোজিত।

দ্বিতীয় রাকআতে ছানা পড়বে, নাকি অন্য কোন রাকআতে কিংবা তার ছানা পড়তে হবে না?

উত্তর ঃ কোন রাকআতেই পড়বে না।

৩. প্রশ্ন ঃ কেউ ভুলে রুকূ'র তাসবীহ সিজদায় পড়ল অর্থাৎ, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى -এর পরিবর্তে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়তে থাকল অথবা তার বিপরীত করল তবে তার কি সিজদায়ে সাহ্ব দিতে হবে, না কি নামাযে অন্য কোন ত্রুটি হবে?

উত্তর ঃ এর দ্বারা সুন্নত তরক হল, সুন্নত তরক হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয় না।

৪. প্রশ্ন ঃ কেউ ভুলে রুকূ'র তাসবীহ সিজদায়ে সাহ্বে বলে ফেলেছে, তারপর সিজদার মধ্যেই স্মরণ হল যে, এটা তো রুকূ'র তাসবীহ। এখন সিজদার তাসবীহ স্মরণ হওয়ার পর পুনরায় সিজদার তাসবীহ নেওয়া চাই, নাকি রুকূ'র তাসবীহই যথেষ্ট হবে।

উত্তর ঃ যদি সে ইমাম বা একাকী নামাযরত হয়, তবে সে সিজদার তাসবীহ বলে নেবে। আর যদি মুক্তাদী হয় তবে ইমামের সাথে উঠে যাবে।

৫. প্রশ্ন ঃ নামায পড়ার সময় হাই উঠা বন্ধ না হলে মুখে হাত দিতে হবে কি-না?

উত্তর ঃ এমনিতে হাই উঠা না থামলে হাত দ্বারা ঠেকানো জায়েয।

৬. প্রশ্ন ঃ সিজদার সময় যদি টুপি পড়ে যায়, তবে তা পুনরায় হাত তুলে মাথায় রাখা চাই, নাকি খোলা মাথায় নামায পড়বে?

উত্তর ঃ যদি আমলে কাছীর না করে পারা যায়, তবে মাথায় তুলে নেওয়া উত্তম।

৭. প্রশ্ন ঃ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর যখন কোন সূরা শুরু করবে তখন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে। আর যদি দুই রুকূ' বিশিষ্ট কোন সূরার প্রথম রুকূ' প্রথম রাকআতে পড়ে, তবে সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে যখন সেই সূরারই দ্বিতীয় রুকূ' শুরু করবে, তখন বিসমিল্লাহ বলবে কি বলবে না?

উত্তর ঃ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুসতাহাব, রুকূ'র শুরুতে নয়।

১. মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে মিহরাব ব্যতীত মসজিদের অন্য কোথাও ইমামের দাঁড়ানো মাকরূহ। তবে মিহরাবে দাঁড়ানোর সময় পা মিহরাবের বাইরে থাকা চাই।

২. মাসআলা ঃ সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে যে দাওয়াত করা হয় তা কবূল না করা উত্তম।

৩. মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দানের বিনিময় গ্রহণ করা হরাম। তবে সাক্ষীর যদি জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে সে যে সময়টুকু ব্যয় করেছে সে হিসেবে তার ও তার পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে গ্রহণ করা জায়েয।

৪. মাসআলা ঃ দাওয়াতের মজলিসে যদি শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ হয় এবং তা সেখানে পৌঁছার পূর্বে জানা যায়, তবে দাওয়াত কবুল করবে না। অবশ্য যদি দৃঢ় আশা থাকে যে, আহুত ব্যক্তি যাওয়ার কারণে তার লজ্জায় ও তার মর্যাদার খাতিরে সেই শরীয়ত গর্হিত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তবে যাওয়া উত্তম। আর যদি সেখানে পৌঁছার পূর্বে জানা না থাকে এবং সেখানে পৌঁছে যায় এবং পৌঁছে তা দেখতে পায়। এ ক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি ধর্মীয় নেতা বা মুরুব্বী পর্যায়ের হয়, তবে সে ফিরে আসবে। আর যদি সে ধর্মীয় নেতা বা মুরুব্বী পর্যায়ের না হয়; বরং সাধারণ মানুষ হয় এবং শরীয়ত-গর্হিত বিষয়টি খাবারের আসরেই থাকে, তবে সেও সেখানে বসবে না। আর যদি তা অন্য কোথাও হয়, তবে সে অনুন্যোপায় হয়ে বসবে। তবে উত্তম হল বাড়ির মালিককে বুঝানো। যদি সেই সাহস না থাকে, তবে ধৈর্য ধারণ করবে এবং অন্তর থেকে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর যদি কোন ধর্মীয় নেতা বা মুরুব্বী না থাকে, তবে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি থাকে লোকেরা যার অনুসরণ করে, তবে সেও এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতা বা মুরুব্বীর পর্যায়ে গণ্য হবে।

৫. মাসআলা ঃ ব্যাংকে টাকা জমা রেখে তার সুদ গ্রহণ করা তো নিশ্চিতভাবে হারাম। কোন কোন লোক কেবল হেফাজতের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, তারা সুদ গ্রহণ করে না। কিন্তু এটা জানা কথা যে, ব্যাংক সেটাকে আটক করে রাখবে না; বরং সুদী কাজ-কারবারে বিনিয়োগ করবে। এ কারণে এতেও এক প্রকার গুনাহর সহযোগিতা হয়, যা সাবধানতার পরিপন্থী। সুতরাং টাকা হেফাজতে রাখার জন্য সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন পন্থা হচ্ছে এই যে, ব্যাংকের সিন্দুকের এক দু'টি ড্রয়ার (বা যা প্রয়োজন হয়) ভাড়া নেবে এবং সেখানে টাকা রাখবে। বেশি টাকা হলে সম্পূর্ণ সিন্দুক ভাড়া নেবে। টাকা রাখার প্রয়োজন হলে সেখানে রাখবে এবং প্রয়োজন হলে সেখান থেকে বের করে নেবে। এভাবে টাকাও সংরক্ষিত থাকবে এবং সুদ ইত্যাদির গুনাহও হবে না। এভাবে সম্পূর্ণ সিন্দুক বা তার এক দু'টি ড্রয়ার ভাড়া নেওয়াকে ব্যাংকের

পরিভাষায় "লকার"-এ রাখা বলে। এতে অবশ্য টাকার লাভ আসার পরিবর্তে নিজের পক্ষ থেকে লকার ভাড়ার টাকা শোধ করতে হবে। তবে এক বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের পবিত্র উপার্জনে অবৈধ ও নাপাক সুদের অর্থ মিশ্রণ থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে, যা একজন মুসলমানের বিরাট লক্ষ্য। এ মহান উদ্দেশ্যে লকার ভাড়ার ব্যয় নগণ্য বটে।[১]

৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি পায়খানা বা পেশাব করবে তাকে সালাম দেওয়া হারাম। এমতাবস্থায় সালাম দেওয়া হলে তার উত্তর দেওয়াও জায়েয নয়।

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ কতিপয় লোকের মধ্য থেকে কারও নাম উল্লেখ করে সালাম করে, যেমন বলল, হে যায়েদ! আসসালামু আলাইকা, তবে যাকে সালাম দেওয়া হয়েছে সে ব্যতীত অন্য কেউ উত্তর দিলে সেটা উত্তর হিসেবে গণ্য হবে না। যাকে সালাম দেওয়া হয়েছে তার সালামের উত্তর দেওয়ার ওয়াজিব দায়িত্ব থেকে যাবে। সে যদি উত্তর না দেয়, তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু এভাবে সালাম করা সুন্নতের খেলাফ। সুন্নত তরীকা হল, মজলিসের কারও নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করা এবং "আসসালামু আলাইকুম" বলে সালাম দেওয়া। আর যদি কোন একজনকেই সালাম করতে হয় তবু এভাবেই সালাম করবে। এমনিভাবে সালামের উত্তর যাকে দেওয়া হচ্ছে সে যদি একজনই হয় বা বেশি হয় সর্বাবস্থায় "ওয়া আলাইকুমুসসালাম" বলা চাই।

৮. মাসআলা ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, স্বল্প সংখ্যক লোকজন অধিক সংখ্যককে এবং কমবয়স্ক অধিক বয়স্ককে সালাম দেবে। যদি উপরিউক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়, যেমন অধিক সংখ্যক লোকজন স্বল্প সংখ্যককে বা অধিক বয়স্ক কম বয়স্ককে সালাম দিল, তবে তাও জায়েয। তবে উত্তম হল সেটিই, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (কিয়াস নির্ভর মাসআলা)

---

১. এ ৫নং মাসআলাটি মূল পরিশিষ্টে ভিন্ন রকম ছিল। পরিশিষ্টের এ মাসআলাগুলো হযরত থানবী (রহঃ)-এর লেখা নয়। এগুলো পরিশিষ্ট রচনাকারীর লেখা। মূল মাসআলাটি ছিল এ রকম ঃ "অনেকে সুদী ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে এবং তার মুনাফা গ্রহণ করে না। যেহেতু এটা নিশ্চিত যে, ব্যাংকে টাকা আটকে রাখা হয় না; বরং কাজ-কারবারে বিনিয়োগ করা হয়, তাই সে টাকা আমানত থাকে না, বরং ঋণে পরিণত হয়। যদিও টাকা জমাকারী সুদ গ্রহণ করে না, কিন্তু ঋণ দিয়ে সুদ গ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা হয়। অথচ গুনাহর সহযোগিতা করাও গুনাহ। এ কারণে ব্যাংকে টাকা জমা রাখাও জায়েয নয়। অর্থাৎ, এমনিতে টাকা জমা রাখাও সুদের জন্য টাকা জমা রাখারই নামান্তর।" এখানে ব্যাংকে টাকা জমা রাখাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা বর্তমান যুগে পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। এ কারণে হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর পরামর্শক্রমে মাসআলাটির ইবারত পাল্টিয়ে শোধন করে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংকে টাকা জমা রাখার একটি সহজ পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমল করার তাওফীক দান করুন (-টীকাকার)

৯. মাসআলা ঃ কোন যুবতী বা মাঝবয়সী মহিলাকে কোন গায়রে মাহরাম পুরুষের সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ। এমনিভাবে তাদেরকে চিঠিতে সালাম লিখে পাঠানো বা কারও মাধ্যমে সালাম বলে পাঠানো এবং পুরুষদেরকে কোন গায়রে মাহরাম মহিলার সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, এসব ক্ষেত্রে জটিল ফেত্‌নার আশঙ্কা রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ফেত্‌নার কার্যকারও ফেত্‌নারই নামান্তর। হাঁ, যদি (কোন গায়রে মাহরাম পুরুষ কর্তৃক) কোন বৃদ্ধা মহিলাকে বা (কোন গায়রে মাহরাম মহিলা কর্তৃক) কোন বৃদ্ধ পুরুষকে সালাম দেওয়া হয়, তবে তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে বৃদ্ধাবস্থায়ও গায়রে মাহরামের সাথে এরূপ সম্পর্ক রাখা সমীচীন নয়। হাঁ, যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ফেতনার আশঙ্কা না থাকে তবে সে কথা ভিন্ন।

১০. মাসআলা ঃ বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে কাফের ও ফাসেককে সালাম দেবে না। তবে যদি একান্ত কোন প্রয়োজন হয়, তবে সালাম দেওয়াতে আপত্তি নেই। যদি এরূপ ব্যক্তির সাথে সালাম-কালাম করলে তার হেদায়াতের আশা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও সালাম করবে।

১১. মাসআলা ঃ যারা ইলমী আলোচনা অর্থাৎ মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করছে, পড়ছে বা পড়াচ্ছে বা একজন ইলমী আলোচনা করছে অন্যেরা শুনছে, তবে এরূপ লোকজনকে সালাম দেবে না। দিলে গুনাহগার হবে। এমনিভাবে আযান ও ইকামতের সময়েও মুয়ায্‌যিন বা অন্য কাউকে সালাম দেওয়া মাকরূহ। বিশুদ্ধ অভিমত মুতাবিক, এ সকল অবস্থায় সালাম দেওয়া হলেও তার উত্তর দেবে না।

বেহেশতী গাওহার-এর দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ঃ

পিতা-মাতার যথাযথ অধিকার

("দ্বিতীয় পরিশিষ্ট" শিরোনামে যে বিষয়বস্তু এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কর্তৃক লিখিত। এতে পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে তত্ত্বপূর্ণ ও সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বেহেশতী যেওয়ার ৫ম খণ্ডে অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা যেহেতু নারী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য মিশ্র বিধি-বিধান ছিল, পক্ষান্তরে এ আলোচ্য বিষয়বস্তুটি পুরুষদের সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট তাই এটাকে বেহেশতী গাওহারের সাথে সংযোজন করা সঙ্গত মনে হয়েছে। অতএব এটাকে বেহেশতী যেওয়ার ৫ম খণ্ডের পরিশিষ্ট মনে করা চাই। সেই আলোচ্য বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ (বেহেশতী গাওহারের টীকাকার)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ও নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমানত তার হকদারকে পৌঁছে দিতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং (এও নির্দেশ দিচ্ছেন যে,) যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।

(সূরা নিসা ঃ আয়াতঃ ৫৮)

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাপ্তার্থ থেকে দু'টি বিধান বুঝা গেল ঃ (১) হকদারদের আবশ্যকীয় হকসমূহ আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। (২) একজনের হক আদায় করতে গিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা নাজায়েয। এ দু'টি মৌলিক বিধানের সাথে সম্পর্কিত দু'টি বিষয় সম্পর্কে আমি তাহকীক পেশ করার ইচ্ছা রাখি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পিতা-মাতার আবশ্যিক ও অনাবশ্যিক হকসমূহ নির্ণিত করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পিতা-মাতার হক এবং স্ত্রী ও সন্তানাদির হকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তখন ন্যায়ানুগ নীতিতে প্রত্যেকের প্রকৃত হক সাব্যস্ত করা।

এ তাহকীকের প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, অসংখ্য ঘটনায় দেখা গেছে, কোন কোন অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও লাগামহীন লোকজন পিতা-মাতার হক আদায়ে যথেষ্ট ত্রুটি করে এবং পিতা-মাতার আনুগত্যের আবশ্যকতা জ্ঞাপক কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাসমূহকে উপেক্ষা করে তাদের হক অনাদায়ের অভিশাপ নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নেয়। আবার কোন কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পিতা-মাতার হক আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, যার ফলে অন্যান্য হকদারদরে হক, যেমনঃ স্ত্রী বা সন্তানাদির হক নষ্ট হয়। স্ত্রী ও সন্তানাদির হকের প্রতি যত্নশীল থাকাও যে ওয়াজিব, কুরআন ও হাদীসের সে সকল বর্ণনার প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের হক নষ্ট করার খেসারত নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়। আবার কোন কোন ব্যক্তি এমনও আছে, যারা কারও হক নষ্ট করে না, কিন্তু সে সকল হক আদায় করা ওয়াজিব নয়, সেগুলোকে ওয়াজিব মনে করে সেগুলো আদায় করার চেষ্টা করে। যেহেতু কখনও কখনও সেগুলো আদায় করতে সমর্থ হয় না, তাই মন খারাপ হয় এবং অন্তরে খট্‌কা জাগে যে, শরীয়তের কোন কোন বিধি-বিধান পালন করা অসম্ভব ও কষ্টকর। এভাবে তাদের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিক থেকে এরূপ লোককেও হকদারের আবশ্যক হক বিনষ্টকারীরূপে গণ্য করা যায় এবং সেই হকদার হল তার আত্মা। কেননা, আত্মারও কিছু কিছু আবশ্যক হক রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"নিশ্চয় তোমার আত্মারও তোমার কাছে প্রাপ্য হক রয়েছে"

সেই আবশ্যক হকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হল নিজের দীনের হেফাজত করা। অতএব পিতা-মাতার অনাবশ্যক হককে আবশ্যক মনে করার কারণেই যেহেতু উক্ত গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, তাই আবশ্যক হক ও অনাবশ্যক হকের প্রভেদ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ প্রভেদ বুঝার পরও যদি কেউ কার্যতঃ এ সকল হককে নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়, কিন্তু বিশ্বাসগতভাবে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, তবে তার দীন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্মুখীন হবে না। তখন সে তার সংকটকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্মফল হিসেবে মেনে নেবে এবং যেটুকু নিজের উপর চাপিয়ে নেবে সেটা হবে তার উচ্চ মনোবলের পরিচায়ক। অবশ্য এ ধারণার মধ্যেও এক প্রকার রিপুবৃত্তি রয়েছে যে, অমুক হক আদায় করা আমার দায়িত্বভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তা আমি পালন করে যাচ্ছি। আর সে যখন ইচ্ছা করবে তখন দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে।

মোটকথা, শরীয়তের বিধি-বিধান জানার মধ্যে সর্বাবস্থায় যাবতীয় কল্যাণই নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে যাবতীয় ক্ষতিই আর ক্ষতি। তাই এ প্রভেদ বর্ণনার জন্য এ কয়টি ছত্র লিপিবদ্ধ করছি। এ ভূমিকার পর প্রথমে এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীস ও ফিক্‌হের জরুরী রেওয়ায়াতসমূহ একত্র করব। তারপর সে সকল রেওয়ায়াত থেকে গৃহীত বিধি-বিধান বর্ণনা করব এবং এ আলোচ্য বিষয়টিকে "তা'দীলু হুকুকিল ওয়ালিদাইন" (পিতা-মাতার ন্যায্য অধিকারের স্বরূপ) নামে নামকরণ করা হলে তা অসমীচীন হবে না বলে মনে করি। আল্লাহ তা'আলাই সাহায্য প্রার্থনাস্থল এবং তাঁরই উপর ভরসা।

فِى الْمِشْكٰوةِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ تَحْتِىْ اِمْرَأَةٌ اُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِىْ طَلِّقْهَا فَاَبَيْتُ، فَاَتٰى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ـ

فِى الْمِرْقَاةِ : "طَلِّقْهَا" اَمْرُ نَدْبٍ، اَوْ وُجُوْبٍ اِنْ كَانَ هُنَاكَ بَاعِثٌ اٰخَرُ، وَقَالَ الْاِمَامُ الْغَزَالِىْ فِى الْاِحْيَاءِ (ج۲، ص ۲٦ كشورى) فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ : فَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ حَقَّ الْوَالِدِ مُقَدَّمٌ، لٰكِنَّ وَالِدًا يَكْرَهُهَا لَا لِغَرَضٍ فَاسِدٍ مِثْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

মিশকাত শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল, আমি তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু উমর (রা.) তাকে অপছন্দ করতেন। তাই তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। তখন হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে গিয়ে বিষয়টি তাকে জানান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বক্তব্য শুনে আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ মিরকাতে বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত হাদীসে "তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও" কথাটি পরামর্শমূলক নির্দেশ। অথবা এখানে অন্য কোন কারণ থাকলে তবে অপরিহার্য নির্দেশ-এর অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম গাযালী (রহ.) এ হাদীস প্রসঙ্গে ইহয়াউল 'উলূম গ্রন্থে বলেন, উক্ত হাদীস থেকে পিতার হক অগ্রগণ্য বলে বুঝা যায়, তবে পিতার অপছন্দটি অন্যায় উদ্দেশ্যমূলক না হওয়া চাই, যেমন হযরত উমরের অপছন্দটি কোন অন্যায় উদ্দেশ্যে ছিল না। (ইহয়াউল 'উলূম, ২খ., পৃ.২৬, কিশওয়ারী)

فِى الْمِشْكٰوةِ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ : لَاتَعْصِيَنَّ وَالِدَيْكَ، وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ ـ الحديث

فِى الْمِرْقَاةِ شَرْطٌ لِلْمُبَالَغَةِ بِاِعْتِبَارِ الْاَكْمَلِ اَيْضًا اَمَّا بِاِعْتِبَارِ اَصْلِ الْجَوَازِ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقُ زَوْجَةٍ اَمَرَاهُ بِفِرَاقِهَا، وَاِنْ تَأَذَّيَا بِبَقَاءِهَا اِيْذَاءً شَدِيْدًا لِاَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ بِهَا فَلَا يُكَلِّفُهُ لِاَجْلِهِمَا اِذْ مِنْ شَانِ شَفْقَتِهِمَا اَنَّهُمَا لَوْ تَحَقَّقَا ذٰلِكَ لَمْ يَأْمُرَاهُ بِهٖ فَاِلْزَامُهُمَا بِهٖ مَعَ ذٰلِكَ حُمْقٌ مِنْهُمَا وَلَا يُلْتَفَتُ اِلَيْهِ وَكَذٰلِكَ اِخْرَاجُ مَالِهٖ اِنْتَهٰى مُخْتَصَرًا ـ

قُلْتُ : وَالْقَرِيْنَةُ عَلٰى كَوْنِهٖ لِلْمُبَالَغَةِ اِقْتِرَانُهٗ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ : لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَاِنْ قُتِلْتَ اَوْحُرِّقْتَ، فَهٰذَا لِلْمُبَالَغَةِ قَطْعًا، وَاِلَّافَنَفْسُ الْجَوَازِ بِتَلَفُّظِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَاَنْ يَّفْعَلَ

مَا يَقْتَضِى الْكُفْرَتَابِتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ .... الْاٰيَةَ فَافْهَمْ ـ

"মিশকাত শরীফে হযরত মু'আয (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে,..... এ বলে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণ করো না, যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলে।

মিরকাতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার পুরোপুরি আনুগত্যের অপরিহার্যতা বুঝাবার জন্য হলেও এটা আতিশয্যব্যাঞ্জক শর্ত। অন্যথায় মূল বৈধতার দিক থেকে লক্ষণীয় যে, যে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে দিতে পিতা-মাতা নির্দেশ দেন তাকে তালাক দেওয়া তার উপর আবশ্যক নয়। যদিও সে স্ত্রী থাকার কারণে পিতা-মাতা ভীষণ কষ্ট পান বটে। কেননা, অনেক সময় এরূপ বিচ্ছেদের কারণে স্বামী বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়। সুতরাং পিতা-মাতার কারণে সে এরূপ ক্ষতির শিকার হবে না। কারণ, পিতা-মাতার স্নেহের দাবি হল যে, যদি তারা পুত্রের কষ্ট ও ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয়, তবে তারা তাকে পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তারা তাকে এজন্য বাধ্য করে, তবে তা হবে তাদের পক্ষ থেকে নির্বুদ্ধিতা মাত্র। কাজেই এরূপ নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। এমনিভাবে সহায়-সম্পত্তি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার বিধানও তাই। (সংক্ষেপিত)

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, উপরিউক্ত হাদীসে "যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলে"এ কথাটি আতিশয্যব্যাঞ্জক হওয়ার পক্ষে ইঙ্গিত হল এই যে, এ কথাটির সাথে উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরেকটি বাণী রয়েছে لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَإِنْ قُتِلْتَ أَوحُرِّقْتَ ـ অর্থাৎ, "তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা তোমাকে পুড়িয়ে মারা হয়।" বলাবহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীর এ অংশটি নিশ্চিতভাবে আতিশয্যব্যাঞ্জক। নচেৎ এরূপ ক্ষেত্রে কুফরী শব্দ উচ্চারণ করা ও তদনুযায়ী কাজ করার বৈধতা আল্লাহ তা'আলার বাণী مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ـ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটা প্রণিধানযোগ্য।

فِى الْمِشْكٰوةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ ..... الْحَدِيْثُ، وَفِيْهِ : قَالَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، قَالَ : وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ ـ

فِى الْمِرْقَاةِ : فِىْ وَالِدَيْهِ اَىْ فِىْ حَقِّهِمَا وَفِيْهِ : اِنَّ طَاعَةَ الْوَالِدَيْنِ لَمْ تَكُنْ طَاعَةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ هِىَ طَاعَةُ اللّٰهِ الَّتِىْ بَلَغَتْ تَوْصِيَتُهَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِحَسْبِ طَاعَتِهِمَا لِطَاعَتِهِ ..... اِلٰى اَنْ قَالَ : وَيُوَيِّدُهُ اَنَّهُ وَرَدَ لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَفِيْهَا : وَاِنْ ظَلَمَاهُ، قَالَ الطِّيْبِىْ : مُرَادٌ بِالظُّلْمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاُمُوْرِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَاالْاُخْرَوِيَّةِ -

قُلْتُ : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا : وَاِنْ ظَلَمَاهُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ اِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَاِنْ ظُلِمْتُمْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ - وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِمْ : وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهِمْ .... اَلْحَدِيْثُ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ - وَمَعْنَاهُ عَلٰى مَافِى اللُّمْعَاتِ قَوْلُهُ : وَاِنْ ظَلَمُوْا اَىْ بِحَسْبِ زَعْمِكُمْ اَوْ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ مُبَالَغَةً ، وَلَوْكَانُوْا ظَالِمِيْنَ حَقِيْقَةً كَيْفَ يَاْمُرُهُمْ بِاِرْضَائِهِمْ -

মিশকাত শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত হয়ে যার প্রভাত হয়, তবে তার পিতা-মাতা উভয়ে জীবিত থাকলে তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর যদি তাদের একজন জীবিত থাকে, তবে জান্নাতের একটি দরোজা উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে সে যদি পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচারী হয়, তবে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরোজা উন্মুক্ত হয়, আর তাদের একজনের বিরুদ্ধাচারী হলে জাহান্নামের একটি দরোজা উন্মুক্ত হয়।

এ হাদীসেই আছে যে, এক ব্যক্তি আরয করল, যদিও পিতা-মাতা তার প্রতি জুলুমও করে তবুও? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে তিনবার বললেন, যদিও পিতা-মাতা তার প্রতি জুলুমও করে তবুও। (হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

মিরকাতে বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসে "পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ...... কথাটির অর্থ হল, তাদের যাবতীয় হক আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি যত্নশীল থাকা। এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে,

পিতা-মাতার আনুগত্য মূলতঃ স্বতন্ত্রভাবে তাদের আনুগত্য নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য। পিতা-মাতার আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য গণ্য করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করে পিতা-মাতার আনুগত্য করার অনুমতি নেই।

উপরিউক্ত রেওয়ায়াতে "যদিও পিতা-মাতা তার প্রতি জুলুমও করে" কথাটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা তীবী বলেন, এখানে পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে জুলুম বুঝানো হয়েছে, পরকালীন বিষয়াদির ক্ষেত্রে নয়।

আমার মতে, উক্ত হাদীসে "যদিও পিতা-মাতা তার প্রতি জুলুমও করে" কথাটি এরূপই, যেমন তিনি যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে বলেছেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দাও, যদিও তোমরা এক্ষেত্রে জুলুমের শিকার হও। এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। এবং যেরূপ তিনি যাকাত উসূলকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, যদি তারা জুলুম করে, তবে তার অভিশাপ তাদের উপর বর্তাবে। ...... আল-হাদীস। এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। লুম'আতের বর্ণনা মতে, "যদিও তারা জুলুম করে" কথাটির অর্থ হল, যদিও তারা তোমাদের ধারণা মতে, তোমাদের উপর জুলুম করে অথবা অতিশয়তা বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে যে, যদিও মনে কর এবং ধরে নাও, তারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে। নতুবা প্রকৃতই যদি তারা জালিম হত, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) কিভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিতে পারেন।

فِى الْمِشْكٰوةِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قِصَّةِ ثَلٰثَةِ نَفَرٍ: يَتَمَاشُوْنَ وَأَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوْا إِلٰى غَارٍ فِى الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَمْرِهِ: فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا (أَيِ الْوَالِدَيْنِ الَّذَيْنِ كَانَا شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ كَمَا فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ) أَكْرَهُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ .... اَلْحَدِيْثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

فِى الْمِرْقَاةِ : تَقْدِيْمًا لِإِحْسَانِ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْمَوْلُوْدِيْنَ لِتَعَارُضِ صِغَرِهِمْ بِكِبَرِهِمَا فَإِنَّ الرَّجُلَ الْكَبِيْرَ يَبْقٰى كَالطِّفْلِ

الصَّغِيْرِ، قُلْتُ : وَهٰذَا التَّضَاغِى كَمَا فِى قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِى طَلْحَةَ، قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَئٍ وَنَوِّمِيْهِمْ فِى جَوَابِ قَوْلِ إِمْرَأَتِهِ لَمَّا سَأَلَهَا : هَلْ عِنْدَكِ شَئٌ؟ قَالَتْ : لَا إِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِى، وَمَعْنَاهُ كَمَا فِى اللُّمْعَاتِ : قَالُوا : وَهٰذَا مَحْمُوْلٌ عَلٰى أَنَّ الصِّبْيَانَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُحْتَاجِيْنَ إِلَى الطَّعَامِ وَإِنَّمَا كَانَ طَلَبُهُمْ عَلٰى عَادَةِ الصِّبْيَانِ مِنْ غَيْرِ جُوْعٍ، وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيْمُهُمْ وَكَيْفَ يَتْرُكَانِ وَاجِبًا وَقَدْ أَثْنٰى اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ...... اه - قُلْتُ أَيْضًا : وَمِمَّا يُؤَيِّدُ وُجُوْبَ الْإِضْطِرَارِ إِلٰى هٰذَا التَّاوِيْلِ تَقَدُّمُ حَقِّ الْوَلَدِ الصَّغِيْرِ عَلٰى حَقِّ الْوَالِدِ فِى نَفْسِهِ كَمَا فِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ (بَابُ النَّفَقَةِ) ج ٣ : ٦١٦ : وَلَوْلَهُ أَبٌ وَطِفْلٌ فَالطِّفْلُ أَحَقُّ بِهِ وَقِيْلَ (بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ) يُقَسِّمُهَا فِيْهِمَا -

মিশকাত শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে তিন ব্যক্তির কাহিনী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা কোথাও যাচ্ছে, এমতাবস্থায় বৃষ্টি এসে গেল, তখন তারা পর্বতের একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। হঠাৎ তাদের গুহার মুখে একটি পাথর এসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। (তখন তারা পরস্পরে বলতে লাগল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ নেক আমল, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে তার উসিলা দিয়ে দু'আ কর। যাতে আল্লাহ তা'আলা গুহার মুখ খুলে দেন।) তখন তাদের একজন নিজের সম্পর্কে বলল, (হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি বকরী চরাতাম। সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে বকরীর দুধ দোহন করে প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে, তারপর সন্তানদেরকে পান করাতাম। একদিন আমি বকরী চরাতে চরাতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে দেখি আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিদিনের মত দুধ দোহন করলাম) এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের (অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতা-মাতার) মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা ভাল মনে করলাম না এবং তাদের পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করাতেও পছন্দ করলাম না। সন্তানরা আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করতে থাকল। (এভাবে প্রভাত হয়ে গেল।) (বুখারী, মুসলিম)

মিরকাতে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ছোট ছোট সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার হকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার কারণে সন্তান-সন্ততির

মুকাবিলায় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য লোকটি এরূপ করেছে (অর্থাৎ, পিতা-মাতার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিল) কেননা, বয়ঃবৃদ্ধ লোক শিশুসুলভ জীবন যাপন করে। আমার মতে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত শিশুদের কান্নাকাটি হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর মেহমানদের কাহিনীর অনুরূপ। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে আহার্য কিছু আছে কি? তখন তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, আমার ছেলেমেয়েদের খাবার ব্যতীত অন্য কিছু নেই। প্রতি উত্তরে হযরত আবূ তালহা বলেছিলেন, তুমি তাদেরকে কোনভাবে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেল (এবং খাবারগুলো মেহমানদের দিয়ে দাও)। লুম'আতের বর্ণনা মতে, হাদীসটির অর্থ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ তালহার কাজটি এভাবে ধরা হবে যে, তার ছেলে-মেয়েরা খাবারের জন্য মুখাপেক্ষী ছিল না। ক্ষুধা ছাড়া তারা কেবল শিশুসুলভ অভ্যাসে খাবার চাচ্ছিল। নতুবা তারা অনাহারে থাকলে মেহমানদের পূর্বে তাদেরকে খাবার দেওয়া ওয়াজিব হত। হযরত আবূ তালহা ও তাঁর স্ত্রী এরূপ একটি ওয়াজিব দায়িত্ব কি করে ছাড়তে পারেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কর্মের জন্য তাদের উভয়ের প্রশংসা করেছেন।

আমি আরও বলছি, উপরিউক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এতেও প্রমাণিত হয় যে, মূলতঃভাবে পিতার হকের মুকাবিলায় ছোট শিশুর হক অগ্রগণ্য। যেমন আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থের নাফাকাহ (খোরপোষ) অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, "যদি কারও পিতাও থাকে এবং ছোট শিশুও থাকে (এবং সন্তানের পিতা একজনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম) তবে ছোট শিশুর ব্যয়ভার বহন অগ্রাধিকার পাবে। আর (ভাবের অভিব্যক্তিতে দুর্বলতাজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ অর্থাৎ, কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ দ্বারা) এও বলা হয়েছে যে, ব্যয় নির্বাহকারী তার সামর্থ্য মুতাবিক ব্যয়ের অর্থ ছোট সন্তান ও পিতা উভয়ের মধ্যে বন্টন করে ব্যয় করবে।

فِى كِتَابِ الْآثَارِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ (ص ١٥٤) : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اَفْضَلُ مَا اَكَلْتُمْ كَسْبُكُمْ، وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لَابَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ بِالْمَعْرُوْفِ، فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِى حَنِيْفَةَ ـ مُحَمَّدٌ قَالَ : اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْأَبِ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ شَئٌ اِلَّا أَنْ يَّحْتَاجَ اِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ اَوْ شَرَابٍ اَوْكِسْوَةٍ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِى حَنِيْفَةَ ـ

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রণীত "কিতাবুল আছার"– এ (পৃঃ ১৫৪) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম জীবিকা তোমাদের উপার্জিত সম্পদ। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিও তোমাদের উপার্জিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, এতে কোন আপত্তি নেই। পিতা যদি অভাবী হন তবে তিনি তাঁর সন্তানের সম্পদ থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারেন। আর যদি তিনি ধনী হন এবং তারপরও নিজ সন্তানের সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করেন, তবে সেটা তার উপর ঋণ হিসেবে থাকবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হাম্মাদের সূত্রে ইব্‌রাহীম (রহ.) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সন্তানের সম্পদে পিতার কোন অধিকার নেই, পিতা যদি পানাহার বা পরিধেয় বস্ত্রের জন্য সন্তানের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় (তবে তা গ্রহণ করতে পারে)। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আমরা এটাই গ্রহণ করি এবং এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত।

فِىْ كَنْزِ الْعُمَّالِ (ج ٨، ص ٢٨٣): عَنِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ أَنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا ..... اهـ (سَنَدُهُ صَحِيْحٌ، مُحَشِّى) قُلْتُ : دَلَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْحَدِيْثِ "إِذَا احْتَجْتُمْ" عَلٰى تَقْيِيْدِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ قَوْلَ عَائِشَةَ "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ" بِمَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَيَلْزَمُ التَّقْيِيْدُ كَوْنَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، قُلْتُ : وَأَيْضًا فَسَّرَ أَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهٰذَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ"، قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِنَّمَا يُعْنٰى بِذٰلِكَ النَّفَقَةُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، كَذَافِىْ تَارِيْخِ الْخُلَفَاءِ (ص : ٢٥)

কানযুল 'উম্মাল গ্রন্থে (৮খ., পৃ. ২৮৩) হাকিম প্রমুখের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, (রাসূলুল্লাহ [সা.] বলেছেন,) তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য আল্লাহর তা'আলার বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। সুতরাং তারা এবং তাদের ধন-সম্পদ তোমাদেরই, যখন তোমরা তাদের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হও।

(হাদীসটির সনদ সহীহ –টীকাকার)

আমার বক্তব্য হচ্ছে, উক্ত হাদীসে “যখন তোমরা তাদের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হও” এ অংশটি এ কথা বুঝায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি (তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত)-কে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কর্তৃক মুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা দলীল সমর্থিত। আর এ শর্তযুক্ত করা থেকে এ কথা অপরিহার্যরূপে প্রকাশ পায় যে, পিতা যখন মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই সন্তানের সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করবেন, তখন তা তাঁর উপর ঋণ হিসেবে থাকবে। এটাই সুস্পষ্ট কথা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী “তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার মালিকানাভুক্ত”-কে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য পিতার খোর-পোষ। হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। তারীখুল খুলাফাতে তদনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। (পৃ. ২৫)

وَفِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ (ج ٤ : ص ١٢٤-١٢٥) لَايُفْرَضُ (الْقِتَالُ) عَلٰى صَبِىٍّ وَبَالِغٍ لَهُ أَبَوَانِ أَوأحَدُهُمَا، لِأَنَّ طَاعَتَهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ .... إِلٰى أَنْ قَالَ: لَايَحِلُّ سَفَرٌ فِيْهِ خَطَرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَمَا لَا خَطَرَ فِيْهِ يَحِلُّ بِلَا إِذْنٍ، وَمِنْهُ السَّفَرُ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ، فِى رَدِّالْمُحْتَارِ أَنَّهُمَا فِى سَعَةٍ مِنْ مَنْعِهِ إِذَا كَانَ يَدْخُلُهُمَا مِنْ ذٰلِكَ مَشَقَّةٌ شَدِيْدَةٌ، وَشَمِلَ الْكَافِرَيْنَ أَيْضًا أَوْ أَحَدَهُمَا إِذَا كَرِهَ خُرُوجَهُ مَخَافَةً وَمَشَقَّةً، وَإِلَّا بَلْ لِكَرَاهَةِ قِتَالِ أَهْلِ دِيْنِهِ فَلَا يُطِيْعُهُ مَالَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، إِذْ لَوْكَانَ مُعْسِرًا مُحْتَاجًا إِلٰى خِدْمَتِهِ فُرِضَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ كَافِرًا، وَلَيْسَ مِنَ الصَّوَابِ تَرْكُ فَرْضِ عَيْنٍ لِيَتَوَصَّلَ إِلٰى فَرْضِ كِفَايَةٍ، قَوْلُهُ : فِيْهِ خَطَرٌ : كَالْجِهَادِ وَسَفَرِ الْبَحْرِ قَوْلُهُ : وَمَا لَاخَطَرَ كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يَحِلُّ بِلَا إِذْنٍ إِلَّا إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِمَا الضَّيْعَةَ (سَرَخْسِى) قَوْلُهُ : وَمِنْهُ السَّفَرُ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ أَوْلٰى مِنَ التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ الطَّرِيْقُ آمِنًا وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمَا الضَّيْعَةَ (سَرَخْسِى) ..... اهـ - قُلْتُ وَمِثْلُهُ فِى الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالْفَتَاوٰى الْهِنْدِيَّةِ - وَفِيْهَا فِى مَسْئَلَةٍ : فَلَابُدَّ مِنَ الْإِسْتِئْذَانِ فِيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ (ج ٢، ص ٢٤٢)

আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে (৪খ, পৃ. ১২৪-১২৫) আছে যে, কোন নাবালেগ ছেলের উপর এবং যে যুবকের পিতা-মাতা দুজনই বা তাদের একজন জীবিত আছে, তার উপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা, পিতা-মাতার আনুগত্য করা ফরযে আইন। ..... উক্ত গ্রন্থকার এক পর্যায়ে আরও বলেন যে, পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ঝুঁকিপূর্ণ সফর করা জায়েয নয়, আর যে সফরে ঝুঁকি নেই তা পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিরেকেও করা জায়েয। ঝুঁকিহীন সফরসমূহের মধ্যে ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করাও অন্যতম।

আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থের ভাষ্য রদ্দুল মুহতার-এ বলা হয়েছে যে, যদি সে এরূপ সফরের কারণে পিতা-মাতাকে ভীষণ কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়, তবে তাকে বারণ করার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে। যদি পিতা-মাতা উভয়ে অথবা তাদের একজন কাফেরও হয়, তবে সে পিতা বা মাতাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যদি পিতা বা মাতা ভয় ও কষ্টের কারণে তার সফরে গমন অপছন্দ করে। আর যদি তা না হয়; বরং পিতা বা মাতা তার সধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে তার জিহাদের সফরে গমন অপছন্দ করে, তবে যদি তার পিতা বা মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা না হয় তাহলে তার আনুগত্য করবে না। কেননা, তার পিতা বা মাতা যদি তার সেবার মুখাপেক্ষী হয় এবং তার পিতা বা মাতা যদি কাফের হয় তবু তার সেবা করা তার উপর ফরয। ফরযে কিফায়া পালনের জন্য ফরযে আইন তরক করা ঠিক নয়। যে সফরে ঝুঁকি রয়েছে, তার উদাহরণ, যেমনঃ জিহাদ, সামুদ্রিক সফর। আর যে সফরে ঝুঁকি নেই তার উদাহরণ, যেমনঃ বাণিজ্যিক সফর, হজ্জ ও উমরার সফর। এরূপ সফর যদি পিতা-মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা না হয়, তবে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে করা জায়েয (সারাখসী)। ঝুঁকিহীন সফরসমূহের মধ্যে ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করাও অন্যতম। কেননা, সফরের পথ নিরাপদ হলে এবং পিতা-মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকলে এরূপ সফর বাণিজ্যিক সফরের চেয়ে উত্তম (সারাখসী)। .....আমার বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ বর্ণনা আল-বাহরুর রায়েক এবং আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া গ্রন্থদ্বয়েও রয়েছে। আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া গ্রন্থে এক মাসআলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদি সফর এমন হয় যে, সে সফরে না গেলেও চলে, তবে এরূপ সফরে যেতে হলে পিতা-মাতার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক হবে। (২খ., পৃ. ২৪২)

فِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بَابِ النَّفْقَةِ (ج ٣ : ص ٥٩٩) وَكَذَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنٰى فِىْ بَيْتٍ خَالٍ عَنْ اَهْلِهٖ وَعَنْ اَهْلِهَا ..... الخ

وَفِىْ رَدِّالْمُخْتَارِ بَعْدَمَا نَقَلِ الاَقْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ مَانُصَّهُ فَفِى الشَّرِيْفَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ لَابُدَّ مِنْ اِفْرَادِهَا فِىْ دَارٍ وَمُتَوَسِّطَةِ الْحَالِ

يَكْفِيهَا بَيْتٌ وَاحِدٌ مِنْ دَارٍ...... وَاَطَالَ اِلَى اَنْ قَالَ : وَاَهْلُ بِلَادِنَا الشَّامِيَّةِ لَايَسْكُنُونَ فِى بَيْتٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى اَجَانِبَ وَهٰذَا فِى اَوْسَاطِهِمْ فَضْلاً عَنْ اَشْرَافِهِمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ دَارًا مَوْرُوْثَةً بَيْنَ اِخْوَةٍ مَثَلاً فَيَسْكُنُ كُلٌّ مِّنْهُمْ فِى جِهَةٍ مِّنْهَا مَعَ الْاِشْتِرَاكِ فِى مَرَافِقِهَا ثُمَّ قَالَ : لَاشَكَّ اَنَّ الْمَعْرُوْفَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَعَلَى الْمُفْتِى اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى حَالِ اَهْلِ زَمَانِهِ وَبَلَدِهِ، اِذْ بِدُوْنِ ذٰلِكَ لَاتَحْصُلُ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوْفِ ..... اهْ۔

আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থের খোরপোষ অধ্যায়ে (৩খ., পৃ. ৫৯৯) আছে যে, স্ত্রীকে এমন একটি বাসস্থান দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব, যেখানে স্বামীর বা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন থাকে না। ....

রদ্দুল মুহতারে এতদ্সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার পর যা বলা হয়েছে তার বিবরণ এরকম যে, সম্ভ্রান্ত ও ধনবতী মহিলার বাসস্থান স্বরূপ তাকে একটি পৃথক গৃহ দেওয়া আবশ্যক। আর মধ্যম শ্রেণীর মহিলার জন্য গৃহের একটি কামরাই যথেষ্ট। ...... এ সম্পর্কে গ্রন্থকার আলোচনা দীর্ঘায়িত করে এক পর্যায়ে বলেন, আমাদের শামের শহরাঞ্চলে লোকেরা এমন গৃহে বসবাস করে না, যেখানে দূরাত্মীয় বা গায়রে মাহরাম লোকজন থাকে। এটা তো মধ্যম শ্রেণীর লোকদেরই নিয়ম, সম্ভ্রান্ত লোকজনের এরূপ গৃহে থাকা তো দূরের কথা। অবশ্য যদি কয়েক ভাইয়ের (উদাহরণতঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাড়ি হয়, তবে তাদের প্রত্যেকে সে বাড়ির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অংশীদারিত্ব সহকারে বাড়ির বা গৃহের একাংশে বসবাস করে। .... অতঃপর উক্ত গ্রন্থকার বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, স্থান ও কালের পরিবর্তনে প্রথা-প্রচলনেরও পরিবর্তন হয়। কাজেই মুফতীর জন্য তার স্থান কালের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেননা, এছাড়া যথাযথ নিয়মে জীবন যাপন ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা অর্জন সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে কতিপয় মাসআলা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এক ঃ যে কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব এবং পিতা-মাতা তা করতে বারণ করে সে ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য জায়েযও নয়, ওয়াজিব হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। উক্ত মূলনীতির মধ্যে এ শাখাগত মাসআলাগুলোও এসে যায়। যেমনঃ কোন ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য এত কম যে, যদি পিতা-মাতার খেদমত করে তবে স্ত্রী ও সন্তানরা (আর্থিক অভাবে) কষ্ট করে, তবে স্ত্রীও সন্তানদের কষ্ট দেওয়া এবং পিতা-মাতার জন্য তার অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়। এমনিভাবে স্ত্রীর এ অধিকার আছে যে, সে স্বামীর নিকট পিতা-মাতা থেকে

পৃথক হয়ে যাওয়ার দাবি করতে পারে। সুতরাং স্ত্রী যদি এরূপ আবদার করে এবং পিতা-মাতা তাকে একসাথে রাখতে চায়, তবে এমতাবস্থায় স্ত্রীকে পিতা-মাতার সাথে রাখা স্বামীর জন্য জায়েয নয়; বরং স্ত্রীকে পৃথক রাখা ওয়াজিব।

এমনিভাবে পিতা-মাতা যদি ছেলেকে হজ্জ বা উমরায় গমন করতে বা ফরয পরিমাণ ইলম হাসিলের জন্য সফর করতে অনুমতি না দেয়, তবে তাদের আনুগত্য করা জায়েয হবে না।

দুই ঃ যে কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয এবং পিতা-মাতা তা করতে নির্দেশ দেয়, তবে এক্ষেত্রেও পিতা-মাতার আনুগত্য জায়েয নয়। যেমনঃ তারা কোন নাজায়েয চাকুরী করার নির্দেশ দেয় অথবা শরীয়তের খেলাফ রীতি-নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ হতে পারে।

তিন ঃ যে কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিবও নয়, নিষিদ্ধও নয়; বরং বৈধ বা পছন্দনীয়, কিন্তু পিতা-মাতা তা করতে বা না করতে বলে, তবে সেটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। দেখতে হবে যে, সে কাজটি কি এতই প্রয়োজনীয় যা ছাড়া তার কষ্ট হবে? যেমন ধরুন, কোন গরীব মানুষ, তার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই। গ্রামে উপার্জনের কোন পথও নেই। অথচ পিতা-মাতা তাকে বাইরে যেতে দেয় না। অথবা সে কাজটি তার এত বেশি প্রয়োজনীয় নয়। যদি তার এতই প্রয়োজন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য জরুরী নয়। আর যদি ততবেশি প্রয়োজন না থাকে, তবে দেখতে হবে সে কাজ করতে গেলে কোন ক্ষতির আশঙ্কা, মৃত্যু বা অসুস্থ হওয়ার ভয় আছে কি-না, এবং এও দেখতে হবে যে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ার কারণে সেবা-শুশ্রূষাকারী বা আসবাবপত্রের অভাবে পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়ার কোন প্রবল আশঙ্কা আছে কি-না। অতএব সে কাজে যদি কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা থাকে অথবা তার অনুপস্থিতির কারণে আসবাবপত্রের অভাবে পিতা-মাতা কষ্টক্লেশে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। যেমনঃ কেউ এমন কোন যুদ্ধে যাচ্ছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয় অথবা সামুদ্রিক সফরে যাচ্ছে অথবা সে সফরে গেলে পিতা-মাতার খোজ-খবর নেওয়ার মত কেউ থাকবে না এবং তার এতটুকু অর্থিক সামর্থ্যও নেই, যদ্বারা সে পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষাকারী ও প্রয়োজনীয় খোর-পোষের ব্যবস্থা করে যেতে পারে এবং সে কাজ ও সফরও তেমন জরুরী নয়, তবে এক্ষেত্রে তার উপর পিতা-মাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি উপরিউক্ত দু'টির কোনটিই নেই অর্থাৎ, সে কাজে বা সফরে কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা নেই এবং বাহ্যতঃ কোন রকম কষ্ট ক্লেশের সম্ভাবনাও নেই, তবে তা নিষ্প্রয়োজনীয় হলেও পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সেই কাজ বা সফর করা তার জন্য জায়েয। তবে এক্ষেত্রেও পিতা-মাতার আনুগত্য করা মুস্তাহাব। উপরিউক্ত মূলনীতি থেকে এ শাখাগত মাসআলাগুলোর বিধানও জানা গেল,

যেমনঃ কোন পিতা-মাতা উল্লেখযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে ছেলেকে বলে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে, তবে এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য ওয়াজিব নয়। হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির নির্দেশ মুস্তাহাব স্বরূপ ধরা হবে অথবা বলতে হবে যে, হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশ কোন ন্যায় সঙ্গত কারণে ছিল। অথবা যদি পিতা-মাতা বলে যে, তোমার সমস্ত উপার্জনের অর্থ আমাদেরকে দিয়ে দাও, তবে এক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব নয়। যদি পিতা-মাতা এ জন্য ছেলেকে বাধ্য করে, তবে তারা গুনাহগার হবে। "তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্যই" এ হাদীসটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। হাদীসটির শর্তহীন মর্মার্থ কিভাবে প্রযোজ্য হবে? কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারও মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে খাওয়া হালাল নয়। যদি পিতা-মাতা সন্তানের মাল থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেয়, তবে তা তাদের দায়িত্বে ঋণ স্বরূপ থাকবে। দুনিয়াতেও তাদের নিকট সে ঋণের দাবি করা যেতে পারে। আর যদি তারা দুনিয়াতে না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন দিতে হবে। ফিকাহবিদদের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ জন্য যথেষ্ট। তারা উক্ত হাদীসের অর্থ ভাল বুঝেন। তাছাড়া ইমাম হাকিম বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ শর্তটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যখন তোমরা (অর্থাৎ পিতা-মাতা) তোমাদের সন্তানের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হও"।

॥ সমাপ্ত ॥

আশরাফ আলী
থানাভবন।
২৭ জুমাদল উখরা, ১৩৩২ হিজরী